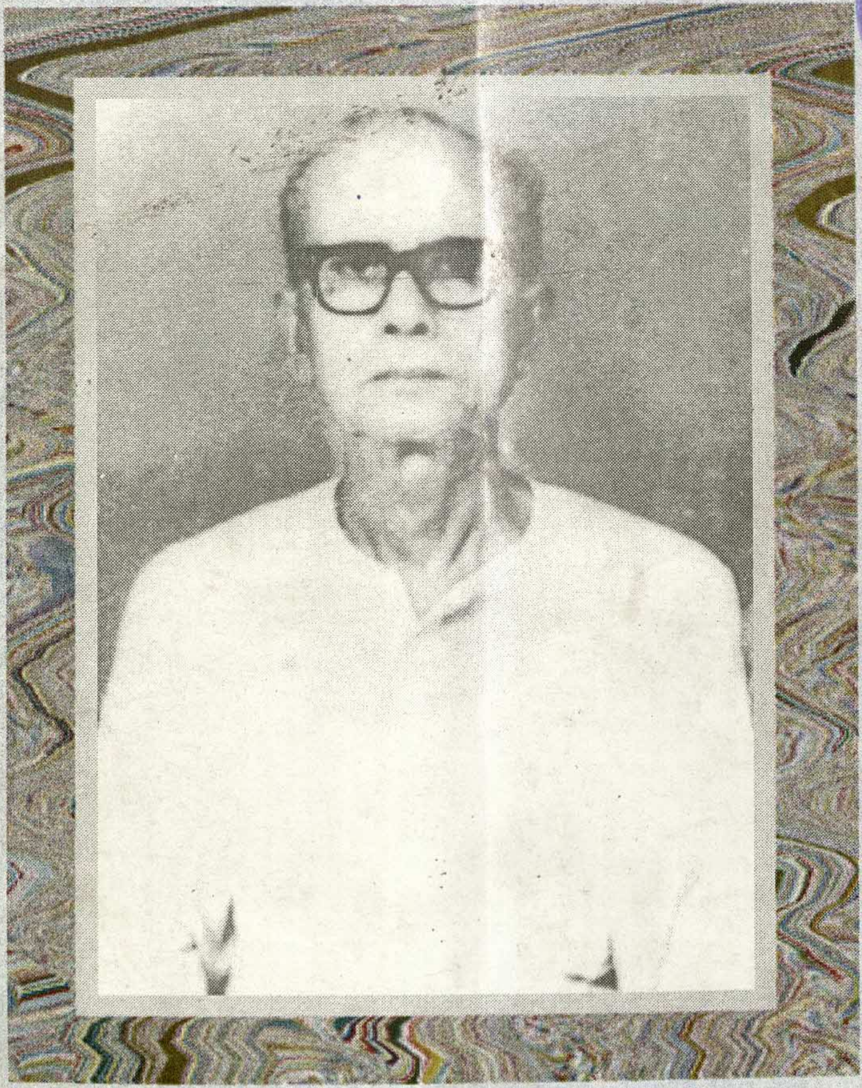
শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal

VOL.LXXXIII NO. 3 MARCH, 2004



নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

শিক্ষা ও সাহিত্য
Teachers' Journal

চৈত্র, ১৪১০ মার্চ, ২০০৪

৮৩তম বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা

"সমস্ত ভারতে বাম-গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নবম লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। আমরা গর্বিত যে, এই সংগ্রামে আমাদের সমিতি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করিয়াছে।"

প্রয়াত শশিমোহন ভট্টাচার্য লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)
শিক্ষা ও সাহিত্য
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬/নভেম্বর, ১৯৮৯

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতি কার্যালয় ঃ সত্যপ্রিয় ভবন, পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ ফোন ঃ ২২১৫-৯১৫৮, ২২১৫-৮৮৫৬
ফ্যাক্স ঃ ২২১৫-৭৯৩২

পত্রিকা কার্যালয় ঃ ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ ফোন ঃ ২২৪১-২৯৫৪

সম্পাদক
শ্রীপ্রশান্ত ধর

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা ও সাহিত্য

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

❒ প্রসঙ্গ ঃ লোকসভা নির্বাচন ২৯৯
সমিতির ডাক ৩০০
সম্পাদকীয় (পুনর্মুদ্রিত) ৩০২
আমাদের চিরদিনের শশিদা ❒ অমিতাভ সেন ৩০৫
দিনাজপুরের হেমপ্রসন্ন ঃ একটি লুপ্তপ্রায় অধ্যায়
❒ ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ৩০৭

চুয়ান্নর স্মৃতিচারণ

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৩১০
অকাল লোকসভা নির্বাচনে পরাস্ত করতে হবে
'ফিলগুড'-এর ফেরিওয়ালা বি জে পি ও তার সঙ্গীদের
❒ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩১১
ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্কট ও আমাদের দায়িত্ব
❒ বনমালী ঘোষ ৩২৪
কল্লোল-এর কলরোলে ❒ রঞ্জিতকুমার সরকার ৩২৬
সমিতির পুরুলিয়া জেলার ইতিহাস
❒ দিলীপকুমার গোস্বামী ৩২৮
এ বি টি এ'র বীরভূম জেলার
শিক্ষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা
❒ রাধাবল্লভ রায় ৩৩৩
সময়াভিযান ❒ দুর্গাদাস ভট্ট ৩৩৮
'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র এক বছরের
মহিলা কবিদের কবিতা
❒ অশোক অধিকারী ৩৪৩

প্রতিবেদন ৩৪৭

কবিতাগুচ্ছ

অনিলা দেবী অমর রহে ❒ সেবা চক্রবর্তী ৩৯২
পাবলো নেরুদার প্রতি ❒ সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯২
অনিলা দেবীর প্রতি ❒ দেবযানী চৌধুরী ৩৯২
সমবায় ❒ ননীগোপাল জানা ৩৯৩
প্রদর্শক ❒ শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ ৩৯৩
মুটে মজুরের কবিতা ❒ সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ৩৯৩
স্বদেশ ❒ রঞ্জিতকুমার সরকার ৩৯৪
কুমির তোর জলকে নেমেছি
❒ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৯৪
আবাহন ❒ বংশীধর সাহু ৩৯৪
ছড়া ও গান ❒ সুরঞ্জন চক্রবর্তী ৩৯৫
শশিমোহন স্মরণে ❒ শ্যামলকান্তি সুর ৩৯৫
ভালো আছি ❒ অশোক অধিকারী ৩৯৬

সমিতি সংবাদ ৩৯৭
শোক ৪১৩
গ্রন্থাবলোকন ৪১৫
নিন্দা, ধিক্কার ৩০৯

Teachers' Journal
CONTENTS

Editorial

❒ Ensure Victory of Left Front Candidates
in Ensuing Parliament Elections ৪১৯
Call of the Association ৪২১
New Horizon of Vocational Education :
Higher Secondary Level
Current Scenario
❒ Badal Bhattacharjee ৪২৩
Saffronisation of Education
❒ Bairagya Chakrabarti ৪২৮
STFI ৪৩৯
State Project Office ৪৪২
Proposed amendment to theConstitution
of All Bengal Teachers' Association ৪৪৭
Govt. Circular ৪৪৮
The Kolkata Gazette ৪৬৩
Board Circular ৪৭০

প্রচ্ছদচিত্র ঃ প্রয়াত শিক্ষক নেতা শশিমোহন ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ ঃ লোকসভা নির্বাচন

শিক্ষার উপর নগ্নতম আক্রমণ বি জে পি-জোট সরকারের জঘন্যতম অপরাধ। জনজীবনের সর্বস্তরে তীব্র সঙ্কট নামিয়ে এনে গোটা দেশকে বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়েছে এই পাষণ্ডের দল। সঙ্ঘ পরিবারের গোপন কর্মসূচী আর গোপন নেই, সেটা প্রকাশ্যেই চর্চার মধ্যে এসে গেছে। ভারতের আবহমানকালের দু'টি মৌলিক ঐতিহ্যকে এরা ধ্বংস করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করেছে — একটি ভারতের বহুত্ববাদী সহনশীলতার ঐতিহ্য, অন্যটি 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে'র সাংস্কৃতিক পরম্পরা।

ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস চেতনার স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে এরা বিকৃতির এঁদো পুকুরে পচিয়ে দিতে চাইছে — এদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এদের ষড়যন্ত্রের জাল স্বাধীনতার সময় থেকেই এরা চালিয়ে গেছে।

১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার মধ্যদিয়ে এরা নবজাত রাষ্ট্র যাতে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান না গ্রহণ করতে পারে, তার ষড়যন্ত্র করেছিল।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সংগঠিত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার কাজকে গতিবেগ দিতে হবে। ভারতের বুক থেকে সঙ্ঘ পরিবারের বিষাক্ত আগাছার মূল উপড়িয়ে ফেলার জন্য সমবেত গণ-উদ্যোগ ও আন্দোলন গড়ে তুলে নির্বাচনী সংগ্রামকে 'রাহুমুক্তি'র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। নির্বাচনের বুথভিত্তিক সংগঠনে স্বেচ্ছা-সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং প্রতিটি ভোটদাতাকে এই ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ক্রান্তিকালের এই সংগ্রামে সংগঠিতভাবে সামিল হবার জন্য সকলকে আহ্বান জানাই।

১০ই মার্চ, ২০০৪

শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ রুখতে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

সমিতির ডাক

অমল ব্যানার্জী

সাধারণ সম্পাদক

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হোল। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বহিঃপরীক্ষা। প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার প্রভাব এখনও কার্যত সর্বাধিক। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে আলাপ-আলোচনা গত পাঁচদশক ধরে খুবই গতিশীল ধারায় চলছে, তবু জনশিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি-প্রকরণের যথার্থ রূপরেখা এখনও নির্দ্ধারিত হতে পারেনি। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে উঠে আসা পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রাপ্ত প্রজ্ঞার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তবে একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীর শিখন ও মূল্যায়নে কার্যকরী রূপ নিতে এবং শিক্ষার্থীর কল্যাণে ফলদায়ী হতে পারে এখন প্রকৌশলই আমাদের কাম্য। এই মুহূর্তে যে ব্যবস্থা চালু আছে তার জন্য সদাজাগ্রত অবস্থান অবলম্বন করার ব্যাপারে আমরা তৎপর। প্রথমদিনটি ভালভাবেই অতিক্রান্ত। পরীক্ষার্থীরা যাতে কোথাও কোন অসুবিধায় না পরে, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন এটাই আমাদের গর্বের বিষয়। পাশাপাশি মাদ্রাসা পর্ষদের এবং আগামী মাসে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়েও আমরা সজাগ। মাঝখানে হবে বার্ষিক পরীক্ষা—সেটাও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। চলবে এখন পরপর পরীক্ষা-খাতা দেখা এবং ফলপ্রকাশের কাজ ও দায়িত্বপালন। এ বিষয়ে সকলকে যথাযথভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে হবে—কোনভাবেই কোন শিথিলতা বা অবহেলা যেন কোন জায়গা না পায়। পরম স্নেহের শিক্ষার্থীদের আমাদের কাছ থেকে প্রাপ্য স্নেহ-মমত্ববোধের প্রতিফলন ঘটুক আমাদের দরদীমনের কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। এটাই এই মাসের সমিতির ডাকের এক নম্বর বিষয়।

গত ফেব্রুয়ারী ২৪শে-এর দেশব্যাপী ধর্মঘট একটা বার্তা পৌঁছে দিয়েছে দেশব্যাপী সংগ্রামী মানুষের পাশাপাশি আমাদের কাছেও। কি সেই বার্তা ? শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়েছেন তাঁরা সংগঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে। বহু সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্যদিয়ে অর্জিত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে দেবো না আমরা। পাশাপাশি অকাল নির্বাচনের মুখে বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের নীতিহীনতার নীতি এবং দেশের মর্যাদা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা তথা বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করার বর্বর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে। ধর্মঘটের বার্তা আগামী লোকসভা নির্বাচনের মধ্যদিয়ে এই অসভ্য, বর্বর এবং কার্যত দেশ-বিরোধী শক্তিকে সভ্য-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিতে হবে। ওদের ক্ষমতায় ফিরতে দেওয়া যাবে না। দেশব্যাপী সংগ্রামী মানুষ সাধারণ ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে এই রায় দিয়েছেন—এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে দেশপ্রেমিক ও প্রাজ্ঞ সমস্ত মানুষজনের কাছে। তাঁরাই শেষ কথা বলবেন—তাঁদের সঠিক অবস্থান গ্রহণের মধ্যদিয়ে দেশ বাঁচবে বিপন্নতার হাত থেকে। সকলের জন্য গড়ে ওঠা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাবার বাস্তবতা এক ধাপ এগুবে।

এই ধর্মঘটে পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি তৈরী করেছে আর একটি অভিমুখ—আগামী সংসদে সংগ্রামী অবস্থান নিতে সক্ষম বামপন্থীদের শক্তি আরো বাড়াতে হবে। এই সংগ্রামী মেজাজ তৈরী করে দেবার জন্য সমিতি জানাচ্ছে অভিনন্দন। আগামী ১৪ই মার্চ সমস্ত বামপন্থী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের তরফে যৌথভাবে একটি কেন্দ্রীয় কনভেনশনের মধ্যদিয়ে আমরা শপথ নেবো বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সর্বত্র জয়ী করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে উদ্যোগী হবো। সাধ্যমতো অর্থসাহায্য, ইউনিট স্তর পর্যন্ত তথ্যনির্ভর যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য নিয়ে পৌঁছে যাওয়া, ১২ই জুলাই কমিটির সাথে বাড়ী বাড়ী যাওয়া, আগ্রহী বন্ধুদের বুথ স্তরে যুক্ত হয়ে কাজ করা ও শিক্ষার উপর সামগ্রিক আক্রমণের বিষয়সমূহ মানুষের মধ্যে তুলে ধরার কাজে আমরা সংগঠিতভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবো। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোন দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবন্ধুদের উপর অর্পিত হলে তা পালন করতে হবে। অব্যাহতি নেবার প্রবণতা যথেষ্ট কমেছে।

এই প্রবণতা যেটুকু আছে তা ত্যাগ করতে হবে। এই সংখ্যায় তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে—নির্বাচনী প্রচারে তা কাজে লাগবে। অকাল নির্বাচনের পিছনে ওদের হতাশা ও শোচনীয় ব্যর্থতাকে ঢাকতে ওরা সত্যকে উপেক্ষা করবে, মিথ্যার স্রোতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা সেই পরিমণ্ডলে তথাকথিত নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে পারি না। সত্যের মুখোমুখি হতে হবে, তাই তথ্যনির্ভর-যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরা হলো পত্রিকাতে—এগুলো কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিন।

স্কুল বাঁচাতে, দেশ বাঁচাতে অসভ্য, বর্বরদের তথা এই দুর্বৃত্তদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে—সেই আহ্বানই জানিয়েছে এস টি এফ আই। পশ্চিমবাংলায় আমাদের দায়িত্ব একটু বেশী। কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতায় আনতে হলে, অন্তত একটা সভ্য সরকার তৈরী হবার মত সংসদ গড়ে তুলতে হবে দেশের মানুষকে। এই কাজ করতে সংসদে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। তারজন্য দরকার পশ্চিমবঙ্গে যাতে সব আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়ী হন তারজন্য আমাদের যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়া। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, ইতিহাসের বিকৃতি, পাঠ্যসূচীতে গণতান্ত্রিক উপাদান কমানো এবং সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতিতে সমস্ত ইতিবাচক মূল্যবোধকে ধ্বংস করা রুখতে হলে এই কর্তব্যপালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সমিতি এই আহ্বান জানাচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে পেশার দায়িত্বনিষ্ঠা পালনের পাশাপাশি সময় বার করে নিয়ে প্রতিটি ইউনিটে সভা করতে হবে। এখনই তার প্রস্তুতি নিতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে বুলেটিন, যৌথ ইস্তাহার এবং সমিতির পত্রিকা। আগামী মাসে সদস্য সংগ্রহ অভিযান ও পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের কাজ সফল করার পূর্ব প্রস্তুতি এখনই শুরু করতে হবে।

শশিদার স্মরণসভায় '৫৪-এর আন্দোলনের শিক্ষার প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে। সেই আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে যে শিক্ষার আন্দোলনে সকল মানুষকে সাথে পাবার উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরী। আজকে শিক্ষার যে সংকট তা বাড়বে বি জে পি ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারলে—তাই তাকে রুখতে হবে। দেশপ্রেমী-ধর্মনিরপেক্ষ-শিক্ষাদরদী সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হতে হবে। পাশাপাশি দরিদ্র ও পিছিয়ে পরা অংশের মানুষের বাঁচার লড়াইকেও এগিয়ে নেবার সংগ্রামে যাঁরা অবতীর্ণ তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

আর এস এস ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে, তবে তাদের অবস্থান ছিল বৃটিশ ও তার অনুচর রাজন্যবর্গের সাথে। সংগ্রামের ময়দানে নয়। বি জে পি তো তৈরী হ'ল সেদিন—১৯৮০ সালে, অবশ্য তার পূর্বসূরি জনসংঘ জন্মেছে ১৯৫১-তে। কিন্তু এদের নিয়ন্ত্রক আর এস এস তাদের একজন নেতার নাম করতে পারবেন যিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছেন। না, পারবেন না। এমনকি বি জে পি'র বর্তমান নেতা ১৯৪২-এ বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তা আজ সর্বজনবিদিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদের হাতে দেশের মর্যাদা নিরাপদ নয়, এটাই স্বাভাবিক। দেশের স্বনির্ভরতাকে ওরা শেষ করেছে। সাধারণ মানুষের জীবন যাপনকে করেছে দুর্বিসহ। শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে তৎপর হয়েছে। সর্বোপরি এদের ক্ষমতায় থাকাকালীন ছোট-বড় তিনশটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, ভেঙেছে বাবরি মসজিদ। মন্দির নির্মাণের বিষয়কে করেছে 'ইস্যু'। শুধু তাই এসবই করেছে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম করার লক্ষ্যে। আর সেইজন্যই, কেবল দাঙ্গা নয় ; বিচার ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকীকরণের জন্য ওরা ব্যস্ত। সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক অবস্থানকে ধ্বংস করতে চায়। তাই আগামী নির্বাচনের উপর নির্ভর করছে গণতন্ত্র রক্ষার প্রসঙ্গ। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের ভূমিকা এই পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের অবস্থানকে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ঐতিহাসিক অভিমুখ রচনায় ইতিবাচক অবদান রাখবো।

ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক।

গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতি জিন্দাবাদ।

শিক্ষার সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম।

সংহতি কার্যসাধিকা। ৭.৩.২০০৪

ধর্মনিরপেক্ষতা-গণতন্ত্র রক্ষা করুন। বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

সম্পাদক

শিক্ষার স্বার্থে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান চাই

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত নূতন সিলেবাস অনুযায়ী আগামী এপ্রিল, ১৯৭৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। নূতন মাধ্যমিক পাঠক্রমে অনেকগুলি নূতন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিশেষত কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, স্কুল পারফরমেন্স ও সমাজসেবা নামক বিষয়গুলিতে এই সর্বপ্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। নূতন পাঠক্রম অনুসারে মৌখিক পরীক্ষা আগামী এপ্রিলে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষাতেই সর্বপ্রথম কার্যকর হইবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রধানগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ বিষয়গুলির পরীক্ষা পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায় রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ এই বিষয়গুলি সম্পর্কে এখনও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানান নাই।

পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নূতন বিষয়গুলি সম্পর্কে পর্ষদ বার্তায় কিছু নোট প্রকাশিত হইলেও এই সম্পর্কে বিস্তারিত সার্কুলার এখনও বিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছায় নাই। ফলে মৌখিক পরীক্ষা কিভাবে হইবে, তাহার প্রশ্নের ধরণ কিরূপ হইবে, পরীক্ষার স্থান নির্বাচন, মার্ক দিবার পদ্ধতি প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এখনও অনিশ্চিত অবস্থায় রহিয়াছেন। আগামী মাধ্যমিক পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের যে নমুনা পর্ষদ বার্তায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ। নূতন পাঠক্রম অনুসারে লিখিত পরীক্ষার ধরণ-ধারণ সম্পর্কেও পর্ষদ এখনও সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানান নাই। পরবর্তী মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে এখনও এই অরাজক অবস্থার জন্য পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে রহিয়াছে।

নূতন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থাও এখনও অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন। এই দুই শ্রেণী, পাঠক্রম অনুসারে পুস্তক প্রকাশনার কাজ দূরে থাকুক, এখনও পাঠক্রমের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইতোমধ্যে এই স্তরের শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষাকে ঐচ্ছিক করিবার প্রতিবাদে শিক্ষক-শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। সমিতি দাবী করে এই স্তরে প্রথম ভাষা হিসেবে মাতৃভাষাকে বাধ্যতামূলক করিতেই হইবে।

নূতন শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় শিক্ষালাভ করিবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিরও এখনও সুমীমাংসা হয় নাই। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত উচ্চ মাধ্যমিক বিষয়গুলির জন্য নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরির নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো আশ্বাস এখনও পাওয়া যায় নাই। ফলে কয়েক সহস্র শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকুরির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষকদের নূতন বেতনক্রম ঘোষিত হইলেও পে-ফিক্সেসন ইত্যাদি বিষয়ে এখনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা হয় নাই। নূতন বেতনক্রমে অ্যাডহক দানের যে প্রতিশ্রুতি গত অক্টোবর মাসে সরকার দিয়াছিলেন, তাহাও এখনও কার্যকর হয় নাই। বস্তুত পশ্চিমবাংলার বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয়ে অ্যাডহক বাবদ প্রতিশ্রুত অর্থ এখনও পৌঁছায় নাই।

এই সমস্ত সমস্যাবলী সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। শিক্ষার স্বার্থে আমরা অবিলম্বে শিক্ষাক্ষেত্রে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান দাবী করিতেছি। আমরা আশা করি, সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসানের জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার নব-নির্বাচিত সম্পাদক, সমিতির প্রবীণ নেতা শ্রীশশিমোহন ভট্টাচার্য বর্তমান সংখ্যা হইতে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য
ডিসেম্বর, ১৯৭৫/পৌষ, ১৩৮২

প্রয়াত শশিমোহন ভট্টাচার্য শিক্ষা ও সাহিত্য-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১৩৮২)। এই মাসেই তাঁর লেখা প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি ছিল ৫৪তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর প্রথম সম্পাদকীয় 'শিক্ষার স্বার্থে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান চাই' পুনর্মুদ্রিত করা হলো।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

সম্পাদক

প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা সফল বিপ্লবের পরে পৃথিবীর প্রথম রাশিয়ায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্ম। শোষণ ও শৃঙ্খলের নাগপাশমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের যে জয়যাত্রা সেদিন সূচিত হইয়াছিল তাহা আজও অব্যাহত। সোভিয়েত বিপ্লব কেবলমাত্র প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই জন্ম দেয় নাই, দেশে দেশে শোষিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে, এতে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ শোষণের জোয়াল হইতে মুক্ত হইয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ছিঁড়িয়া বহু দেশ স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির জন্য সংগ্রাম দুর্বার গতি লাভ করিয়াছে।

প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমরা রক্তিম অভিনন্দন জানাই, অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপকার কমরেড লেনিনের উদ্দেশ্যে। যে আদর্শকে অবলম্বন করিয়া কমরেড লেনিন ও বলশেভিক পার্টির প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করিয়াছিলেন তাহার নাম মার্কসবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কস সমাজ প্রগতির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করিয়া শোষিত মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে পথনির্দেশ করিয়াছিলেন একশত বৎসর পরেও তাহার মৌল সিদ্ধান্তগুলি সমান সত্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যুদ্ধ-প্রয়াসের বিরুদ্ধে অগ্রসরকামী দেশগুলিতে শোষকশ্রেণীর প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পৃথিবীর সমস্ত ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ও সমাজ প্রগতির মূল লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ যাহা মার্কসবাদেরই অপর নাম।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রবাদ তাই আজিও এক বিশ্বজয়ী আদর্শ। সেই আদর্শের জয়যাত্রা অব্যাহত।

সমিতির বিগত সম্মেলনে গৃহীত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বিশ্ব পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে সঠিকভাবেই বলা হইয়াছে ঃ

"বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে সমাজতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি সুস্পষ্ট। বিশ্বশান্তি রক্ষায় ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পুরোধা শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের একনিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং বিশ্বের সমস্ত দেশের শান্তিকামী নর-নারীদের বিশ্বশান্তির জন্য যে নিরন্তর সংগ্রাম, অনেক গড়িমসি ও টালবাহানা করেও শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মূল ত্রাতা যুদ্ধোন্মাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেখানে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। কিছুসংখ্যক যুদ্ধঘাঁটি অপসারণে সম্মত হয়েছে। শান্তিকামী মানুষদের জয় ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বশান্তির জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ আছে।

সাম্রাজ্যবাদের কবল-মুক্ত হবার জন্য আফ্রিকা ও আমেরিকার মুক্তিকামী মানুষদের জয়যাত্রাও অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নৃশংসতা তাদের দমাতে পারেনি।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথীরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রচেষ্টার ফলে ধনতান্ত্রিক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদীরা আজ আরো কোণঠাসা হচ্ছে।"

প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্বে এক সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। দুইটি বিপরীত ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে

শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতেছে। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ভারতের মানুষের সফল আন্দোলন তাহারই প্রমাণ। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনার সময়ে সমস্ত ভারতে বাম-গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নবম লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। আমরা গর্বিত যে, এই সংগ্রামে আমাদের সমিতি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করিয়াছে।

আমরা আনন্দিত, আমরা গর্বিত

এই সংখ্যা পত্রিকার কাজ সম্পূর্ণ হইবার সময়ে নবম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের প্রার্থীগণ প্রায় সমস্ত আসনে জয়ী হইয়াছেন। কংগ্রেস (ই) নবম লোকসভায় সংখ্যালঘু শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পদত্যাগ করিয়াছেন। নবম লোকসভা নির্বাচনের এই ফলাফলে আমরা আনন্দিত।

সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে সমিতি সদস্যগণ এই রাজ্যে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত করিবার জন্য নির্বাচনী সংগ্রামে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছেন। এ জন্য আমরা গর্বিত। আমরা আশা করি, নির্বাচকমণ্ডলীর রায়কে গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রে অবিলম্বে এক গণতান্ত্রিক ও বন্ধু সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। লোকসভায় নির্বাচিত সকল বাম ও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শিক্ষা ও সাহিত্য
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬/নভেম্বর, ১৯৮৯

প্রয়াত শশিমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭৫-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা ও সাহিত্য-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুখপত্রের সম্পাদক হিসাবে লেখা 'প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি তাঁর লেখা শেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বর্তমান সময়ে তাৎপর্যবাহী এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করা হলো।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে
সাধারণের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থা আক্রান্ত — এ আক্রমণ রুখতে হবে

আমাদের চিরদিনের শশিদা

অমিতাভ সেন

গত ৩০শে জানুয়ারী আমাদের প্রিয় নেতা, সমিতির প্রবীণতম সদস্য শশিমোহন ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম জেলার কোয়েপাড়া গ্রামে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন দরিদ্র শিক্ষক পরিবারে তাঁর জন্ম। মাস্টারদার নেতৃত্বে বীর চট্টলার বিপ্লবীরা স্বাধীনতার জন্য যখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, কিশোর শশিমোহন ভট্টাচার্য তখনই তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারীর গুরুদায়িত্ব পালন করেন। জীবনে কোনো সংগ্রামেই তিনি মাথা নত করেন নি, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামেও নয়। দারিদ্র্যের জন্যই কলকাতায় এসেও স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৩৫ সালে তিনি শিক্ষকতাকে তাঁর জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৯২১ সালে অবিভক্ত বাংলায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে সমিতির নেতৃবৃন্দ শিক্ষকসমাজের কাছে যে রণধ্বনি দিয়েছিলেন তা ছিল সংহতি কার্যসাধিকা। সমস্ত শিক্ষকরা সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হও। তরুণ শশিমোহন শিক্ষকতার প্রারম্ভ থেকেই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং সমিতির পতাকাতলে শিক্ষক সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে ব্রতী হন।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সূর্য্য আলোকিত এক তৃতীয় পথের সন্ধান পান বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শোষণমুক্তি ও সমাজতন্ত্রের পথ। শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে দেশের মুক্তি নয়, সমস্ত শোষণ থেকে সমাজের মুক্তি। মাস্টারদা থেকে ভগৎ সিং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের অনেকেই সেই আলোকে আলোকিত হতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৫ সাল থেকে দেশবিভাগ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশের মুক্তির জন্য উত্তাল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কাল। এই সময়কালই আবার শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও সমাজমুক্তির আন্দোলন গড়ে ওঠা এবং বিকশিত হবার সময়। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে আসা সমিতির পতাকাতলে শিক্ষকদের সংগঠিত করার কাজে ব্রতী তরুণ শশিমোহন ভট্টাচার্যকে সমাজমুক্তির এই সংগ্রাম আকৃষ্ট করেছিল। তরুণ শশিমোহন ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও সমাজমুক্তির আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজেকে এই আন্দোলনের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। আর এই জন্যই তাঁর নিজস্ব শিক্ষক আন্দোলনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সময়ে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব বুঝে নিতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে যারা এপারে চলে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কৃতী শিক্ষকও ছিলেন। সত্যপ্রিয় রায়, শশিমোহন ভট্টাচার্য প্রমুখরাও ছিলেন। স্বাধীনতার পরে শিক্ষকদের কাছে 'শুধু আবেদন ডেপুটেশন নয়', শিক্ষকদের জীবিকার দাবীতে প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসেন সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমিতির নেতৃত্বের একটি অংশের মনে হয়েছিল প্রত্যক্ষ আন্দোলন শিক্ষক জনোচিত নয়, তারা বাধা দিয়েছিলেন। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ তারা করতে পারেন নি। সিদ্ধান্ত নিতে শশিদার ভুল হয়নি। ৫৪'র ঐতিহাসিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন হুগলী জেলার অন্যতম সংগঠক। এই আন্দোলনেই 'শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী' এই নতুন রণধ্বনি শিক্ষক আন্দোলনের নতুন দিক্ নির্দেশ করেছিল।

পঞ্চাশের দশকের শেষে সারা গায়ে ছাত্র আন্দোলনের গন্ধ মেখে আমি যখন শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার পর আমি দু'জন নেতাকে আন্দোলনে আমার শিক্ষাগুরু হিসাবে পেয়েছিলাম, যাঁরা সযত্নে, হাতে ধরে আমাকে বিদ্যালয়ে ও সংগঠনে একজন সংগঠকের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হয়। প্রথমে পেয়েছিলাম আমোদদাকে এবং পরে হুগলীর চাঁপাডাঙ্গা বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পরে শশিদাকে। এঁদের দু'জনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

১৯৬০ সাল থেকে শশিদাকে অনেক কাছে থেকে দেখেছি। এম এল সি নির্বাচনে সমিতির প্রার্থীর জন্য কাজ করতে চাঁপাডাঙ্গা থেকে ভাঙ্গামোড়া স্কুল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে, বৃষ্টিতে

ভিজে মাস্টারমশাইদের কাছে গিয়েছি। কাছে থেকে শিখেছি শিক্ষকদের সাথে, সমিতির সদস্যদের সাথে কথা বলা, তাদের সঙ্গে চলা।

১৯৬২-তে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের সময়ে সমিতির উপর আক্রমণ, '৬৬-৬৭ সালের আন্দোলন, ও '৬৭'র নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত করার সংগ্রাম, '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়কালে আন্দোলন, ১৯৭০ সালে চন্দননগরে সমিতিকে ভাঙার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং পরে নকশালপন্থী ও আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস পেরিয়ে '৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা— এই সমস্ত ঐতিহাসিক সময়ে শশিদার একনিষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছি। আমার মনে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন শশিদা জয় করে নিয়েছেন।

সমিতির অন্যতম নেতা অমূল্য লাহিড়ীর জীবনাবসানের পর থেকে পত্রিকা সম্পাদক পদে আমার দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত সমিতির পত্রিকার সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে শশিদাকে আরো কাছে থেকে দেখেছি। জেলায় জেলায় ঘুরে সমিতির সংগঠনের কাজে এই প্রবীণ মানুষটির কোনো ক্লান্তি ছিল না। একবার শশিদাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ত্রিপুরাতে ওদের শিক্ষক সম্মেলনে সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। বিমান ধরার সুবিধার জন্য আগের রাতে শশিদা আমার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন এবং এক রাতে আমার পরিবারের সমস্ত সদস্যের মন জয় করেছিলেন।

পত্রিকার কাজে পত্রিকার তখনকার দপ্তর কলেজ স্ট্রীটে নিয়মিত আসতেন। পত্রিকা সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করতেন, পত্রিকা প্রকাশের তদারক করতেন, আমাকে এবং পত্রিকা সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়মিত পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। আমার কোনো ভুল হলে সযত্নে ও সস্নেহে আমাকে সংশোধিত হতে সাহায্য করতেন। কোনোদিন তাকে উত্তেজিত হতে বা রাগ করতে দেখিনি। পত্রিকার ইংরাজি সম্পাদকীয় নিয়মিতভাবে তিনি লিখতেন এবং বেশীরভাগ সময়ে পত্রিকার দপ্তরে বসেই লিখতেন। শশিদা ইংরাজী লিখতেন সত্যপ্রিয় রায়ের মতো পুরোনো ধাঁচের ইংরাজীতে। আমার কাছে অপরিচিত অনেক শক্ত শব্দ ব্যবহার করতেন, নজর রাখতেন যেন ঠিকমতো ছাপা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধাসিধে। বয়সে অনেক কনিষ্ঠ আমাকে (এবং কনিষ্ঠ সকলকেই) 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। অনেক অনুরোধ করেও এই সম্বোধন 'তুমি'তে নামাতে পারিনি। এরকম আর দু'জন শ্রদ্ধেয় মানুষকে আমি দেখেছি। অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী এবং বিপ্লবী গণেশ ঘোষ। এই তিনজনেরই জীবনধারা ছিল একইরকম সরল এবং সাধাসিধে। আমি তাঁকে আমাকে 'তুমি' বলার জন্য অনুরোধ করাতে বলেছিলেন, কনিষ্ঠদের মধ্যেও একজন প্রবীণ থাকে, আমি তাকেই 'আপনি' বলি। এমন সুন্দর কৈফিয়ৎ আগে কখনো শুনিনি।

এই প্রবীণ মানুষটি কিন্তু নিজের মধ্যে একজন নবীনকে আজীবন সযত্নে লালন-পালন করেছিলেন। সঙ্কট বা পরাজয়ে কখনো বিহ্বল হতে দেখিনি, দেখেছি তার মধ্যে নবীন মানুষটিকে, নবীন উদ্যমে তাঁকে পরিশ্রম করতে, সংগ্রাম করতে।

অবসর গ্রহণের পর শশিদা কতইবা পেনশন পেতেন — বড়জোর আড়াই হাজার টাকা। অবসর গ্রহণের পরে এই নির্লোভ মানুষটি প্রথম বিষয় ছিল 'এত টাকা দিয়ে কি করবো?' তাঁর সামান্য আয় ও সঞ্চয় থেকে তাঁর এলাকায় বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

শশিদা অসুস্থ হবার পরে দু'দিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেক কথা বলেছিলেন। সমস্ত পুরোনো দিনের কথা। খুব বেশীক্ষণ থাকিনি। অসুস্থ শশিদাকে কথা বলতে না দিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম।

এখন মনে হয় কেন এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম। শশিদা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। তিনিই দীর্ঘদিন সময় সমিতির বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। দিয়েছেন অনেক কিছু। শশিদার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের শিক্ষা আমাদের অমূল্য পাথেয়। সামনের কঠিন সংগ্রামে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁর জীবনবোধ, তাঁর সংগঠন চেতনা, তাঁর শিক্ষাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

দিনাজপুরের হেমপ্রসন্ন ঃ একটি লুপ্তপ্রায় অধ্যায়

ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, দক্ষিণ দিনাজপুর

১৯৫৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষকতায় আসার পরই জানলাম নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদক কালিয়াগঞ্জ পার্বতীসুন্দরী হাইস্কুলের স্নাতক সহ-শিক্ষক হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী। হেমবাবু দিনাজপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কালিয়াগঞ্জে রেল স্টেশন গেটের সামনে বিশাল জায়গা নিয়ে তাঁদের চালের কল ও বাড়ি। সাথে তার নিজস্ব একটা 'চক্রবর্তী প্রিন্টিং প্রেস'। নামকরা লোক। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (WBPCC) সদস্য। এহেন জাঁদরেল ও হেভিওয়েট ব্যক্তিত্ব আমারও প্রিয় সমিতি এ বি টি এ'র জেলা সম্পাদক। তাঁর সম্ভ্রম ও জেলাব্যাপী পরিচিতির আলোকে তাকে আমারও 'হিরো' মনে হয়েছিল সেদিন।

১৯৫৮ সালে হরিরামপুর এ এস ডি এম ই হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক অঞ্জন বসুর উদ্যোগে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা এ বি টি এ'র জেলা সম্মেলন। প্রয়াত যামিনী মজুমদারের হাত ধরে হাতে খড়ি নিয়ে আমিও হাজির হয়েছিলাম সেই সম্মেলনে। সেদিন পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় মাধ্যমিক স্তরে আমরা দু'জনই মাত্র কমিউনিস্ট শিক্ষক এবং যামিনীদা আমাদের সংগঠক ও নেতা। আমি সদ্যগঠিত জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম অমৃতসর বিশেষ পার্টি কংগ্রেসের ফলশ্রুতিতে জেলা কাউন্সিল গঠনকল্পে।

অনিলাদিকে এই সম্মেলনে প্রথম পাই। তাঁর সুললিত কণ্ঠে অগ্নিস্রাবী বক্তব্য আমাকেও মুগ্ধ করে। আজও তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে রয়েছি। সেই সম্মেলনে হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তীর সাথে আমাকে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেন যামিনীদা। ঐ যে তাঁর পাছে লেগে গেলাম তাঁর ছেদ ঘটলো গত ২৮শে জানুয়ারীর গোধুলী বেলায় তাঁরই গৃহের শেষ সজ্জায়।

উত্তর দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় সমূহের শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে যোগদান করে ফেরার পথে সেদিন বিকেলে গেলাম তাঁর কাছে। হেমদা আমাকে চিনতেই পারলেন না। বৌদি কত করে কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, 'ধীরেন এসেছে, বালুরঘাটের ধীরেন। যার বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। হেমপ্রসন্ন নীরব, নিথর জীব সে মুহূর্তে। চোখের জল গোপন করে সত্বর বেরিয়ে এলাম বিদায় জানিয়ে। বৌদির ছল্‌ছল্‌ চোখ মনে পড়ে। বেড়িয়ে সঙ্গের অভিজিৎ মুখার্জী ; প্রধান শিক্ষক, বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ; প্রসাদ সরকার, ঐ স্কুলের সহ-শিক্ষক এবং অসীমাভ সরকার, সহ-শিক্ষক, কুনোর হাইস্কুল। এদের বললাম, এই হেমবাবুর সাথে আমার শেষ দেখা সাক্ষাৎ। আর উনি উঠবেন না। বিষণ্ণ চিত্তে জীবনের ৪৭টি বছরের একান্ত কাছের সহযাত্রী নেতাকে সেদিন আগাম বিদায় জানাতে হলো। এ ব্যথা কেউ বুঝবে না।

অধুনা পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমিতির ভিত পোক্ত করার কাজে যারা নিরলস আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন তাঁদের 'মেরিট লিস্ট' করতে পারব না। কাছে থেকে বিগত ৪৭ বছর যা দেখেছি ও জেনেছি তা হলো বালুরঘাটের ধীরেন ভট্টাচার্য (পণ্ডিতমশায় নামে খ্যাত), হিলি আর এন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ শীল, বালুরঘাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিশীথবাবু, খাসপুর হরেকৃষ্ণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের রমেন লাহিড়ী, নয়াবাজারের বিশ্বমোহন রায়, বালুরঘাটের ভবানী তলাপাত্র, যোগেন দাস, নগেন ঘোষ প্রমুখদের ও হরিরামপুর হাইস্কুলের অঞ্জন বসু, হেমবাবুর নিজের স্কুলের জাঁদরেল প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও রায়গঞ্জের বটুবাবু। এরপর ষাটের দশকের শেষ দিকে পেয়েছি বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, দীপক চ্যাটার্জী, নির্মল মুখার্জী, শচীন মজুমদার, অনুকূল ভৌমিক, শিবশঙ্কর কানু, অশ্বিনী ধর এবং আরও অনেককে। সবার কথা একসাথে মনে পড়ছেও না।

হেমবাবু ছিলেন এইসব তারকাদের সম্মিলন। ধীর, স্থির, সহজে উত্তেজিত হন না, যাকে সত্য বলে মনে করেছেন তা

আকড়ে থাকতেন। সবার সাথে মিশতে পারতেন হাসি-ঠাট্টার সাথে। ভাল বলতেন। এই জেলায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে সত্যিকারের শিক্ষার স্বার্থে কাজে গড়ে তোলার তাঁর কর্মপ্রয়াস অনবদ্য। নিজে নিষ্ঠার সাথে পড়াতেন, খাতা দেখতেন। সাথে সাথে সমিতির কাজও করতেন। স্কুল বাদ দিয়ে আজকের মত তিনি নেতৃত্ব করেন নি। অনেকবার তাঁর স্কুলে গেছি। গিয়ে জেনেছি তিনি পড়াচ্ছেন এবং পরপর তিনটি ক্লাস নেবেন সমিতির কাজে বাইরে যাবার জন্য। বসে থেকেছি, সবার মন্তব্য জেনেছি। হেমবাবু জাত শিক্ষক বলে তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা সেদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাজে আপনা থেকেই এগিয়ে এসে পাঁশে দাঁড়াতেন। জেলার প্রায় নব্বই ভাগ স্কুলে তাঁর সাথে গেছি, তাঁর পরিচয়ের ব্যাপকতায় মুগ্ধ হয়েছি। সে মানুষটি আজ নেই।

হেমবাবুকে কেউ কোনদিন কমিউনিস্ট বলেনি। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ছিল কংগ্রেস ঘরানার। হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী কমিউনিস্ট সৃষ্টিতে নিরলস সাহায্য করে গেছেন। নিজের স্কুলের উৎসাহী নবীন সহকর্মীদের তিনি নিজ কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিতেন। কাজের মধ্যদিয়ে আন্তরিকতার সাথে তাঁদের কাছে টানতেন। গণ-আন্দোলনের জোয়ারে এ বি টি এ'র ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৭০ ইত্যাদি সময়কালগুলির ঝোড়ো হাওয়ায় সেইসব সহকর্মীদের অনেকেই কমিউনিস্ট হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। শচীন মজুমদার (মন্টু) সেই অভিযানের ফসল, সার্থক রূপায়ণ। দুরারোগ্য ক্যান্সারে অকালে ঝরে গেল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির এই প্রিয় নেতাটি। সে দুঃখও বয়ে চলেছি।

১৯৬১ সালে সমিতির আন্দোলন প্রস্তুতির মুখে বালুরঘাট মহকুমা সম্পাদক ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য দায়িত্বপালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলে ধীরেন ভট্টাচার্য ও হেমবাবুর অনুরোধে আমাকে মহকুমার ভার নিতে হয়। তখন আমার বয়স ২৫ বৎসর। যামিনীদা পাশে আছেন সেই ভরসায় পুলিস এড়িয়ে আমাদের প্রচার সংগঠনের কাজ হতো। সেদিন ছিল রাজকীয় সন্ত্রাস। আজ তা অন্যকে উপলব্ধি করানো শিবের বাপের অসাধ্য।

১৯৬৬সালের আন্দোলনে কলকাতায় আমাদের জেলা থেকে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী পাঠাতে হতো। বালুরঘাট মহকুমার ভার আমার উপর। প্রতিদিন বেলা ১০টার বাসে পাঠানোর জন্য টাকা-ফুল-মালা নিয়ে বালুরঘাটে আমাকে ও কালিয়াগঞ্জে হেমবাবু, কানুবাবু প্রমুখরা 'রেডি' থাকতেন। তারপর বুনিয়াদপুরে দুই স্থানের স্বেচ্ছাসেবীদের মিলন ঘটায় আমরা যার যার জায়গায় ফিরতাম। সব নজীর হয়তো এ বি টি এ'র সেদিনের কাগজপত্রে আজও আছে।

তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মত ছিল না। নানা কাজে কালিয়াগঞ্জে হেমবাবুর কাছে যেতে হতো এবং অনেক বার থাকতে হতো। ঐ বাড়িতে থেকেছি এবং বাড়ির সামনের হোটেলে খেয়েছি। বাড়ি ও হোটেল আজও আছে। কিন্তু অনুঘটক হেমপ্রসন্ন নেই গত ৯ই ফেব্রুয়ারীর ভোরে। দিনাজপুরের হেমপ্রসন্ন কর্মজীবনের ক্লান্তিতে অবসন্ন। বিষণ্ণ চিত্তে সবাইকে ছেড়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন এক ধূসর গোধূলীতে। স্মৃতি তাঁর কারও কারও কাছে রয়ে গেল অম্লান। পারিবারিক জীবনের হতাশার কথা আমাকে একান্ত অন্তরঙ্গ ভেবে বারবার বলতেন। ছেলেটির হওয়া চাকুরী হলো না। সরলাসুন্দরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল গুহ তাঁর স্কুলের একটি করণিকের পদে হেমবাবুর ছেলেকে নিতে গেলে প্রবল বাধা আসে। হেমবাবু বড়লোক, তাঁর ছেলের চাকুরী দেওয়া যাবে না। আজও সে ছেলে বেকার। এই ব্যথা তাঁর ছিল। আজীবন অনেকের জন্য অনেক কিছু করেও তিনি তো কোন কিছু পান নি, তা বলতেন। অন্য একটি পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা বারংবার আমাকে বলে তাঁর অন্তরের কোন কোন বাসনা মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো সেসব ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনার কথা আমাকে কাছের লোক ভেবে বলতেন। আমার বাড়িতে বৌদিকে নিয়ে একবার থেকেও গেছেন। খুব কাছ থেকে হেমবাবুকে জানি। অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে, লিখতে চাই। পারি না, কলম আটকাবে। নীতিহীনতা যদি নীতি নিয়ন্ত্রণ করে তার নীতিনিষ্ঠদের যে বেদনা — অনেক কিছুতেই সে কারণে হেমবাবু আহত হতেন। সেসব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি আমাকে বলেছেন। প্রয়াত নগেন ঘোষ মহাশয়ের সাথেও আমার ১৯৫৭সাল থেকে পরিচয়। যামিনীদার নির্দেশে তাঁকে সমিতিতে নিয়ে আসার কাজে আমাকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয়। ১৯৬০সালে মেদিনীপুর সম্মেলনে অনিলাদি, মীরাদি, সন্তোষদাদের সহায়তা নিয়ে নগেনবাবুকে আমরা অন্যতম সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনে দাঁড় করাই। সম্ভবত সমিতির জীবনে এই ধরনের নির্বাচন এটি অনন্য হেমবাবুকে বিষয়টি বলায় তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করেন। নগেনবাবু তখন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার হিলি গার্লস স্কুলের শিক্ষক। এই নির্বাচনে নগেনবাবু জয়ী হন। হেমবাবু তারপর নগেনবাবুকে নিয়ে এই জেলার অনেক স্কুলে সংগঠনের কাজে গেছেন। হেমবাবু সবাইকে নিয়ে চলতে পারতেন। রাজনীতির উর্ধে ছিল তাঁর আবেদন। সত্যপ্রিয় রায়ের খুব প্রিয় ছিলেন হেমবাবু। ১৯৭৮সালে কালিয়াগঞ্জে সমিতির রাজ্য সম্মেলনের স্থান নির্বাচন ও সেই

কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারী হেমবাবু অনেক নতুন নতুন নেতৃত্ব তৈরীর কাজ করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই আজ সমিতির কর্ণধার গোষ্ঠী। একজনের সাথে দীর্ঘকাল ধরে ঘুরলে অনেক স্মৃতি জমে। সব প্রকাশরীতি বিরুদ্ধ। তাই হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তীর কার্যকলাপের ব্যাপারে কাছে থেকে যারা তাঁকে পেয়েছেন আমি বোধহয় তার মধ্যে বিরল জীবিত। ১৯৮৮ সালে গঙ্গারামপুরে জেলা সম্মেলন থেকে তিনি সমিতির সম্পাদক পদ ছেড়ে দেন। শচীন মজুমদার সম্পাদক হন। সেদিন অনিলাদি সম্মেলনে ছিলেন। সেও এক ইতিহাস।

১৯৫২ সালে সমিতির এই জেলায় আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫৪ সালে সম্ভবত শিলিগুড়িতে রাজ্য সম্মেলনের পর সমিতির আজিকার রূপরেখার 'ড্রাফট' তৈরী হয় এই জেলায়। হেমবাবু দায়িত্ব নেন। সেদিন সেই দায়িত্বভার নেবার সভায় হাজির ছিলেন অনিলা দেবী। হেমবাবু বিদায় নেবার দিনও যাতে অনিলাদি হাজির থাকেন তার ইচ্ছা হেমবাবু আমাকে বলেন জেলা কমিটির শেষ সভা-শেষে নিজ গৃহ বসে। কথা মত কাজ হয়। আগমনে অনিলাদি, বিসর্জনে অনিলাদি। এক্ষেত্রে হেমবাবুর বাসনাপূরণ টইটম্বুর, আজ তিনি নেই। নিজেকে একা মনে হয় ঐসব স্মৃতি ভাসলে। অনেকের মতই আনুষ্ঠানিক স্মৃতিচারণা দিয়ে একদিন দিনাজপুরের হেমপ্রসন্নও স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবেন। তাঁর উৎসাহ, কর্মকুশলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতার ধারা, উদারতা, ত্যাগ ও নিষ্ঠা কি কেউ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে আজকের অঢেল সহজ সরল পথে সমিতি পরিচালনার কাজ করার কালে বা তারও পরে? মহাকাল কি নিরুত্তর থাকবে অতীত দিনের স্বর্ণালি মুহূর্তগুলির প্রয়োজন আছে কি নেই প্রশ্নে? 'কেউ মনে রাখে না' প্রবীণের কাছে এই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী অমোঘ বাণী ধ্রুব সত্য। অবশ্য পরিবর্তনের স্রোতে জীবন-যাপন প্রণালিতে এই ভোগসর্বস্ব দুনিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠার একক তাগিদে মনে রাখার প্রয়োজনও ফুরিয়ে আসছে। নস্ট্যালজিয়াটা শুধু আমাদের মত অস্তগামীদের অতিষ্ঠ করে মাত্র।

সত্যপ্রিয় রায়, অনিলাদি, অমূল্য বসু, এ আর রায়, সন্তোষদা, গোলোকদা, রথীনদা, অমিতাভ, সন্তোষদা (চ্যাটার্জী)-দের উপস্থিতিতে হেমবাবুকে নিয়ে কোন কাজে সমিতির ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে গেছি সেদিনের স্মৃতিটুকুই জমে থাক দিনাজপুরের হেমপ্রসন্নর জন্য। এই পরিচয়েই হেমবাবু প্রবীণ মহলে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সব সমস্যায় আমাকে নিয়ে আলোচনান্তে বলতেন শৈলেনবাবুকে স্মরণ করতে। জেলা সদর বালুরঘাটে, সমিতি কার্যালয় কালিয়াগঞ্জে। ফলে জেলার সব কাজ আমাকে বালুরঘাট জেলা সদরে সামলাতে হতো। আর তার জন্য হেমবাবু আমাকে বরাত করে দিতেন শৈলেন দাশশর্মাকে। আজ সব ভাবনা স্থানুর হয়ে গেল হেমবাবুকে নিয়ে। যারা আজ হাল ধরে আছেন তারা এগোবেন। হেমবাবুরা হারিয়ে যাবেন কালের অমোঘ নির্দেশে। তবুও মেনে নিতেই হবে সমাজ বাস্তবতা। এই তো পরম্পরা।

নিন্দা, ধিক্কার

ঢাকায় মৌলবাদীদের সশস্ত্র আক্রমণে গুরুতর আহত বিশিষ্ট লেখক, কবি হুমায়ুন আজাদ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি, রাতে একুশের বইমেলা থেকে হেঁটে রাত দশটা নাগাদ লেখক, কবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ হুমায়ুন আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে নিজের আবাসনে ফিরছিলেন সেই সময় অজ্ঞাত পরিচয় তিন জন আততায়ী তাঁর ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। তিনি গুরুতররূপে আহত হন। তিনি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হবার পর ৫ ঘন্টা ধরে অস্ত্রোপচার করা হয়। গত ৪ঠা মার্চ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ডঃ আজাদ ৪০ শতাংশ বিপদমুক্ত।

ইতোমধ্যেই দুই বাংলায় মৌলবাদীদের আক্রমণে গুরুতর আহত ডঃ আজাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সভা-সমাবেশ হয়েছে। ঐ সভা-সমাবেশগুলিতে এই আক্রমণকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। গত ৪ঠা মার্চ ঢাকার চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বকুলতলায় ধিক্কার সমাবেশ করে বলেছেন ঃ প্রয়োজনে তুলি ছেড়ে অস্ত্র ধরব। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ উচ্ছেদ করতে, আর একটা মুক্তিযুদ্ধের দরকার হলে এবার তাই হোক। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর এই বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে, তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে।

১৯৫৪ সালের বারোদিনব্যাপী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচয় ঃ প্রাক্তন সহ-শিক্ষক, বালিজোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয় (উচ্চ-মাধ্যমিক), গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া।

শিক্ষক-জীবনের শুরু ১৯৫০-এর ২রা ফেব্রুয়ারি।



প্রশ্ন ঃ আপনি যখন শিক্ষকতায় এলেন তখন মাসিক বেতন কত ছিল ?

শ্রীঘোষ ঃ বেতন ৬০ টাকা, ডি এ ১০ টাকা (৫টাকা দিত স্কুল আর ৫ টাকা সরকার)।

প্রশ্ন ঃ কত সালে এ বি টি এ'র সদস্য হন ?

শ্রীঘোষ ঃ ১৯৫৩ সালে।

প্রশ্ন ঃ আপনার পরিবারের কেউ কি শিক্ষকতা করতেন ?

শ্রীঘোষ ঃ না।

প্রশ্ন ঃ সহকর্মী ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল ?

শ্রীঘোষ ঃ ভালই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সেইসময় কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ?

শ্রীঘোষ ঃ ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের কোনো কোনো কাজে সহায়তা করতাম!

প্রশ্ন ঃ ১৯৫৪ সালের আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব কিভাবে শুরু হয় ? এই আন্দোলনে আপনার ভূমিকা কি ছিল ?

শ্রীঘোষ ঃ ১৯৫২ থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে কর্মবিরতি শুরু হয়। এই সময় শিক্ষকদের সরকারের দমনপীড়ন সহ্য করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ এই আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষরা কিভাবে সহযোগিতা করেছিলেন ?

শ্রীঘোষ ঃ ট্রাম শ্রমিক ও বাটার শ্রমিকরা ৫৪'র আন্দোলনে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ান।

প্রশ্ন ঃ স্বাধীন ভারতের তৎকালীন সরকারের এক্ষেত্রে কি ভূমিকা ছিল ?

শ্রীঘোষ ঃ ভারত সরকার আমাদের পক্ষে ছিল না। একমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট নেতারা আমাদের আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আরও একটু ব্যক্ত করুন।

শ্রীঘোষ ঃ জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী শ্রমিক নেতারা এই আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন। তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষকরা এই আন্দোলনে সর্বরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন শিক্ষক এই অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ হরেন মুখার্জী তখন রাজ্যপাল। রাজভবনের সামনে রাস্তায় অবস্থান চলছিল। ডাঃ বি সি রায়ের পুলিশ ঐ অবস্থানের ওপর লাঠিগুলি চালায়। সেইগুলিতে বড়বাজার স্কুলের একজন বৃদ্ধ শিক্ষক নিহত হন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

অকাল লোকসভা নির্বাচনে পরাস্ত করতে হবে 'ফিলগুড'-এর ফেরিওয়ালা বি জে পি ও তার সঙ্গীদের

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া

সম্প্রতি তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে বি জে পি মনে করল ঝুঁকি না নিয়ে এখনই লোকসভা নির্বাচনটা করে নিই। তাই চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন ৬/৭ মাস এগিয়ে আনল। আর বি জে পি'র সিদ্ধান্ত মানে এন ডি এ'র সিদ্ধান্ত। মেয়াদ শেষ হবার আগে কেন লোকসভা ভেঙে দেওয়া হলো তা জানার অধিকার মানুষের আছে। মানুষেরও জানা উচিত নির্বাচন এগিয়ে আনার পিছনের কারণ কি ! আসলে রাজনৈতিক সংকট এবং অস্থিতিশীলতা এড়াতেই এগিয়ে আনা হয়েছে নির্বাচন। বি জে পি মনে করছে এই মুহূর্তে নির্বাচন করলে তাদের ফল ভাল হবে, তারা একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে লোকসভায়। অতএব নির্বাচন হোক। তাই নির্বাচন কমিশনের অনুরোধকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে গত দু'মাস ধরে জনগণের দেওয়া করের টাকায় সংবাদমাধ্যমে প্রচার চলছে যে জনগণ বেশ সুখেই আছে বি জে পি জোটের জমানায়। ইতোমধ্যে ৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছে নির্বাচনী বিজ্ঞাপনে। অথচ এই বিপুল অর্থ অনায়াসে কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যবহার করা যেত। মানুষ যদি সুখেই আছে তাহ'লে নির্বাচন এগিয়ে আনা হল কেন ? আসলে বি জে পি তার কুকীর্তিতে আতঙ্কিত। কংগ্রেসও তার শাসনকালে নির্বাচনের আগে সরকারী অর্থে মিথ্যা প্রচার করেছে। প্রায় ৪৫ বছর ধরে সরকার পরিচালনা কালে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সেবা করাকেই কংগ্রেস লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের শাসন জনগণের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর 'গরিবী হঠাও' স্লোগান (যে স্লোগানে গরিবই হঠে যাচ্ছিল) সাময়িক নির্বাচনী সাফল্য দিলেও শেষ পর্যন্ত মানুষ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এ রাজ্যে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস নামিয়ে আনার কথা কোনো দিন ভুলতে পারবে না। জরুরী অবস্থা জারি করে ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিলেন, বিরোধীদের কারারুদ্ধ করেছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও কারাবাস করিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ভারতবাসী এসব অত্যাচারের কথা ভোলেনি, ভুলতে পারে না।

বর্তমানে কংগ্রেসরই একটা অংশ 'তৃণমূল' নাম ধারণ করে বি জে পি'র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাঁদের নেত্রী বি জে পি নেতাদের চরণের নুপুর হয়ে বাজছেন। কংগ্রেসের নেতাদের কণ্ঠেও খুনের হুমকি শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেস-তৃণমূল-বি জে পি পরস্পরের সঙ্গে দলবদলও করে চলেছে। জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারটা এদের মাথায় নেই।

সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদে পরিণত হয়েছে বাজপেয়ী সরকার।

এদিক থেকে বি জে পি কংগ্রেসকেও হারিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রকাশ্য অবস্থান কখনো নেয়নি। এ ব্যাপারে কংগ্রেস কখনো সাম্রাজ্যবাদীদের তোয়াজ করেছে আবার কখনোবা দ্বিধাগ্রস্ততা দেখিয়েছে।

তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে বি জে পি'র তফাৎটা কোথায় ? তফাৎটা এইখানে যে, বি জে পি উগ্র হিংস্র, ফ্যাসিস্ত সাম্প্রদায়িকতা করে, কংগ্রেস অতটা করে না, প্রচার না করলেও মুখে অন্তত ধর্মনিরপেক্ষতার কথাটা বলে। প্রয়োজন হলেই কংগ্রেস-বি জে পি-তৃণমূল মহাজোট করে। এই 'মহাজোট' কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দু মৌলবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করছে কংগ্রেস, আবার কেরালায় মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গে মিলে কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে। কপটতায় বি জে পি ও কংগ্রেস যুগ্মভাবে প্রথম। কংগ্রেসের কি সাহস আছে মহাজোট ভেঙে বেরিয়ে আসার ?

সংবিধান পরিবর্তন করে ফ্যাসিস্তরাজ কায়েমের লক্ষ্যে এগোচ্ছে বি জে পি। তাই চাইছে তাদের দল চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক। গণতন্ত্রকে লুপ্ত করে দেবে বি জে পি। ভারতীয়দের সামরিকীকরণ তার ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার উপায়। লক্ষ্য 'হিন্দুরাষ্ট্র' স্থাপন। ১৯৮৭-১৯৯৫ সালে দানবীয় 'টাডা' আইন হয়েছিল। ২০০১ সালে আরও ভয়ঙ্কর 'পোটো' আইন সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে তৈরি হয়। এর প্রয়োগ করা হয় গুজরাটে আক্রান্ত পরিবারগুলির বিরুদ্ধে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে নয়। সন্ত্রাসের জন্য চক্রান্তকারী মনে হলেই, কিংবা কোথাও সন্ত্রাসকে সহায়তা করছে মনে করলেই তাকে বিনা বিচারে আটক করা যাবে, পাঁচ বছর দণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যাবে।

বলা বাহুল্য, দেশের বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি কংগ্রেস-বি জে পি-তৃণমূলের বৃহৎ ধনীতোষণ নীতির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। জাতীয় ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার প্রধান স্তম্ভ বামপন্থীদের আজ এই দানবীয় শক্তির মুখোশ খুলে দিতে হবে ব্যাপক প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে।

দেখা যাক, ভারতবাসী বি জে পি-জোট সরকারের জমানায় কতটা সুখে আছে।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের মিথ্যা ফানুস

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গত মিনি বাজেটে কৃষিতে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বলে ফানুস ওড়ালেন। কিন্তু কতদিনে এই টাকা ব্যয় হবে, টাকা দেবে কে, তার কোনো উল্লেখ নেই। আকারে ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে এরজন্য নাকি একটা তহবিল গড়া হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে। কৃষি পরিকাঠামোয় বিনিয়োগকারীদের সেই তহবিল থেকে বাজারের তুলনায় ২ শতাংশ কম সুদে ঋণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকা কম সুদে দেওয়া হবে বেসরকারী সংস্থাকে। সস্তায় টাকা নিয়ে পরিকাঠামো তৈরি করে এরা মোটা টাকার বিনিময়ে কৃষকদের পরিষেবা দেবে। অর্থাৎ কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের নামে বেসরকারী সংস্থাকে ৫০ হাজার কোটি টাকা পুঁজি সরবরাহ করা হবে তাদের মুনাফার জন্য। নীতিটা হল ঃ 'তোর কড়ি মোর বুদ্ধি ফলার করি আয়।'

বলা হচ্ছে, কৃষকদের ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে। সেই কার্ড দেখিয়ে কৃষকরা ধান নিতে পারবে। বর্তমানে উদারনৈতিক বাজার ব্যবস্থায় অকাতরে ঋণদান করতে সব সময় প্রস্তুত সব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ঋণ নেবার মত মানুষ কোথায় ? সিংহভাগ মানুষের ঋণ নিয়ে ফেরত দেবার ক্ষমতা নেই। দরিদ্র, কর্মহীন, ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তারা কি করে ঋণ নেবে ? নয়-এর দশকের মধ্যভাগ থেকেই দেশের অধিকাংশ স্থানে কৃষি এখন পুরোমাত্রায় অলাভজনক। কৃষকেরা কোনোক্রমে টিকে আছেন শুধু নিজেদের পরিবারের লোকদের সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফলে। বিদ্যুৎ, রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ ইত্যাদির ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়মূল্য সংস্কারের সময় হয় স্থির হয়ে আছে অথবা কমে গেছে।

বাজপেয়ী সরকারের উদারনৈতিক শাসনকালে কৃষি পরিকাঠামো ও গবেষণা উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কমেছে। ১০ বছর আগে কৃষিতে বিনিয়োগ ছিল জি ডি পি-র ১·৬ শতাংশ, এখন কমে হয়েছে ১·৩ শতাংশ। ৮-এর দশকের তুলনায় এখন গ্রাম উন্নয়নে ব্যয় ৬০ শতাংশ কমে গেছে।

নির্বাচনী বিজ্ঞাপনে বাজপেয়ী সরকার বলছে ঃ 'আমাদের কৃষকরা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করছে যাতে দেশে কেউ অনাহারে না মরে।' কিন্তু নির্মম সত্য কি ?

গত পাঁচ বছরে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সংকটাপন্ন। কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডারে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য মজুত আছে এটা যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি এটাও সত্য যে এখনও দেশের ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ

অনাহারে দিন কাটান। Food and Agricultural Organisation (FAO) 'The State of Food Insecurity in the World 2003' নামক প্রতিবেদনে বলেছে : "Over a fifth of India's population still suffers from chronic hunger." উদারনীতির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শুধু মহারাষ্ট্রেই ৮০০০-এর বেশী শিশু অপুষ্টিতে মারা গেছে। গত তিন বছরে রাজস্থানে প্রায় ২ হাজার কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে দেনার দায়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের তিন গ্রামে বেন্তাছিনতালা, খান্তামপাডু এবং মাছেরলাতে ১০০ জনের বেশী কৃষক নিজেদের কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৯৭-২০০০ এই চার বছরে অন্ধ্রপ্রদেশের কেবল অনন্তপুর জেলাতেই ১৮২৬ জন প্রান্তিক চাষী দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছেন। কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, মধ্য প্রদেশ, কর্ণাটক, পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতেও। FAO-র প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি বেড়ে যাওয়ায় ভারতের আজ ঠাঁই হয়েছে হণ্ডুরাস এবং মালির পাশে। আবার এই ভারতেরই ৫০ হাজার এমন মানুষ আছেন যাদের প্রত্যেকের সম্পত্তি বা সম্পদের পরিমাণ দশ লক্ষ ডলারেরও বেশী।

১৯৯৩-৯৪ সালে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ছিল ১৭৭ গ্রাম, এখন তা কমে ১৫৩ গ্রাম হয়েছে। অপরদিকে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবে এদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিতে খুব কম দামে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হচ্ছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা 'অন্নপূর্ণা যোজনা' (২ কোটি গরিব মানুষকে কম দামে খাদ্যশস্য সরবরাহ করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি) মুখ থুবড়ে পড়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় বলা হয়েছে ২০০১-২০০২ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে ২৭·৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০০-২০০১ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ২৪·৪ শতাংশ।

ভূমিসংস্কারের কথা মুখেও আনে না বাজপেয়ী সরকার। উল্টে কর্পোরেট ক্ষেত্রের হাতে ভূমির মালিকানা তুলে দিতে নানা রকম আইন চালু করা হচ্ছে। দলে দলে গরীব প্রান্তিক কৃষক ও আদিবাসীরা জমি হারাচ্ছেন।

বাজপেয়ী-আদবানীরা যে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তা আসলে দেশের ৬০ কোটি কৃষকের মৃত্যু পরোয়ানা। তারা যে কৃষি সংস্কারের কথা বলছে তার আসল কথা হল : (১) ঠিকা চাষ ব্যবস্থা চালু করা, (২) রপ্তানি নির্ভর ও শিল্পের চাহিদামতো চাষ, (৩) ল্যাণ্ড শেয়ারিং কোম্পানি গঠন ইত্যাদি। বেসরকারী-সংস্থা কৃষিতে বিনিয়োগ করবে, বিরাট মুনাফার লোভে তারা কৃষকদের কাছ থেকে জমির ইজারা নিয়ে তাদের মুনাফার উপযোগী ফসল ফলাবে আর কৃষকদের মজুর হিসাবে ব্যবহার করবে। মুনাফা বাড়াতে কৃষকদের মজুরি কমাবে ও শ্রমদান বাড়াবে। বাজপেয়ীরা এরই নাম দিয়েছেন 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'। বাজপেয়ীদের দুঃশাসনে ৫ বছরে উৎপাদন তো বাড়েই নি বরং হ্রাস পেয়েছে। এমনকি চলতি আর্থিক বছরে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবার পরও যে পরিমাণ কৃষি উৎপাদন হচ্ছে তা ২০০১-২০০২ সালের থেকেও কম।

অর্থমন্ত্রী ৫০ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামো ও শিল্পপণ্য উৎপাদন তহবিল, ৫০ হাজার কোটি টাকার কৃষি পরিকাঠামো তহবিল এবং একটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল গড়ার বৃহৎ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এটা মিষ্টি ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ বাস্তবে এই সব ক'টি তহবিলের জন্য গোটা আর্থিক বছরে বাজেটে বরাদ্দ মাত্র ২২০০ কোটি টাকা। সম্পদ সংগ্রহের সত্যিকারের কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক্-নির্বাচনী চমক হিসাবে এই সব প্রকল্প ঘোষণা করছেন।

কারা সুখে আছে ?

'ভারত উদয়' বিজ্ঞাপনে যে 'ঝলমল' ভারতকে দেখানো হচ্ছে তা অলীক। জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ উপকৃত হয়েছে। আর সেটাকেই সমগ্র ভারতবাসী 'সুখে আছে' বলে দেখানো হচ্ছে। যাদের 'সুখে আছে' বলে দেখানো হচ্ছে তারা সমগ্র জনসংখ্যার ১০ শতাংশ যাদের বেশিরভাগই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা বাস করেন বড় বড় শহরে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেসী অপশাসনে ও পরবর্তী কালে বি জে পি-র বুজরুকিতে ভারতে ধনতন্ত্রের যে অসম বিকাশ ঘটে চলেছে তাতেই এই ১০ শতাংশ উপকৃত হয়েছে। যাদের 'না ছিল চুলা না ছিল চাল' তাদের কোনো উন্নতি হয়েছে কি? ১৯৯১ থেকে সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর উদারীকরণ নীতির অনুসরণ করা হচ্ছে গত এক দশক ধরে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে। তবে তার আগে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ শুরু হয়। বর্তমানে তার ফল ফলছে। দেশে বাড়ছে ধনবৈষম্য। 'তেলা মাথায় তেল' ঢালা হচ্ছে। বর্তমান এন ডি এ সরকার যে

অর্থনৈতিক কৌশল নিয়েছে, তাতে শুধুমাত্র বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা যোগানের মৌলিক দায়িত্ব থেকে সরকারকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি, ধনীদের বিশেষত বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে কর ছাড় এবং নানা রকম সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে তাদের আয় বাড়ে, বাড়ে ভোগের ক্ষমতা। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমন্বয় এই সুবিধাভোগী অংশের জন্য চাকুরীর সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, আর্থিক ও অন্যান্য পরিষেবা এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর কাজকর্ম সম্প্রসারিত হয়েছে। আর এদেরই সুখী মুখগুলো বিজ্ঞাপনে দেখিয়ে ভোট চাইছে বি জে পি ও জোটসঙ্গীরা। বাস্তব পরিস্থিতি আড়াল করতে তারা এই কুকীর্তি করে চলেছে।

প্রাক্-নির্বাচনী উপহার হিসেবে একগুচ্ছ কর ছাড় ও ব্যয় বরাদ্দের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁর এসব ছাড়ে উপকৃত হবেন জনসাধারণের ঐ অতি ক্ষুদ্র অংশ। সব থেকে বেশী কর ছাড়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বহিঃশুল্কের ক্ষেত্রে। কৃষিপণ্য নয়, এমন পণ্যের ওপর বহিঃশুল্কের সর্বোচ্চ হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ২০ শতাংশ। বহিঃশুল্ক আর এক দফা কমানো হয়েছে সেলুলার ফোনের ক্ষেত্রেও। এছাড়া বিদেশ থেকে দেশে আসার সময়ে মালপত্র হিসাবেই ল্যাপটপ কম্পিউটার আনা যাবে। সরকার অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ কর ও বিদেশ ভ্রমণ কর সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছে, অর্ধেক করে দিয়েছে বিমানের জ্বালানির ওপর উৎপাদনশুল্ক বা অন্তঃশুল্কের হার। এর কোনো প্রয়োজন ছিল কি? এতে 'হারু শেখ, রামা কৈর্বত'-এর কি উপকার হবে? কমবে বিমানের ভাড়া। খুশী হবে ঝাঁ-চকচকে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সরকার বিদেশ থেকে বিনাশুল্কে মদ আমদানির ব্যবস্থা করেছে দ্বিগুণ পরিমাণে। উদ্দাম উত্তাল সুখ-সায়রে অবগাহন করার ঢালাও সুযোগ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ধনীদের। নিরন্ন, নিরক্ষর বঞ্চিত ভারতবাসীদের বাজপেয়ীদের উপদেশ ঃ 'ওদের (ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী) পানে চেয়ে চেয়ে সুখে থাক।' এইসব ছাড় দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র চলতি আর্থিক বছরের বাকি আড়াই মাসেই সরকার ৯ হাজার কোটি টাকারও বেশী রাজস্ব হারাবে।

বিশ্ব মানবোন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছিল ঃ আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতার বিচারে দৈনিক এক ডলারের বেশি খরচ করার ক্ষমতা যার নেই সে হতদরিদ্র। সেই বিচারে ভারতের স্থান হয়েছে ১২৭তম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্দেহ করেছিলেন এই হিসাবকে। তাহ'লে দেখা যাক, ভারতে ২০০১ সালে যে জনগণনা হয়েছে তার প্রতিবেদনে কি লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে ঃ দেশের ৪৮ শতাংশ মানুষ এমন বাসস্থানে থাকেন যার পাকা দেওয়াল ও ছাদ নেই; ৬০ শতাংশ মানুষের বাসস্থানে পানীয় জল পাবার সুযোগ নেই; ৪৪ শতাংশ মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই; নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৩৪ কোটি; ১৫•কোটি শিশুর স্কুলে যাবার সুযোগ নেই; বয়স ও ওজনের মাত্রায় ৩৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের ৪৫·৫ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। বলা বাহুল্য, ২০০১ সালে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এঁরা কি কখনো বলতে পারেন ঃ 'ফিল গুড' — 'এই বেশ ভাল আছি'। এঁরা বলছেন অন্য কথা। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু শাসকশ্রেণীর লোভ অনলে পুড়িয়া গেল।' এঁরা কি চাইবেন সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তি বি জে পি ও তার সাঙাৎরা দিল্লির গদিতে আবার বসুক?

বেসরকারী ক্ষেত্রে মুনাফা-মৃগয়ার সুযোগ ঃ নাম বিলগ্নীকরণ

দেউলিয়া এন ডি এ সরকার তার প্রতিদিনের খরচ চালাবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকার লাভজনক বেশ কয়েকটি সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে ১৪,৫০০ কোটি টাকা তুলতে চাইছেন। ৩১শে মার্চের মধ্যে এই শেয়ার বিক্রয়পর্ব শেষ হবে। এরমধ্যে আছে ও এন জি সি, গেইল (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর মত কয়েকটি লাভজনক সংস্থা। বিলগ্নীকরণ মন্ত্রী অরুণ শৌরি বলেছেন, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ডিসকাউন্টে' শেয়ার কেনার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রশ্ন হল ঃ ডিসকাউন্টে পাওয়া শেয়ার যে বেশি দামে বৃহৎ বিনিয়োগকারী বা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাতে যাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? অর্থাৎ ঘুরপথে বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে শেয়ারগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিলগ্নীকরণের টাকা দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ব্যয় হবে না, ব্যয় হবে কোষাগার ঘাটতি মেটাতে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে এইভাবে বিলগ্নীকরণ করে ২৬,১৪৮ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। সবটাই ব্যয় হয়েছে কোষাগারীয় ঘাটতি মেটাতে। জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি পুঁজিপতিদের কাছে জলের দরে বেচে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে জনগণের করের টাকায় গড়ে ওঠা রাস্তাঘাট প্রভৃতি পরিকাঠামো ব্যবহার করছে পুঁজিপতিরা, অন্যদিকে বাজপেয়ীরা তাদেরই হাতে উপহার হিসাবে তুলে

দিচ্ছে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি। সত্যিই পুঁজিপতিদের সুখের সময় চলছে।

ফুলে ফেঁপে ওঠা বিদেশী মুদ্রার তহবিলের প্রপঞ্চময়তা

এন ডি সরকার বগল বাজিয়ে বলছেন ভারতের বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় তহবিল ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। তবে এই বিদেশী মুদ্রার ৩০ শতাংশ হল 'HOT MONEY'. শেয়ার বাজারে খাটছে এই ৩০ শতাংশ বিদেশী টাকা। জুয়ায় খাটছে বলা যায়। আজ আছে, কাল নেই। শেয়ারের বাজারে এ টাকা দ্বিগুণ হয়ে উড়ে যাবে বিদেশে। এ টাকায় দেশে শিল্প গড়া হবে না। এই বিদেশী মুদ্রা কীভাবে জনকল্যাণে ব্যয় করা যায় তা নিয়ে বেসরকারী অর্থনীতিবিদ্রা অনেক পরামর্শ দিচ্ছেন। যেমন, সরকারী উদ্যোগে শ্রমনিবিড় প্রকল্প মারফৎ কর্মহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, খাদ্যের বিনিময়ে কাজের কর্মসূচী নেওয়া প্রভৃতি। কিন্তু সে সব পরামর্শ গ্রাহ্যই করেনি এন ডি এ সরকার। উল্টে বি জে পি অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিং আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ঃ

"যে কেউ এখন ব্যাঙ্কের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বছরে বছরে ২৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত কিনে নিয়ে বিদেশে পাঠাতে পারেন বা নিজেও চলে যেতে পারেন এবং যা চান তাই-ই কিনতে পারেন বা করতে পারেন, কেউ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না।"

বাহবা, বাহবা বেশ! সুখের সীমা নাই! প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০ টাকা নগদ দিয়ে ২৫ হাজার মার্কিন ডলার কিনে বিদেশে চলে যান বা পাঠান পছন্দমতো জিনিস কিনে আনতে। বিশেষ করে বিলিতি মদ, পার্সোনাল কম্পিউটার, সেলফোন ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলির ওপর আমদানি শুল্কেও ছাড় দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এমনকি বিমান ভাড়াও কমিয়ে দিয়েছেন তিনি। শীর্ণকায় ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন যোগাবে না স্ফীতকায় বিদেশী মুদ্রার তহবিল।

ভয়াবহ বেকার সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে দেশ

বছরে ১ কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বি জে পি। আজ বাস্তব চিত্র অতীব ভয়ঙ্কর। কয়েকমাস আগে রেলের তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীপদে ৩৮,০০০ শূন্যস্থান পূরণের জন্য আবেদন করেছিলেন প্রায় ৭৫ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার ১৩ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বলা হয়েছে, মুম্বাইয়ে পুলিসের নিম্নস্তরে ৭৫০টি পদের জন্য আবেদন করেছিলেন ১৫,২০০ জন। 'কর্মহীন উন্নয়নে'র ফল কি হতে পারে এই দুটি ঘটনা তারই প্রমাণ।

প্ল্যানিং কমিশন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে ২০০২-০৩ সালে নাকি ৮৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করেছে বি জে পি-জোট সরকার। অথচ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সাহেব সিং ভার্মা সংসদে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ২০০২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ২০০১ সালের তুলনায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার কমেছে। বি জে পি-জোট সরকার শুধু সংগঠিত ক্ষেত্রেই ৫ বছরে কর্মসংস্থান কমিয়ে দিয়েছে ১২ লক্ষেরও বেশি আর অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কমেছে ৫০ লক্ষেরও বেশি।

২০০৩-এর ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত রেলে গ্রুপ 'সি' কর্মচারীর পদ খালি আছে ১,১৮০৫২টি আর গ্রুপ 'ডি' কর্মচারীর পদ খালি আছে ৩৯৭৫৯টি। ২০০১-২০০২ সালে ৪ কোটি ১০ লক্ষ রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারের মধ্যে কাজ পেয়েছেন মাত্র ৯৯ হাজার জন।

জে এন ইউ-র অর্থনীতির অধ্যাপিকা জয়তী ঘোষ ভারতের বর্তমান কর্মসংস্থানের সমস্যা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"It is not growth per se, but the pattern of growth, which is important for job creation. Agricultural employment has been badly hit by mechanisation and the recent agrarian crisis. Manufacturing employment especially in small-scale units, has been devasted by import competition. Public employment has been shrinking. All of these job losses have negative multiplier effects. The growth of some service employment such as the expansion of IT- enabled services has not been any where near enough to counter-act these adverse trends. As long as government does not make employment generations the main priority and change its policies accordingly such a pattern of jobless growth will continue." (The Economic Times, 2nd March, 2004)

পরিসংখ্যানের কারচুপি দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

এ বছরের ৯ই ফেব্রুয়ারি সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন (সি এস ও) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা পরিসংখ্যান পেশ করে বলেছে ঃ ২০০৩-০৪ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশ (জি ডি পি) হবে ৮·১ শতাংশ। উল্লেখ করা দরকার ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় জি ডি পি ছিল ১০·৫ শতাংশ। আবার ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় জি ডি পি কমেছিল ৩·৬৫ শতাংশ। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সি এস ও যে 'আগাম হিসেব' দিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ২০০২-০৩ সালে জি ডি পি-র হার দাঁড়িয়েছে ৪·৩ শতাংশ। আর্থিক বছরের শেষে সি এস ও ঐ হারকে আরও কমিয়ে ৪ শতাংশে দাঁড় করায়। এইভাবে জি ডি পি'র হার কমিয়ে দেখানো হয়েছে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে।

এইভাবে অর্থনীতির সম্প্রসারণকে ২০০২-২০০৩ সালে কম করে দেখানোর উদ্দেশ্য হল আগের বছরের বিকাশের হারকে কম করে দেখিয়ে বর্তমান বছরের হারকে নজরকাড়া বলে চালানো সম্ভবপর। পরিসংখ্যানের যাদুকাঠি ঘুরিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করাই লক্ষ্য।

২০০২-০৩ সালে কৃষিমন্ত্রক বলেছিল খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে কমেছে ১৩·৮৯ শতাংশ। অর্থাৎ ২১ কোটি ২০ লক্ষ টন থেকে কমে ১৮ কোটি ২৫ লক্ষ টন হয়েছে। গত বছর কৃষি উৎপাদন ৫·২ শতাংশ কম হলেও তা এ বছর ৯·১২ শতাংশ বাড়বে বলে সি এস ও তার অগ্রিম হিসাবে আশা প্রকাশ করেছে। মনে রাখতে হবে ২০০১-০২ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৬·৫ শতাংশ। ঐ স্তরের তুলনায় এই বৃদ্ধি আহামরি (!) কিছু নয়। চলতি বছরের বিকাশের পিছনে বড় কারণ হলো গত বছরের মারাত্মক খরার পর এ বছর ভালো বৃষ্টি হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রের পুনরুদ্ধার। সি এস ও-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমেছে মাত্র ৫·২ শতাংশ আর খাদ্যশস্য উৎপাদন কমেছে ১৩·৯ শতাংশ। এখানে আবার অবাস্তবভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ফলমূল শাকসব্জি, দুধ, ডিম, মাংসের উৎপাদনের উপরে খরার প্রভাব পড়ে নি। অথচ দেশের বহু জায়গায় গবাদিপশু মারা গেছে। অনাহারের ফলে যখন মানুষ মরেছে তখন গবাদি পশু বেঁচে থাকে কি করে? স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরে কৃষি এখনও বৃষ্টি নির্ভর থেকে গেছে। 'ফিল গুডে'র ফেরিওয়ালারা তার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি।

সি এস ও-র দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হার গতবারের ৬·৪৪ শতাংশের তুলনায় ৬·৪৮ শতাংশ। আর এটা নিয়েই ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। প্রকৃত চিত্র বিপরীত!

FICCI-এর ২০০৩-০৪-এর Business Confidence Survey-তে বলা হয়েছে ঃ "For India the biggest worry is an economic recovery without employment growth, though corporate profits are rising. Jobs are not being created in the key industrial sector. With only 21% of the 504 Companies Committing to increase headcount in the next six months." FICCI-এর secretary general অমিত মিত্র বলেছেন, "The slowdown in performance of the heavy industry sector has hit employeemnt generation. The huge capacities in this sector is almost full and only when the sector goes ahead with new projects any improvement in employment condition could be expected."

FICCI-এর বক্তব্য মূল ও ভারী শিল্পগুলিতে কর্মসংস্থান না হওয়ার কারণ অস্বাভাবিক মাত্রায় (৫০ শতাংশ) উৎপাদন খরচের বৃদ্ধি। দুরন্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন খরচ কমাতে না পারলে মুনাফাকে ধরে রাখা যাবে না। তাঁদের মতে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য সবচেয়ে বেশী খরচ (employee cost) হয় এখন। তাই কর্মচারী-শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে উৎপাদন, দক্ষতা বাড়ানো হয় যন্ত্রের (automation) প্রয়োগ বৃদ্ধি করে। তাছাড়া প্রচলিত শ্রম আইনও নাকি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক।

(The Times of India, Kolkata/23.02.04)

'ভারত উদয়' নামক ভাঁওতাবাজির সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির তফাৎটা দেশের শিল্পপতিদের সর্বোচ্চ সংস্থা 'ফিকি' (FICCI) উপরিউক্ত তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। এটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক যখন তীব্র হয় তার প্রথম কোপ পড়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর। বাজপেয়ী আদবানিদের পোষা বিদূষক ও স্তাবকরা যতই 'ফিলগুডে'র বেহালা বাজাক ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ উদারনীতির কট্টর সমর্থক 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৪-এর প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে ঃ "সরকারের নিজের হিসেবেই দেশের জনসংখ্যার

২৫ শতাংশ চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। প্রকৃত দরিদ্র — আর্থিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের বঞ্চনা, সবদিক থেকেই — আরও অন্তত ২৫ শতাংশকে আক্রান্ত করছে। এই হিসেব রক্ষণশীল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কার্যত গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কোনো বৃদ্ধিই হয় নি।"

বলা হয়েছে, পরিখষেবা ক্ষেত্রে বিকাশের হার ৮·৪৪ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৭·১৪ শতাংশ। এটা কোনো কৃতিত্বের বিষয় নয়। কারণ পরিষেবা ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটেছে। বাণিজ্য, হোটেল ব্যবসা, পরিবহণ ইত্যাদিতে এই পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে বাজপেয়ী সরকার বা তার কাজকর্মের যোগসূত্র ক্ষীণ। মনে রাখতে হবে, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের পরিস্থিতির পরে সারা দুনিয়ার সঙ্গে ভারতেও পর্যটন ও ভ্রমণ শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। বর্তমানে যতটুকু বিকাশ ঘটেছে তা সম্ভব হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটার দরুণ। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ জাঁ দ্রেজে ও রীতিকা খেরা সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন ঃ

"সব বড় মন্ত্রকগুলিই জাকাত দিচ্ছে, অনুগতভাবে বাজপেয়ীর ঢোলক বাজাচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে আঁতাত যথেষ্ট পরিষ্কার। অধিকাংশ বিজ্ঞাপনের লক্ষ্যই হলো কর্মসংস্থান বৃদ্ধি বা এজাতীয় লক্ষ্য ঘোষণার ছদ্মবেশে বেসরকারী ক্ষেত্রকে বিপুল সুবিধা দেওয়ার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা.....যারা দেওয়ালের লিখন এতোদিন দেখেন নি, সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন পর্বে তাঁদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত।"

গত পাঁচ বছরে বেড়েছে লক আউট

কারখানা বন্ধ নিয়ে অনেক আজগুবি কথা লেখা হয় বাজারী পত্রপত্রিকায়। মূল দায় চাপানো হয় ধর্মঘটের ওপর। ধর্মঘটের জন্যই শ্রমদিবস নষ্ট হচ্ছে, তাই কমছে উৎপাদনশীলতা। তথ্য কি বলে দেখা যাক।

বাজপেয়ী-আদবানীরা ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৯৭ সালে লক আউটের কারণে শ্রমদিবস নষ্টের পরিমাণ ছিল ১ কোটি। আর ধর্মঘটের কারণে নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ। ২০০১ সালে এসে ধর্মঘটের কারণে শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার ঘটনা ৬০ লক্ষতে স্থির থাকলেও লক আউটের ফলে নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ১ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ। প্রায় দ্বিগুণ।

১৯৯৯ সাল থেকে ২০০০ সালে যেখানে ধর্মঘটের কারণে ৯ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে সেখানে একইভাবে লক আউটের কারণে নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ। অর্থাৎ শ্রমদিবস নষ্টের ৬০ শতাংশের জন্যই দায়ী ছিল লক আউট। সুতরাং সরকারী প্রশ্রয়েই বেড়েছে মালিকদের জঙ্গীপনা আর তারই ফলে নষ্ট হচ্ছে শ্রমদিবস। তবুও সরকার, বিচার বিভাগ ও সংবাদমাধ্যম আক্রমণ করছে ধর্মঘটকেই। এ সবের পেছনে রয়েছে এন ডি এ সরকারের সম্মতি।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের ওপর ব্যাপক আক্রমণ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছোট অংশীদার এন ডি এ সরকার ফাণ্ড-ব্যাঙ্ক নির্দেশিত উদারীকরণের অর্থনীতি চালু করে শ্রমিক-কর্মচারীদের অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। বেকারী, ছাঁটাই, লে অফ, ক্লোজার প্রভৃতির বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দিতে বি জে পি-জোট সরকার বদলে দিচ্ছে শ্রম আইন, ট্রেড ইউনিয়ন আইন। দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনের নামে যে সুপারিশগুলিকে সামনে আনা হয়েছে এবং কার্যকর করাও শুরু হয়েছে তা শ্রমজীবী জনগণের ওপর এক চূড়ান্ত আঘাত। কয়েকটি সুপারিশের উল্লেখ করছি — (১) মোট শ্রমিক সংখ্যা নির্বিশেষে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মালিকদের শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। (২) ৩০০জন পর্যন্ত কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে মালিকদের ক্লোজার ঘোষণা করার অবাধ অধিকার থাকবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ২০০২ সালে গৃহীত এক সিদ্ধান্তবলে এই সংখ্যাটিকে ১০০০ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। এর ফলে এক কলমের খোঁচায় ৯৯ শতাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান শিল্পবিরোধ আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে। (৩) বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন হারে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। এক্ষেত্রে মালিকরা বাড়তি সুবিধা পাবে যদি তারা কোনক্রমে তাদের প্রতিষ্ঠানটিকে 'রুগ্ণ' বা পুনরুজ্জীবনযোগ্য নয় বলে দেখাতে পারে। (৪) শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৯-এ ধারাকে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে হবে। এই ধারাবলে মালিকরা ইচ্ছে করলেই একতরফাভাবে চাকরির শর্ত পরিবর্তন করতে পারে না। (৫) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় বল্গাহীনভাবে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের স্বাধীনতা থাকবে। ফলত সব প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত শ্রমিকদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। (৬) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্তরে কোনো বেতনচুক্তি হবে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই মালিকদের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতি এর ফলে বিশেষ

কার্যকরী হবে। (৭) মালিকদের কাছে দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য শ্রমিকরা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোনো দরকষাকষির মঞ্চ তৈরি করতে পারবে না। (৮) ধর্মঘটের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি শতকরা ৫১ ভাগ শ্রমিক ধর্মঘটের পক্ষে মত দেয় তবেই ধর্মঘট করা যাবে। ধর্মঘটের ব্যালটের জন্য নোটিস জারি করার সঙ্গে সঙ্গে তা বাধ্যতামূলকভাবে সালিশির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সালিশি চলাকালীন কোনো ধর্মঘট করা যাবে না। কতদিনে সালিশি শেষ করতে হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ফলত, শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট নামক সর্বোচ্চ অস্ত্রটিকে আর ব্যবহারই করতে পারবে না। উল্লেখ্য তামিলনাড়ুর সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার রায়ের আগেই বাজপেয়ী সরকার নিয়োজিত জাতীয় শ্রম কমিশন এ ধরনের ভয়ঙ্কর জনবিরোধী সুপারিশ করে। (৯) এই সব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে যদি কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘটের ডাক দেয় তবে সেই ধর্মঘট বেআইনী বলে ঘোষিত হবে। সেই ক্ষেত্রে ঐ ধরণের ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি শ্রমিক এবং কর্মচারীর একদিন ধর্মঘট পিছু তিনদিনের বেতন কাটা যাবে। (১০) যদি কোনো ট্রেড ইউনিয়নের কোনো শিল্পে ৯০ শতাংশ সদস্য না থাকে তাহলে সেই ট্রেড ইউনিয়নের প্রকৃতপক্ষে কোনো অধিকারই থাকবে না। বলা হয়েছে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য এমন কিছু করা যাবে না যাতে মালিকশ্রেণী বা কেন্দ্রীয় সরকার অসুবিধায় পড়ে। ইতোমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার নেই বলে রায় দিয়েছে। মিটিং-মিছিলের অধিকার কেড়ে নেবার চক্রান্ত চলছে। কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি রায় দিয়েছেন কাজের দিনে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮ট পর্যন্ত সভা-সমাবেশ-মিছিল করা চলবে না। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর যে নির্মম আক্রমণ চালিয়েছে জয়ললিতা সরকার আগামী লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি-জোট সরকার ক্ষমতায় ফিরে এলে শ্রমিক-কর্মচারীদের শায়েস্তা করার জন্য 'তামিলনাড়ু' মডেলটাই প্রয়োগ করবে সারা দেশে। সাম্রাজ্যবাদের ছোট অংশীদার বি জে পি-জোট সরকার 'ট্রেড ইউনিয়ন মুক্ত' ভারত গড়ে দিতে চায় ভারতে অবাধে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের জন্য। ভারতের মালিকশ্রেণীও যাতে শ্রমিকশ্রেণীর 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বিনা বাধায় চুরি করতে পারে তার জন্যই ধর্মঘটের ওপর, মিটিং-মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং সুখের দিন এসেছে মালিকশ্রেণীর। তারাই 'ফিলগুড' বলছে।

তাই তো দেখি ভারতীয় শিল্পপতিদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'সি আই আই'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাহুল বাজাজ ১৯৯৮-এ বলেন, "সকলেরই বি জে পিতে আসা উচিত।" হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার মডেল 'গুজরাট কাণ্ড'-র নায়ক নরেন্দ্র মোদী গুজরাট নির্বাচনে জেতার পর (২০০৩) তাকে দু'বার সংবর্ধনা দেয় সি আই আই (১৮ই জানুয়ারি ও ৬ই ফেব্রুয়ারি)। কারা ছিলেন এই সংবর্ধনা প্রদানকারীর তালিকায়? ছিলেন বাজাজ কোম্পানির রাহুল বাজাজ, গোদরেজ কোম্পানির জামসিদ গোদরেজ, শ্রীরাম ইণ্ডাস্ট্রিজের সিদ্ধার্থ শ্রীরাম, লারসেন অ্যাণ্ড ট্যুবরো সিমেন্টের নরোত্তম শেখারিয়া, এসার-এর প্রশান্ত রাইয়া, অসীমা গ্রুপের চিন্তন পারেখ, প্রিমিয়ার অটোমোবাইলের মৈত্রেয় দোসী, আই ডি বি আই-এর পি পি ডোরা, টমাস ক্যুক এর প্রদীপ মাধবজী প্রমুখ।

শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিপদ ধ্বংস করছে শিক্ষাব্যবস্থা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুরন্ত অগ্রগতির যুগ এটা। ঘটছে জ্ঞানের বিস্ফোরণ। আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হলো — এই জ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে অতি দ্রুত আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে। কুসংস্কার ও কুপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তি দিতে হবে আগামী প্রজন্মকে। অথচ বি জে পি-জোট চায় শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক চেতনায় সম্পৃক্ত করতে, রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরিবর্তে শিক্ষাকে মুনাফার উৎসে পরিণত করতে। ১৯৯৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর মুরলীমনোহর যোশীর ওপর আর এস এস-পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রথমেই উচ্চশিক্ষার নিয়ামক সংস্থাগুলি থেকে বিজ্ঞানমনস্ক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সরানো হয়। আই সি এইচ আর বা Indian Council of Historical Research থেকে সরানো হয় অধ্যাপক সুমিত সরকার, অধ্যাপক কে এন পানিক্কর, রোমিলা থাপার প্রমুখকে। এই সংস্থার প্রধান হিসাবে বসানো হয় 'বাবরি মসজিদ যে রামজন্মভূমি' এই তত্ত্বের সমর্থক বি আর গ্রোভারকে। সারা দেশে বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস শেখানো যাতে না হয় তাই এই ব্যবস্থা। সিমলায় আই আই এ এস বা Indian Institute of Advanced Studies-এর অন্যতম নিয়ামক পদে বসানো হলো বেদবিদ্যা বিশারদ্ কট্টর সংস্কৃতবাদী কিরীট যোশী ও জি সি পাণ্ডেকে। National Council for Educational Research

and Training-এর সভাপতি মুরলীমনোহর যোশী, অধিকর্তা কৃষ্ণগোপাল রাস্তোগী (যিনি ৪৭-এর দাঙ্গায় মুসলিম তরুণী হত্যা করে গর্বিত) আর সঙ্ঘ পরিবারের ক্রীতদাস জে এস রাজপুত হয়েছেন সহ-অধিকর্তা। University Grants Commission-এর কর্ণধার হরি গৌতম জ্যোতিষশাস্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র পাঠক্রম চালু করেছেন। Syllabus Review Committee-এর সভাপতি হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জে এস ভার্মা যিনি বিচারপতি থাকাকালীন বলেছিলেন "হিন্দুত্ব ধর্ম নয়, ভারতীয় জীবন ব্যবস্থা।" আই আই টি-র গভর্নিং বডিতে ঢোকানো হয়েছে পি ডি চিৎলাঙ্গিয়া নামক কাষ্ঠ ব্যবসায়ীকে। আই আই টি সমাবর্তনে ইনি ছাত্রদের বর্ণাশ্রম প্রথার মাহাত্ম্য বুঝিয়েছেন। দীর্ঘ গবেষণার ফসল অধ্যাপক সরকার ও অধ্যাপক কে এন পানিক্কর রচিত 'Towards Freedom' গ্রন্থে হিন্দুত্বের জয়ধ্বনি না থাকায় তার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট শিক্ষামন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশীকে গোহত্যা নিবারণ ও রামমন্দির আন্দোলনের কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে সাম্মানিক ডি লিট দিয়েছে।

১৯৯৮ সালের ৩-৫ই আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকা হয় শিক্ষার পাঠক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। কিন্তু তা পিছিয়ে ২২-২৩ অক্টোবর করা হয়। কারণ 'বিদ্যাভারতী' স্কুল পরিচালক সমিতি প্রস্তাবিত পাঠক্রম চূড়ান্ত করতে পারে নি। মধ্যবর্তী সময়ে আর এস এস নেতা দীননাথ কাটরার নেতৃত্বে গড়া কমিটিকে বিদ্যাভারতী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রম ও প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আর এস এস নেতা দীননাথ কাটরার উদ্যোগে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে ঐ শিক্ষা প্রস্তাব পেশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবে যা ছিল তার মারাত্মক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাক ঃ (ক) প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সমস্ত বিষয়বস্তুর ভারতীয়করণ, জাতীয়করণ এবং বিশুদ্ধিকরণ হওয়া উচিত। (খ) সমস্ত স্তরের পাঠক্রমে, বৃত্তিশিক্ষা সহ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবস্তু অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের নামে হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকেই সমস্ত স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চাওয়া হয়েছে। (গ) তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রের জন্য সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য হওয়া প্রয়োজন। (ঘ) বেদ ও উপনিষদকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এমন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে হবে যা আমাদের আগামী প্রজন্মের সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। ধর্মীয় মূল্যবোধে জোর দিতে হবে। (ঙ) দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারী উদ্যোগে চলে আসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে বলে ধরে নিতে হবে (অর্থাৎ তাদের সিলেবাস বা অন্যান্য বিষয়গুলি কোনো নীতির শর্তাধীন হবে না)। এর প্রধান উদ্দেশ্য আর এস এস চালিত স্কুলগুলির সরকারী পৃষ্ঠপোষণা (গোয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিকর গ্রামীণ ৫১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিদ্যাভারতী এডুকেশনাল ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়েছেন)। (চ) সরকারী অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধনের পরিবর্তে সরস্বতী বন্দনা চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে — যেমন আর এস এসের স্কুলগুলিতে ও বি জে পি-শাসিত রাজ্যে প্রচলিত। এর কোনোটাই কেন্দ্রীয় সরকার ঐ শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন থেকে অনুমোদন করাতে পারে নি কিন্তু আর এস এস পিছু হটবার নয় — তাই সরকারও ধাক্কা খেয়ে সামান্য কৌশল পরিবর্তন করেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হলে বাজপেয়ী-আদবানীরা পূর্ণোদ্যমে তারা তাদের সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতিকে রূপায়িত করবে।

শিক্ষা প্রস্তাবনায় যা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে এইরকম ঃ (১) শিশুকে সমশিক্ষার সুযোগ দেওয়া যাবে না, কেননা কোন কোন শিশু 'ঈশ্বরের অশেষ করুণার দান', তাই তাদের পৃথক সুযোগ দিতে হবে। শিশুদের স্তর বিন্যাস হবে বিতর্কিত বুদ্ধিবৃত্তি (আই কিউ বা ইনটেলিজেন্ট কোসেন্ট), আবেগবৃত্তি (ই কিউ বা ইমোশনাল কোসেন্ট) ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি (এস কিউ বা স্পিরিচুয়াল কোসেন্ট)-এর ভিত্তিতে। শিশু মনস্তত্ত্ব বিরোধী, অবৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় আবেগতাড়িত এই চিন্তাধারা জ্ঞানের বিকাশকে শুধু ব্যাহত করবে না, জন্ম দেবে উগ্র জাত্যাভিমানের। যেমনটি ঘটেছিল নাৎসি জার্মানিতে। (২) মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। ভাল কথা। কি সেই মূল্যবোধ? কি তার স্বরূপ? বর্তমান এন সি ই আর টি কেমন মূল্যবোধ চায় তা তাদের সম্প্রতি প্রকাশিত 'এ জার্নাল অব ভ্যালু এডুকেশন' মুখপত্রের ভূমিকায় শিক্ষা সচিব এম কে কিউ-এর লেখায় টের পাওয়া যায় — "ঐতিহ্যবাহী ধর্ম, বিশেষ করে যে সকল ধর্ম একটি মাত্র পবিত্র গ্রন্থ থেকে তাদের রসদ (কর্তৃত্ব) গ্রহণ করে তারাই আমাদের বৌদ্ধিক স্বাধীনতার বেশি ক্ষতি করেছে।" কাদের বোঝানো হচ্ছে? কোরাণ, বাইবেল ও ঐ ধর্মাবলম্বীদের? এক ধর্মকে অবলম্বন করে অন্য ধর্মকে আক্রমণ করার কথা যে বলা হচ্ছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়? (৩) স্বতন্ত্র

ইতিহাস শিক্ষার পরিবর্তে ভূগোল, পৌরবিদ্যা, অর্থবিদ্যায় অঙ্গীভূত করে সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষায় একটা পার্শ্ব পাঠক্রম হিসাবে থাকবে। অর্থাৎ ইতিহাস পৃথকভাবে পড়ার দরকার নেই। ইতিহাস-এর বৈজ্ঞানিক পাঠ দরকার নেই। ইতিহাস হবে কল্পনা ও অনুমান নির্ভর। (৪) কম্পিউটার শিক্ষায় সংস্কৃতই হলো সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। (৫) গণিতের উৎকর্ষ বেদেই নিহিত। (৬) বর্ণাশ্রম প্রথার মতো শিক্ষায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার লোপ করে নারীকে জন্মদাত্রী, শিশুপালক গার্হস্থ্য স্বাচ্ছন্দ বিধানের রক্ষণশীলতায় আটকে রাখা দরকার। (৭) জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাশাপাশি বেশী প্রাধান্য দিয়ে জ্যোতিষচর্চার প্রচলন। শেখানো হবে কোষ্ঠি বিচার, লগ্ন বিচার, রাশি বিচার, বৈদিক বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতি পদার্থবিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর, ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চায় যাঁর অবদান অপরিমেয়, ইউ জি সি-কে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন, ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক জ্যোতিষবিভাগ খোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা কার্যত আমাদের মধ্যযুগের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি লিখেছেন, "বহু গবেষণায় দেখা গেছে জ্যোতিষবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা চলে না। এর মৌলিক পূর্বানুমান এবং ভবিষ্যদ্বাণী কোনোটাই বিজ্ঞান যে শৃঙ্খলার দাবি করে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ করতে দৃঢ়সংকল্প কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী-বিবেকানন্দ-রাধাকৃষ্ণাণের মতো শিক্ষাবিদ্ জন্মেছেন সে দেশে শিক্ষানীতির পরিকাঠামো কেমন হবে তা স্থির করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুকেশ আম্বানি এবং কুমারমঙ্গলম বিড়লাকে। আম্বানি-বিড়লাকে নিয়ে গঠিত কমিটি সুপারিশ করেছে ঃ ভারতে 'প্রতিযোগিতামূলক অথচ সহযোগিতাপূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ' গড়তে হবে। ভারত একটি অপ্রতিযোগী শ্রমনিবিড় সমাজ হিসাবে পিছনে পড়ে থাকতে পারে না। একটি প্রতিযোগী জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠবার স্বপ্ন তাকে দেখতে হবে। ভারতকে এমন এক পরিবেশ রচনা করতে হবে যা শিল্পশ্রমিক ও শ্রমজীবী তৈরি করবে না, জ্ঞানকর্মী লালন করবে, জ্ঞানকর্মী গড়ে তোলায় এবং তার মাধ্যমে তথ্যযুগের পুরোভাগে ভারতকে স্থাপন করার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও উন্নয়নের ভূমিকা হবে মুখ্য। এই মহান সংকল্প বাস্তবায়িত করা হবে শিক্ষায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ও বেসরকারীকরণের মাধ্যমে।'

আম্বানি-বিড়লা প্রদত্ত রূপরেখায় আরও কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেমন, কম্পিউটার শিক্ষা বাড়াতে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষা থেকে সর্বপ্রকার ভর্তুকী তুলে দিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভর্তি ফি বাড়িয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষায় বেসরকারী বিনিয়োগকে বাড়াবার জন্য কর ছাড় দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে শিক্ষাঙ্গনে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা যায়।

১৯৯৯-২০০০ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধির অর্ধেকের বেশী এসেছে বিদেশি তহবিল থেকে। আগে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী পুঁজির পরিমাণ ছিল ১০,১০২ কোটি টাকা আর এখন হচ্ছে ১৫,১৯৬ কোটি টাকা। বড় ব্যবসায়ী এবং বহুজাতিক এই শিক্ষা ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব বাজার অর্থনীতির স্বার্থে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে শিক্ষাক্ষেত্রে পুঁজির অবাধ প্রবেশে সম্মতি দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ককে ১৯৯৯ সালে। তারই ফলে দেশে শিক্ষা আজ পণ্য হিসাবে কেনাবেচা হচ্ছে।

সুখের হাওয়ায় বেড়ে চলেছে মালিকের মুনাফা, অনাদায়ী কর, অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণ আর বৈদেশিক ঋণ

বি জে পি-নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের জমানায় প্রতি বৎসর জ্যামিতিক গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের খাতে অনাদায়ী করের পরিমাণ ৮৬ হাজার ৩৪২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত। আর তা অতি অবশ্যই বর্তমান সময়ে এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঐ বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা আত্মসাৎ করা অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ এক লক্ষ বিশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে সুদ সমেত। নির্বাচনী অন্তর্বর্তী বাজেটে এসব সত্ত্বেও হাজার হাজার কোটি টাকার নানা ধরণের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় তৈরি করার জন্য।

বাড়ছে বিদেশী ঋণের বোঝা প্রতি বছর। ২০০২-এর মার্চে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৮৭৬ কোটি ডলার। ২০০৩-এর মার্চে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০,৫০০ কোটি ডলারে। ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে তা আরও বেড়ে হয় ১১,২০৫ কোটি ডলার। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত 'ইকনমিক সার্ভে ২০০২-২০০৩' অনুযায়ী বিদেশ থেকে ভারতের নেওয়া মাথাপিছু

বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৭৯১ টাকা। দেশী- বিদেশী ঋণ মিলিয়ে ভারতে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ১৪,৭১১ টাকা।

এই বিশাল পরিমাণ বিদেশী পুঁজি ভারতে এসেছে তার কারণ ইউরোপ ও আমেরিকায় সুদের হার অত্যন্ত কম। বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং অনাবাসী ভারতীয়রা এই বিদেশী পুঁজির বড় অংশ এদেশে রেখেছেন। এই সঞ্চিত পুঁজির বেশীরভাগ ফাটকা পুঁজি। এই পুঁজির মালিকরা যদি দেখে বিশ্বের অন্য কোথাও তারা বেশি লাভ করবে তাহলে তৎক্ষণাৎ তারা ঐ পুঁজি ভারত থেকে সরিয়ে নেবে।

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণের সুদ মেটাতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। আর তার বোঝা বহন করছে ভারতবাসী। অথচ এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণে উপকৃত হচ্ছে সমাজের ওপরতলার সামান্য একটা অংশ।

ব্যাঙ্কশিল্পের ওপর নগ্ন আক্রমণ ঃ লুটেরাদের হাতে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়

ব্যাঙ্কশিল্পের সর্বনাশ সাধনের জন্য এন ডি এ সরকার বেসরকারীকরণ বিল নামে আখ্যাত 'The Banking Companies and Financial Institution Amendment Bill' টি ১৩.১২.২০০০-এ সংসদে পেশ করেছে। এটি এখন অর্থসংক্রান্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বিবেচনাধীন। ২০০০-২০০১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এন ডি এ সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারী অংশীদারি ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। জনসাধারণের কষ্টার্জিত সঞ্চয় (ব্যাঙ্কশিল্পে প্রায় ১৪ লক্ষ কোটি টাকা) দেশী-বিদেশী বেসরকারী মালিকদের হাতে তুলে দেবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। বেসরকারী ব্যাঙ্কে বিদেশী পুঁজির অংশ ১০০ শতাংশে তুলে আনার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। ব্যাঙ্কে মোট জমা রাশির ৭০ শতাংশ গরিব, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের। সুদের হার ক্রমাগত কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী জমা প্রকল্পগুলিকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে।

শেয়ার বাজার আর মিউচুয়াল ফাণ্ডের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে আমানতকারীদের। কম সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে বৃহৎ শিল্পপতি, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের। গৃহ ঋণ, ব্যবসায় ঋণ প্রাধান্য পাচ্ছে। ক্ষুদ্রশিল্প এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ঋণের কথা বলা হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন কৃষকদের হাতে 'কিষাণ ক্রেডিট কার্ড' তুলে দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিং অন্তর্বর্তী বাজেটে। কে বিশ্বাস করবে? ২০০১-২০০২ সালে স্বেচ্ছা অবসরের মাধ্যমে ১ লক্ষ ১০ হাজার কর্মচারী-অফিসারকে ব্যাঙ্কশিল্প থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক সহ প্রথম সারির ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা যান্ত্রিকীকরণ (Total Bank Mechanisation)-এর লক্ষ্য অর্জন করেছে। ফলে ব্যাঙ্ক শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারী উদ্বৃত্ত বলে ঘোষিত হচ্ছেন আর ব্যাঙ্ক শিল্পে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের আশা প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে।

সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ

বি জে পি-র সহযোগী আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ (শিবসেনা সহ) প্রভৃতি দলগুলো গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিঃশব্দে নীরবে এই আক্রমণ সমর্থন করেছেন।

যেমন, চিত্রপরিচালক দীপা মেহতার 'ফায়ার' ছবি প্রদর্শনকালে মুম্বাইয়ে কয়েকটি সিনেমা হলে হামলা চালায় শিবসেনা-বি জে পি-র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, দীপা মেহতার 'ওয়াটার'-এর শুটিং পণ্ড করে আর এস এস কাশীতে। উমা ভারতী বলেছেন ঃ দীপা, শাবানা যেখানে শুটিং করতে যাবে সেখানে ইঁট মারা হবে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে প্রখ্যাত চিত্রকর মকবুল ফিদা হুসেনের ওপর বারে বারে আক্রমণ চালানো হয়েছে; ২১শে এপ্রিল, ২০০০ আগ্রায় খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ জ্বালিয়েছে ওরা; ১৩ই মার্চ, ২০০১ দিল্লিতে রাষ্ট্রসংঘ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর সময় কোরাণ পোড়ান হয়েছে; মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ও হোসাঙ্গাবাদে গেরুয়াবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হন নাট্যকর্মী হাবিব তনবীর ও তাঁর নাট্য সংস্থা নয়া থিয়েটারের কর্মীরা; বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ অর্মত্য সেন নোবেল পুরস্কার পেলে যখন সারা ভারত আনন্দ করছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরঙ দল বলেছে এই পুরস্কার প্রদান হিন্দু ধর্মানুরাগীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের বিশ্ব প্রচার পরিকল্পনার অঙ্গ। কেননা, 'তাঁর এই গবেষণা খ্রীষ্টানদের উপকারে লাগবে।'

এই মুহূর্তের জরুরী কাজ হল বি জে পি ও তার জোটসঙ্গীদের পরাস্ত করা

আসন্ন চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সামনে জরুরী কাজ হল বি জে পি ও তার

জোটসঙ্গীদের পরাস্ত করা এবং লোকসভা নির্বাচনের পরে দেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কারণ বি জে পি-জোটের শাসনে ভারতের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে'র আদর্শ বিপন্ন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই ভারতে অসংখ্য মানুষ এসে বসতি স্থাপন করে, পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে এক বহুত্ববাদী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে নি। সবাই মিলে এই সংস্কৃতির স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শক হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। ভারতের সংবিধান প্রণেতারা ভারতের এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করেই ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংবিধান রচনা করেছিলেন। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে দেশবিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক শয়তানের হাতে গান্ধীজীর মৃত্যু দাবী করছিল ভারত হোক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর তার থাক একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো।

মনে রাখতে হবে, বি জে পি নিছক একটি বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের দল নয়, কারণ এই দলের পিছনে রয়েছে ফ্যাসিবাদী আর এস এস, যাদের লক্ষ্য হল দেশে 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করা। এই লোকসভা নির্বাচনেই স্থির হয়ে যাবে যে দেশে গণতন্ত্র থাকবে, না ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। বি জে পি-জোট সরকারের আমলে ছোট-বড় মিলিয়ে দেশে প্রায় ৩০০টি দাঙ্গা হয়েছে। কেন্দ্রে বি জে পি শাসন শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টান যাজক ও তার দুই শিশুপুত্রকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করে। তারপর গোধরা কাণ্ডের অজুহাতে বি জে পি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মদতে গুজরাটে মুসলিম গণনিধন চলেছে। এটি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় গণহত্যা। এই দাঙ্গার পেছনে রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণ মদত ছিল। এটাই হচ্ছে দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ। বি জে পি পুনরায় ক্ষমতায় এলে রাষ্ট্রীয় মদতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর এস এস দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় দাঙ্গা লাগিয়েছে। যেমন, ভিওয়ান্দি, জলগাঁও, তেল্লিচেরি, আলিগড়, মোরাদাবাদ, মীরাট, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে। ভুলে গেলে চলবে না, যিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন, তিনি ঘোষণা করেছেন 'সংঘই আমার আত্মা'।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বি জে পি ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে বিতর্কিত বিষয়গুলি সামনে না আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যেমন, রামমন্দির নির্মাণ, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা, অভিন্ন বিবাহবিধি। কিন্তু এর পেছনে যে মতলব কাজ করেছে তা হল এন ডি এ-র অন্যান্য শরিকগুলিকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনা। গত পাঁচ বছরে বি জে পি তার শরিকদের চিন্তাভাবনাকে কোনো পাত্তা দেয় নি। বি জে পি তার ইচ্ছামতো শাসন করেছে। শীর্ষস্থানীয় বি জে পি নেতারা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন যে তাঁরা বিতর্কিত ইস্যুগুলি ত্যাগ করেন নি, নিজেদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া পর্যন্ত ঐ ইস্যুগুলিকে স্থগিত রাখা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এন ডি এ-র ইস্তেহার বি জে পি'রই ইস্তেহার। বি জে পি লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে শরিকদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। বি জে পি শরিকদের গণভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। বি জে পি'র দুষ্কর্মের জবাবদিহি তাদেরও করতে হচ্ছে এবং হবে। বেশ কয়েকটি দল এন ডি এ ছেড়েছে।

বি জে পি দুর্নীতিতে কংগ্রেসকেও ছাপিয়ে গেছে। ১৯৯৯ সালে এন ডি এ তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছিল যে তারা দেশকে ভয়, ভুখ, ভ্রষ্টাচার থেকে মুক্ত করবে। ঐ প্রতিশ্রুতি ছিল একটি বড় ধাপ্পা। বি জে পি'র প্রাক্তন সভাপতি বঙ্গারু লক্ষণ তেহেলকা কাণ্ডে ফেঁসেছেন। বর্তমান সভাপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডুর নামে জমি কেলেঙ্কারীর অভিযোগ রয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ কেলেঙ্কারী করে পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁকে আবার আদর করে মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী। ফুকন কমিশন ১৫টি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার চুক্তি খতিয়ে দেখে মন্তব্য করেছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও জড়িত।

বি জে পি'র পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি বলেছেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে হিটলারের মতোই ফ্যাসিবাদ কায়েমের লক্ষ্যে রাস্তা ও নদী সংযুক্তিকরণের প্রকল্প নিয়েছে বি জে পি-জোট সরকার। ১৯৩৪ সালের ৩১শে মার্চ হেড-গেওয়ার এবং লালু গোখেলের সঙ্গে একটি সাংগঠনিক আলোচনায় মুনজে বলেছিলেন যে ভারতে একজন শিবাজী, মুসোলিনী বা হিটলারের মতো হিন্দু ডিক্টেটর প্রয়োজন। মতাদর্শ এবং সংগঠন উভয় দিক থেকেই ইতালির ফ্যাসিস্ত ও জার্মানির নাৎসিদের সঙ্গে সংঘ পরিবারের গভীর মিল আছে। নাৎসিরা তথাকথিত নরডিক বা আর্যজাতির একাধিপত্যে আস্থাশীল ছিল। আর এস এস ও সংঘ পরিবার একদিকে মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের আর অন্যদিকে কমিউনিস্টদের নিঃশেষ করতে চায়। আর এস এস এবং তার শাখা সংগঠনগুলিও ইতালির ফ্যাসিস্ত এবং জার্মানির নাৎসিদের শাখা সংগঠনগুলির

মতো সামরিক কায়দায় গঠিত এবং হিংস্র আক্রমণে অভ্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী তো আগাম বলেই রেখেছেন যে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা পেলে তিনি সংঘ পরিবারের পূর্ণ আদর্শ রূপায়িত করে দেখিয়ে দেবেন।

সুতরাং এবারের লোকসভা নির্বাচনে একটা জোটের বদলে আর একটা জোট আসবে কিনা সেটা প্রশ্ন নয়। এই নির্বাচনের ফলের ওপর নির্ভর করছে দেশের গণতন্ত্র থাকবে কিনা। সুতরাং এ নির্বাচনটা মামুলি নির্বাচন নয়। তাই দেশকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আগামী চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত করতে হবে, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তি বি জে পি ও তার ধান্দাবাজ জোট-সঙ্গীদের। আর কেন্দ্রে তৈরি করতে হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে অম্লান রাখতে এ রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা এই নির্বাচনে তাঁদের যোগ্য ভূমিকা পালন করবেন। বি জে পি-জোট সরকারের শাসনে আক্রান্ত সর্বস্তরের মানুষ এই নির্বাচনে তাঁদের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় যে দেবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, হিটলার ও মুসোলিনীর যে পরিণতি হয়েছে এ দেশের হিন্দু ফ্যাসিস্তদেরও সেই পরিণতি হবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ লাভ করুক।

উৎস : ১। মার্কসবাদী পথ/বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, ২। সময়ের দর্পণ, নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা ২০০৩, ৩। গণশক্তি, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৪, ৪। The Economic Times, 24 February 2004 and 2 March 2004.

কর্মসংস্থান নিয়ে এন ডি এ সরকারের গোঁজামিল

অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে ধরণের কর্মসংস্থান, হচ্ছে, তা-ও দুশ্চিন্তার কারণ। ১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৩-৯৪-এর মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৬৩.৭৫ শতাংশ কাজ সৃষ্টি হয়েছে কৃষিতে এবং ১৩.৩৪ শতাংশ পরিষেবায়। কিন্তু ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০-এর মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৫১.০১ শতাংশ কাজ সৃষ্টি হয়েছে 'ট্রেড' বা কারবারে, ২৩.২৫ শতাংশ নির্মাণ শিল্পে, কৃষিতে নতুন কাজ সৃষ্ট হয়নি বললেই চলে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই চিত্রটি বিশেষ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে পূর্ব ভারতে। এই পূর্ব ভারতেই শ্রমশক্তির বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি। নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত। তাতে দুশ্চিন্তার কারণ প্রবল।

পরবর্তী সময় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এবং এখানেই সরকার গোঁজামিল দিয়েছে। ৮৪ লক্ষ চাকরি সৃষ্টির পরিসংখ্যান তারই নিদর্শন। গোঁজামিল অনেকগুলো দিক থেকে। প্রথমত, এই সংখ্যা উদ্ভূত হয়েছে এন এস এস-এর ছোট নমুনা মারফত। সরকারের নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই যার উপর নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয়ত, সমীক্ষায় উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করা হয়, বছরে কতদিন তিনি কাজ করছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কতগুলো নতুন কাজ সৃষ্টি হয়েছে, সেটা গণনা করার কাজে এই প্রশ্নের উত্তরকে ব্যবহার করা হয় না, তার বদলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি থেকে নিয়োগের প্রবণতা অনুমান করা হয়। এটাই স্বীকৃত ও চিরন্তন পদ্ধতি। অথচ এ বার এই চিরাচরিত পদ্ধতি বর্জন করে যোজনা কমিশন কেবল কত জন চাকরি করছে, সেই উত্তর থেকে ৮৪ লক্ষ কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান খাড়া করেছে। তৃতীয়ত, এই ৮৪ লক্ষ সংখ্যাটি পাওয়া গেছে ২০০০ সাল থেকে ২০০২-এর প্রথমার্ধে করা ছোট নমুনা থেকে। ২০০২-এর পরবর্তী ছোট নমুনায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ৯০ লক্ষ কম লোক চাকরি করছেন।

এই গোঁজামিলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সীতারাম ইয়েচুরি ঠিক কথাই বলেছেন।

উৎস : 'কর্মসংস্থান নিয়ে গোঁজামিল : ইয়েচুরি ঠিকই বলেছেন'— লেখক বিবেক দেব রায়, রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট ফর কন্টেম্পোরারি স্টাডিজ-এর অধিকর্তা।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩ই মার্চ, ২০০৪

ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্কট ও আমাদের দায়িত্ব

বনমালী ঘোষ

বাদলা উচ্চ বিদ্যালয়, বর্ধমান

"মোরা, এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান" — নজরুলের এই বিখ্যাত কবিতার দুটি কুসুম থেকে একটি কুসুমকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করার জন্য সাম্প্রদায়িক বি জে পি ও তার দোসররা সদা-সর্বদা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ক্ষত নিয়ে দেশভাগের মধ্যদিয়ে আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা অথচ হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত আন্দোলন বাধ্য করেছিল ইংরেজদের এদেশ ত্যাগ করতে। তাই এই বিষাক্ত স্মৃতির পুনরাগমন রুখতে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং সংবিধানের ২৫-২৮নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল বহু জাতি, ভাষা ও ধর্মবিশিষ্ট ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা। কিন্তু স্বাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেও সাম্প্রদায়িক উগ্রতার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বন্ধন গড়তে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে জাতির জনক গান্ধীজীকে। সেই গান্ধীঘাতক, নরপিশাচ বাহিনীরা সক্রিয়ভাবে আজও তছনছ করছে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্রকে। এই কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বি জে পি, আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সঙ্ঘ পরিবার, শিবসেনা, জামাত-ই-ইসলাম, মুসলিম লীগ, বজরঙ দল সহ সকল ধরনের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, সংগঠন, রাজনৈতিক দল যারা আজ শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদতপুষ্ট এবং সাহায্যপ্রাপ্ত।

ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীসংগ্রাম থেকে সরিয়ে এনে হাজির করছে ভ্রাতৃবিদ্বেষী দাঙ্গায়। জিন্না, বদায়ুনি, আলতাফ হোসেন, সৈয়দ তোফায়েল আমেদ প্রমুখ উগ্রবাদীদের লেখা ইতিহাসকে তুলে ধরা হচ্ছে। মানুষের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অভিযোগকে চাপা দিয়ে তারা তুলে ধরছে ইসলামিক রাষ্ট্রকে, ফলে মানবতাবাদী যুক্তিবাদী হয়ে ওঠা সমগ্র দেশের মানুষ বিশ্ব জনগণের সাথে একাত্মবোধ অনুভব করতে না শিখে অবৈজ্ঞানিক, জাতিবিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস শিক্ষার মধ্যদিয়ে মানবমন অবৈজ্ঞানিক, জাতি দাম্ভিকতা, অসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

তাই সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন বি জে পি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হয়েও এন সি ই আর টি'র নয়া পাঠক্রমে হিন্দুত্বের আধারে জাতি গঠনের উদ্দেশ্য বিকৃতভাবে দেখাচ্ছেন এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রতীকে সরস্বতী বন্দনা, জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চেতনা বিসর্জিত পাঠ্যপুস্তকে ছাত্রমনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে চলেছেন এবং অবশ্যই তার ব্যতিক্রমী ভাবধারায় গঠিত পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সরকার ও তার মন্ত্রীরা গড়ে তুলছেন সর্বদা প্রতিরোধের প্রাচীর।

গুজরাটের গোধরা কাণ্ড দিয়ে শুরু করে অসংখ্য নিরীহ নর-নারীর রক্তের নদী পেরিয়ে উগ্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসীন আদবানীর আশীর্বাদধন্য নরেন্দ্র মোদী। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে বেস্ট বেকারীর কাণ্ড, যেখানে ১৪ জন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় এবং হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন মোদী সরকার কাউকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করতে দেন নি। তারপর অনেক চেষ্টার পর মানবাধিকার কমিশন একজন সাক্ষী যোগাড় করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো এই কেসে কোনো শাস্তিই কেউ পাবে না। এইভাবে গুজরাটে ক্ষমতা দখলের নাম 'মোদী ফর্মূলা' এবং এই ফর্মূলা প্রয়োগ করে বি জে পি আগামী লোকসভা নির্বাচন বৈতরণী পার হতে চায়। তারই প্রস্তুতি হিসাবে বাজপেয়ী, আদবানী জোট বলতে শুরু করেছেন যে, অযোধ্যার বিতর্কিত জমির নীচে ছিল হিন্দু দেবতার মন্দির এবং ওখানেই তৈরি করা হবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। এইভাবে ভারত জুড়ে আবার নতুনভাবে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দির-মসজিদ বিতর্ক। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সঙ্ঘ পরিবারের বিষাক্ত কর্মসূচীকে রূপায়ণ করতে গিয়ে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করার জন্য মৌলবাদী অসহিষ্ণুতা তৈরি করতে তৎপর হয়েছে বি জে পি। ফলে সাম্প্রদায়িকতার আতঙ্কে ভারতের বিভিন্ন জাতি

ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা সদাবিব্রত এবং আতঙ্কগ্রস্ত।

ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের আবর্তে যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীরা পথ খুঁজে পাচ্ছে না তখন সাধারণ মানুষ সঙ্কটমুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে যত এগিয়ে যাবে, ততই সাম্প্রদায়িকতা দেশে-বিদেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি অন্য ধর্মের প্রতি যে হুঙ্কার দিচ্ছে, তার মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে সমাজের শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণমূলক চরিত্রের মধ্যে এবং একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ্ প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ভেদপন্থার প্রচার করে শিক্ষায় গৈরিকীকরণের প্রচেষ্টা সর্বদা চালাচ্ছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রগতিশীল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজ দাবী করছি যে, বিকৃত ইতিহাস বন্ধ করে ইরফান হাবিব, আতাহার আলি, বরুণ দে, গৌতম ভদ্র, নুরুল হাসান, রোমিলা থাপার প্রমুখের রচিত সুস্থ সমাজ ও মানবিক সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামনে তুলে ধরে নতুন মানবিকতার স্বপ্ন তৈরি করা হোক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, সাভারকার মুসলিমদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন, বি জে পি এবং সঙ্ঘ পরিবারও সেই ধারণাই পোষণ করে। সাভারকার মনে করতেন, "মুসলিমরা সংশোধনাতীতভাবে আমাদের ঘোর শত্রু।" তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "যদি হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে ভারতে মুসলিমদের দশা হবে জার্মানীর ইহুদীদের মতো।" সেই সাভারকারের ছবি বাজপেয়ী সরকার সংসদ ভবনে গান্ধীজীর ছবির বিপরীত দিকে স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। অথচ গান্ধীজী ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৪৮ সালে ঘোষণা করেছিলেন, "It was a fanatical wing of Hindu Maha Sabha directly under Savarkar that (hatched) the conspiracy to assassinate Gandhiji."

Prof. Aditya Mukherji
JNU
(Economic Times, 09.03.04)

যে সাভারকার গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তারই ছবি সংসদে স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে বি জে পি ও তার সাকরেদরা। বি জে পি'র শেষ আশ্রয় হিন্দুত্বই। তাই আসন্ন চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উন্নয়নের নামে মিথ্যাচার চালিয়েও নিশ্চিন্ত হয়নি তারা, এখন তাই আদবানী রথে চড়ে 'ভারত উদয় যাত্রা' করছেন।

লক্ষ্য একটাই, সারা দেশে ফের সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ জাগিয়ে তুলে নির্বাচনকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাই আজ এই সর্বনাশা পরিস্থিতিতে দেশে বহুত্ববাদী সহনশীলতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে রক্ষা করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের চালিকাশক্তি হলো সংগঠন এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী যা গণতন্ত্রের উপযোগী বস্তুনিষ্ঠ করে গড়ে তোলার কাজে আমাদের নিরন্তন অগ্রণী সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাম্প্রদায়িকতার কবল থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হতে হবে। এই কাজে আমাদের নিরন্তন সংগ্রামের পাশে বামপন্থীরা সদা-সর্বদা বর্তমান এবং আগামীদিনের বৃহত্তর আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব বর্তাবে সমাজের রূপকার এই শিক্ষক সমাজের উপর।

বাৎসরিক সাধারণ সভার সমস্ত সমবেত অনুষ্ঠানগুলি থেকে আমাদের শপথ নিতে হবে যে, শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ, মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রুখতে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জাত-ধর্ম নিয়ে যারা সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করে তাদের উদ্দেশ্যে অন্নদাশঙ্করের ভাষায় বলতে বলি —

এদের প্রয়োজন তো দেখি/গণহত্যার জন্য/
চেঙ্গিস খাঁর মত এরা/ঘাতক বলে গণ্য।/
এই কথাটি রেখো মনে/এ ভব সংসারে/
যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে/সে মরে যে মারে।/
যে হারে সে জেতে, আর/যে জেতে সে হারে।।

কল্লোল-এর কলরোলে

রঞ্জিতকুমার সরকার

শিক্ষক, বহুলা শশী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, *বর্ধমান*

সূচনাপর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্প যে পরিমাণ গ্রন্থনির্ভর, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ সাময়িক পত্রিকা-নির্ভর। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিই বাংলা ছোটগল্পকে মাতৃস্নেহে লালন করেছে এবং শৈশবের অপুষ্টি ও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে যৌবনের লাবণ্য, দীপ্তি, শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করতে আনুকূল্য দিয়েছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকার সিঁড়ি বেয়েই বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক।

বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে আজ থেকে প্রায় ৭৯ বছর আগে একটি পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দীনেশরঞ্জন দাশ এবং গোকুলচন্দ্র নাগের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত 'কল্লোল' নিছক একটি পত্রিকাই ছিল না — একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছিল এবং কল্লোলের ধারা বেয়েই বাংলা ছোটগল্প তথা বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাব ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে তাই অনেক সমালোচক 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পকে একটা নিটোল পরিপূর্ণতা দিয়েছিলেন, কিন্তু কল্লোলকে কেন্দ্র করেই বাংলা ছোটগল্প ফর্ম ও কন্‌টেন্ট দু'দিক থেকেই উন্নততর এবং উজ্জ্বলতর হতে পেরেছিল। ঘাতজর্জর দৈনন্দিনতা, শোষণ ও অত্যাচারের ভয়াবহতা, যৌনচেতনার নগ্নরূপ, দারিদ্র্যের বীভৎসতা, জীবনের বহুকোণিক এবং বিভিন্নমুখী প্রকাশ, সূচনা এবং সমাপ্তির চমকপ্রদ ও অভ্রান্ত নাটকীয়তা, নিগূঢ় এবং একমুখী প্রতীতি, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের প্রয়োগ, তীক্ষ্ণাগ্র ও ব্যঞ্জনাময় ভাষা, ক্ষেত্রবিশেষে কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাস বাংলা ছোটগল্পে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

১৩৩০ সালের পয়লা বৈশাখ কল্লোলের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কার্যালয় কলকাতার ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দুটি ঘর। দীনেশরঞ্জন এবং গোকুলচন্দ্র কল্লোলকে যে একটি গল্প পত্রিকারূপেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র দেখলেই একথা বোঝা যায়। সূচীপত্রটি ছিল এইরকম ঃ

কল্লোল — মাসিক গল্প-সাহিত্য

প্রথম বর্ষ — প্রথম সংখ্যা/বৈশাখ, ১৩৩০ সাল

গল্প —

১। মা — শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

২। রিক্তা — কেতকী দেবী

৩। পুঁটেরাম — নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪। ফুলের আকাশ — দীনেশরঞ্জন দাশ

৫। ভাঙ্গাবাড়ী — অতুলেন্দু সেনগুপ্ত

৬। বীণা — সুনীতি দেবী

৭। বিড়ালের স্বর্গ (অনুবাদ গল্প)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, (মূল Emile Zola) এটি প্রথম দু'সংখ্যায় শেষ হয়েছিল।

১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা এবং ১৩৩৪ সালের কার্তিক সংখ্যা শুধু গল্প নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি সংখ্যাতেই ১০টি করে গল্প ছিল। ১৩৩০ সালের বৈশাখ থেকে ১৩৩৬ সালের পৌষ পর্যন্ত কল্লোলের মোট ৮১টি সংখ্যা প্রায় প্রতি মাসেই নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হতো। খ্যাত, অনতিখ্যাত, অখ্যাত প্রায় ১৩৮ জন ছোট গল্পকারের প্রায় ৩৫৯টি মৌলিক ও অনুবাদ গল্প এই ৮১টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, বাংলা ছোটগল্পকে গভীরতা, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দেবার জন্য, উদীয়মান তরুণ গল্পকারদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করার জন্য, বিদেশী গল্প ও গল্পকারদের সাথে বাংলা গল্প, গল্পকার ও পাঠককুলের মেলবন্ধন ঘটাবার জন্য দীনেশরঞ্জন এবং গোকুলচন্দ্র এমন এক অসাধারণ ও ঐতিহাসিক উদ্যম নিয়েছিলেন যা তাঁদের সুগভীর গল্পপ্রাণতা ও সাহিত্য-মনস্কতার পরিচয় বহন করে। পরবর্তীকালে অবশ্য ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক কারণে কল্লোল গল্পের সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে উপন্যাস, নাটক ও বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধাদি

প্রকাশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, সম্পাদকদ্বয়ের প্রথম ও প্রধান ভালোবাসা ছিল ছোটগল্প। দীনেশরঞ্জন এবং গোকুলচন্দ্র দু'জনেরই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র ছিল চিত্রশিল্প। দু'জনের মধ্যে নানাদিক দিয়েই মিল ছিল। দু'জনেই ছিলেন অকৃতদার, দু'জনেই আর্ট স্কুলে পড়াশুনা করেছেন এবং ছবি আঁকায় দু'জনের দক্ষতা ছিল সহজাত। সবচেয়ে বড় কথা ছোটগল্পের প্রতি গভীর ও নিবিড় অনুরাগের জন্যই কল্লোলকে অবলম্বন করে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন এমন এক প্ল্যাটফর্ম ও সাহিত্যিক আড্ডা, যেখানে তৎকালীন লেখক ও পাঠক সকলেরই ছিল বাধাহীন ও সানুরাগ আমন্ত্রণ।

কল্লোলের সাহিত্যিক আড্ডাটিও ছিল জমজমাট। সেকালের অন্যান্য পত্রিকার সাহিত্যিক আড্ডার চেয়ে এই আড্ডার চরিত্র ও মেজাজ ছিল অন্য ধরনের। অন্য পত্রিকার আড্ডাগুলি ছিল ব্যক্তিনির্ভর, কিন্তু কল্লোলের আড্ডা ছিল সমষ্টিনির্ভর। 'ভারতী' পত্রিকার আড্ডার প্রধান পুরুষ ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'সবুজপত্র' পত্রিকার আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দপ্তরে সাহিত্যিক আড্ডা জমাবার মতো স্বাধীনতা সেকালে কারো ছিল না। 'ভারতবর্ষ' ও 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সাহিত্যিক আড্ডার চেয়ে ব্যবসায়িক দিককেই বেশী গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু কল্লোলের আড্ডা ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ আবেগে উদ্দীপ্ত এবং সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্যপাঠে নিবেদিতপ্রাণ একদল যুবকের কোলাহলে মুখর। কল্লোলের সাত বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে আড্ডায় এসেছেন শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, যুবনাশ্ব, প্রবোধকুমার সান্যাল, শিবরাম চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়ের মতো নবীন সাহিত্যিক, মোহিতলাল মজুমদারের মতো বর্ষীয়ান কবি-সমালোচক এবং যামিনী রায়, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত শিল্পী। কল্লোলের আড্ডার এইসব তরুণ সাহিত্যিকরাই পরবর্তীকালে বাংলা ছোটগল্প এবং বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

কল্লোল বাংলা ছোটগল্পের একটা পাকাপোক্ত ভিত্ গড়ে দিয়েছিল, যার ওপর গড়ে উঠেছে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বহুতলবিশিষ্ট সুরম্য অট্টালিকা। কল্লোলের ছোটগল্পকাররাই পরবর্তীকালে চার-পাঁচ দশক ধরে বাংলা ছোটগল্পের রাজ্যে বলিষ্ঠভাবে পদচারণা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের লাবণ্যময় ও সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বাংলা ছোটগল্পকে মুক্ত করে কল্লোল যেমন ছোটগল্পের দেহেমনে সঞ্চারিত করেছিল আঘাত-সংঘাতমুখর ক্লেদজর্জর রূঢ় বাস্তবতাকে, তেমনি সীমিতসংখ্যক বুদ্ধিজীবী পাঠককুলের কবল থেকে বাংলা ছোটগল্পকে মুক্তি দিয়েছিল আমজনতার দরবারে।

তথ্যসূত্র :—

১। কল্লোলের কাল — ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়
২। কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

লেখকদের প্রতি অনুরোধ

- ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।
- লেখার 'কপি' রেখে লেখা পাঠাবেন। কোন লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- জেরক্স কপি পাঠাবেন না। জেরক্স কপি প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।
- সমিতির রাজ্য দপ্তরের ঠিকানাতে লেখা পাঠাতে পারেন।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

ধারাবাহিক

সমিতির পুরুলিয়া জেলার ইতিহাস

দিলীপকুমার গোস্বামী

সহ-সম্পাদক, পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাখা

১৯৬৬ সালে সারা রাজ্যে হয়েছিল ত্রিস্তর আন্দোলন — বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি, কলকাতার এসপ্ল্যানেড ইস্টে অবস্থান, আইন অমান্যের মধ্যদিয়ে কারাবরণ। জেলাস্তরেও অবস্থান হয়েছিল। আমাদের জেলাতেও দীর্ঘ মাসাধিককাল বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি হয়েছিল, বহু শিক্ষক কলকাতার অবস্থানে অংশ নিয়েছিলেন — ৫২জন কারাবরণ করেছিলেন। স্মরণে রাখতে হবে এসময় আমাদের জেলা মাত্র ১০বছর সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাসত্ত্বেও সরকারের বিরুদ্ধে সারা জেলায় সমস্ত বিদ্যালয়ে একমাস ধরে কর্মবিরতি পালন করার মত কঠিন দায়িত্বও পালন করা গেছিল। শুধু তাই নয়, রেডিও ও সংবাদপত্রে প্রতিদিন কর্মবিরতি উঠে গেছে বলে প্রচার করা হতো। সেজন্য পুরুলিয়া শহরের পার্শ্ববর্তী থানার বিদ্যালয়গুলিতে কিছু নবীনকর্মী প্রতিদিন বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে কর্মবিরতি জারি আছে সেকথা জানিয়ে আসতেন।

হরিপদ রায়, শক্তিপদ সাহানি ও শশাঙ্ক ঘোষরা অবস্থানকারী ও আইন অমান্যকারী শিক্ষকদের কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এই আন্দোলন হয়েছিল। পুরুলিয়া শহরের দুজন শিক্ষকের ছবি অবস্থান-আন্দোলনকারী হিসেবে সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ায় কর্তপক্ষ তাঁদের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি। সরকারী সন্ত্রাস ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্দোলন-বিরোধিতা — উভয় দিকের হুমকি উপেক্ষা করেই শিক্ষকরা এই আন্দোলন সফল করেছিলেন। ১৯৬৬-এর আন্দোলনই জেলার নেতৃত্বে পরিচালিত সর্ববৃহৎ আন্দোলন ছিল। কারাবরণকারী শিক্ষকদের সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি — যাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে তাঁদের নাম, তৎকালীন বিদ্যালয়ের নাম ও গ্রাম-শহরের নাম দেওয়া হচ্ছে।

ক্রমাগত অনুসন্ধানে সে সময়কার আন্দোলনকারী প্রত্যেকের নাম সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

ক্রমিক সংখ্যা	কারাবরণকারীর নাম	শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী	বিদ্যালয়ের নাম	গ্রাম/শহর
১।	প্রয়াত গৌরীশঙ্কর লাহিড়ী	শিক্ষক	ঝালদা সত্যভামা বিদ্যাপীঠ	ঝালদা
২।	রাজনারায়ণ দ্বিবেদী	শিক্ষক	ঐ	শিউয়ান জেলা, বিহার
৩।	চণ্ডীচরণ ওঝা	শিক্ষক	ঐ	বেঙ্গো
৪।	শুভেন্দু ওঝা	শিক্ষক	তুলিন জয়সীয়ারাম উচ্চবিদ্যালয়	হুটমুড়া
৫।	ঋজু মাহাত	৪র্থ শ্রেণী	ঐ	চৌপদ
৬।	জগৎ প্রসাদ সিন্‌হা	শিক্ষক	বেগুনকোদর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেগুনকোদর
৭।	প্রয়াত অমরেন্দ্রনাথ সিন্‌হা	শিক্ষক	ঐ	হেসলা
৮।	অজিত মুখার্জী	করণিক	চাতমবরাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	কেট্যা
৯।	রাসবিহারী মহাদানী	৪র্থ শ্রেণী	ঐ	চাতমবাড়ী
১০।	যুধিষ্ঠির পাত্র	শিক্ষক	বরাভূম উচ্চ বিদ্যালয়	দুবরাজপুর
১১।	ধ্রুবপদ পাত্র	শিক্ষক	ঐ	ডুড়কু
১২।	সুভাষচন্দ্র পাণ্ডা	শিক্ষক	ঐ	ছিরুডি

১৩।	বিশ্বেশ্বর মহান্তি	শিক্ষক	ঐ	শিমুলডাঙ্গা
১৪।	সুধাকর মাহাথা	শিক্ষক	ফুলচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়	গোলা (ঝাড়খণ্ড)
১৫।	পল্টন সিং	শিক্ষক	ঐ	বিহার রাজ্য (পরে আসানসোলে গেছে)
১৬।	বানেশ্বর মিশ্র	শিক্ষক	সুইসা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজারিবাগ
১৭।	অমিয় মিশ্র	শিক্ষক	হুটমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়	ভবানীপুর
১৮।	পৃথ্বিশ চৌধুরী	শিক্ষক	লক্ষ্মণপুর যোগদা সৎসঙ্গ ক্ষীরোদ মযী বিদ্যাপীঠ	লক্ষ্মণপুর
১৯।	অরবিন্দ ওঝা	শিক্ষক	পঞ্চকোট রাজ উচ্চ বিদ্যালয়	হুটমুড়া
২০।	মিহির মণ্ডল	শিক্ষক	ঐ	কলাবনী
২১।	নির্মল কুইরী	শিক্ষক	রাজনোয়াগড় ডি পি এম উচ্চ বিদ্যালয়	কুকুরগোড়িয়া
২২।	রমানাথ মাহাত	শিক্ষক	চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়	কোনাপাড়া
২৩।	রামকমল অধিকারী	শিক্ষক	হুটমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়	নামোপাড়া, পুরুলিয়া
২৪।	তাপস বসু মল্লিক	শিক্ষক	মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন	নডিহা, পুরুলিয়া
২৫।	গোলকবিহারী দাস	শিক্ষক	রাজনোয়াগড় ডি পি এম উচ্চ বিদ্যালয়	গোবিন্দপুর, পুঞ্চা
২৬।	নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	শিক্ষক	চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়	সুইসা
২৭।	কৃষ্ণকিশোর মহান্তি	শিক্ষক	তুলিন জয়সীয়ারাম উচ্চ বিদ্যালয়	তেঁতলো, বলরামপুর
২৮।	তারিনি প্রসাদ সিং	করণিক	ঐ	
২৯।	চিত্ত গোস্বামী	শিক্ষক	বেগুনকোদর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেগুনকোদর
৩০।	মহঃ নাসিরুদ্দিন আনসারি	শিক্ষক	আর বি বি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুর	দুমদুমি
৩১।	ললিতবরণ মাহাতো	শিক্ষক	যোগদা সৎসঙ্গ ক্ষীরোদাময়ী বিদ্যাপীঠ, লক্ষ্মণপুর	বিষপুরিয়া

জেলা সমিতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমিতিভুক্ত হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে প্রথম জেলা সম্মেলন হয় পুরুলিয়া শহরে। তখন পুরুলিয়া জেলা সমিতি 'পুরুলিয়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি' নামে অভিহিত হতো (PDSSTA)। দীর্ঘদিন সমিতি ঐ নামেই চলতো। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব মেনে নিয়েও জেলা সমিতির পৃথক নাম রাখার পক্ষপাতি ছিলও অনেকেই। সাতের দশকে 'এ বি টি এ পুরুলিয়া জেলা শাখা' এই নাম ব্যবহার শুরু হয়। জেলা সম্মেলনগুলির নিখুঁত বিবরণ, কখন কোথায় সম্মেলন হয়েছিল সেইসব তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। ১৯৬৯-এ বলরামপুর, ১৯৭৩ সালে ঝালদা, ১৯৭৫ সালে পুরুলিয়া শহরের শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সম্মেলন হয়েছিল তা জানা যাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে সম্মেলন হয়েছিল নপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১৯৭৮ সালে বাবুগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৯৭৯ সালে হুটমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে জেলা সম্মেলন হয়েছিল।

১৯৮০ সাল থেকে জেলা সম্মেলনগুলি নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঃ

১৯৮০ — মানবাজার
১৯৮১ — তুলিন জয়সীয়ারাম উচ্চতর বিদ্যালয়
১৯৮৩ — হুড়া উচ্চ বিদ্যালয়
১৯৮৫ — বাঘমুণ্ডি উচ্চ বিদ্যালয়
১৯৮৭ — সাঁওতালডি এস টি পি এস উচ্চ বিদ্যালয়
১৯৮৯ — বলরামপুর সরাফ ধর্মশালা
১৯৯২ — পুরুলিয়া রাজস্থান উচ্চ বিদ্যালয়
১৯৯৫ — বাবুগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়
১৯৯৮ — বলরামপুর ফুলচাঁদ উচ্চতর বিদ্যালয়
২০০১ — পুরুলিয়া জেলা সমিতি ভবন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত হরিগোপাল সরকারের পর ১৯৬৬ সালে সম্পাদক হন শক্তিপদ সাহানী। ১৯৭৯ সালে বাসুদেব আচারিয়া, ১৯৮৫সালে অজয়মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং ১৯৯২ সাল থেকে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন শ্রীঅনাথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০১ সালের সম্মেলনে ৩০জন সদস্যের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে সভাপতির দায়িত্বে আছেন শ্রীসৌরীন মিশ্র। পুরুলিয়া জেলায় প্রশাসনিক স্তরে মহকুমা না থাকায় দীর্ঘদিন কোন মহকুমা কমিটি ছিল না। অঞ্চল সম্মেলনের পর সরাসরি জেলা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যাওয়া যেত। প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অর্থাৎ প্রত্যেক সাধারণ সদস্যই জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারতেন। ১৯৮৯ সালে হুটমুড়া উচ্চতর বিদ্যালয়ে কনভেনশন করে পুরুলিয়া মহকুমা সমিতি ও রঘুনাথপুরে কনভেনশন করে রঘুনাথপুর মহকুমা সমিতি তৈরী হওয়ার পর প্রথম সে বছরই বাঘমুণ্ডি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক জেলা সম্মেলন হয়।

১৯৮৫-র পর পুরুলিয়া মহকুমা সম্মেলন হয়েছিল নিম্নলিখিত স্থানে ঃ

১৯৮৭ — লৌলাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৫ — লাগদা উচ্চ বিদ্যালয়
১৯৮৯ — পুরুলিয়া রবীন্দ্র ভবন	১৯৯৮ — জয়পুর আর বি বি উচ্চ বিদ্যালয়
১৯৯২ — হুড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২০০১ — পুরুলিয়া এম এম উচ্চ বিদ্যালয়

প্রকাশ থাকে যে ১৯৯২ সাল থেকে মহকুমা সম্মেলনগুলিও প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে যায়। পুরুলিয়া মহকুমা তৈরী হওয়ার পর থেকে সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন অনাথ ব্যানার্জী, কানাইলাল চ্যাটার্জী, অবিনাশ মাহাত। সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন কানাইলাল চ্যাটার্জী, অনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী। বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে অবিনাশ মাহাত ও রবীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী।

১৯৮৫-র পর রঘুনাথপুর মহকুমা সম্মেলনগুলি হয় নিম্নলিখিত স্থানে ঃ

১৯৮০ — কাশীপুর পঞ্চকোটরাজ উচ্চতর বিদ্যালয়	
১৯৮৯ — পারবেলিয়া কলিয়ারী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৫ — এস টি পি এস উচ্চ বিদ্যালয়, সাঁওতালডি।
১৯৯২ — মুরাড়ি এস আর বি পি উচ্চতর বিদ্যালয়	১৯৯৮ রঘুনাথপুর জি ডি ল্যাঙ উচ্চতর বিদ্যালয়

রঘুনাথপুর মহকুমা সমিতি গঠিত হওয়ার পর থেকে সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে অরুণ গুপ্ত ও সমর সিং দেও।

জেলায় প্রথমে ছয়টি অঞ্চল শাখা কাজ করত। বর্তমানে ২০টি অঞ্চল। পূর্বতন ছয়টি অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো ঃ

১) রঘুনাথপুর অঞ্চল শাখা — বর্তমান রঘুনাথপুর মহকুমার সমগ্র এলাকাটিই ছিল এই অঞ্চলের অন্তর্গত। প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও অনাথ মোহান্ত। দ্বিতীয় সভাপতি বিমলানন্দ রায় ও সম্পাদক সমর সিং দেও।

এই অঞ্চল ভেঙে বর্তমানে পাঁচটি অঞ্চল শাখা তৈরী হয়েছে।

২) পুরুলিয়া সদর অঞ্চল শাখা — পুরুলিয়া পৌরসভা, পুরুলিয়া ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং আড়ষা পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যালয়গুলি ছিল এই অঞ্চলের অন্তর্গত। সম্পাদক ছিলেন অজয়মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

এই অঞ্চল শাখা ভেঙে এখন চারটি অঞ্চল তৈরী হয়েছে।

৩) বলরামপুর অঞ্চল — বলরামপুর, বাঘমুণ্ডি, বরাবাজার, বান্দোয়ান এই চারটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার বিদ্যালয়গুলি ছিল এই অঞ্চলের অধীন। প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ভুবন পাত্র ও মৃত্যুঞ্জয় পতি। পরবর্তীকালে সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন অনাথ ব্যানার্জী ও ভোলানাথ মণ্ডল। বর্তমানে এই অঞ্চল ভেঙে ৪টি অঞ্চল হয়েছে।

৪) ঝালদা অঞ্চল — ঝালদা ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত সমিতি, ঝালদা পৌরসভা, জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতি ও পুরুলিয়া থানার গাড়াফুসড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং সিন্দ্রি চাষ রোড নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই অঞ্চল এলাকার অধীন ছিল। অবিভক্ত ঝালদা অঞ্চলের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন নন্দকিশোর কুইরী, নিরঞ্জন মাহাত, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, দিলীপকুমার গোস্বামী। সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন হৃষিকেশ চট্টরাজ, শক্তিপদ গোস্বামী, রেবতীরঞ্জন পাঠক, দিলীপকুমার গোস্বামী।

৫) পূর্বাঞ্চল শাখা — হুড়া ও পুঞ্চা এই দু'টি পঞ্চায়েত সমিতি এই অঞ্চল শাখার অধীন ছিল। সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন সত্যকিংকর দাশ ও অবিনাশ মাহাত।

৬) মানবাজার অঞ্চল — মানবাজার ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা নিয়ে এই অঞ্চল কাজ করতো। সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন সত্যকিংকর পাত্র ও সতীশ মাহাত।

মূলত ১৯৯২ সাল ও তৎপরবর্তীকালে অঞ্চল সংগঠনটিকে ব্লকভিত্তিক করার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল। নীচে বর্তমানের ২০টি অঞ্চল শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

১) কাশীপুর অঞ্চল — ১৯৮১ সালে তালাজুড়ি শ্রীমতী উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্মেলনের মধ্যদিয়ে কাশীপুর অঞ্চল শাখা তৈরী হয়। প্রথম সভাপতি সুধীর মণ্ডল ও সম্পাদক অরবিন্দ ওঝা। কাশীপুর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সমস্ত বিদ্যালয় এই অঞ্চল শাখায় কাজ করে। বর্তমান সভাপতি বিজয় মণ্ডল ও সম্পাদক রেবতীরঞ্জন পাঠক। এই মহকুমার নেতুরিয়া অঞ্চল বাদ দিয়ে অন্যান্য অঞ্চলগুলি গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে।

২) রঘুনাথপুর অঞ্চল — রঘুনাথপুর ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত সমিতি ও রঘুনাথপুর পৌরসভার বিদ্যালয়গুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৫সালের পরবর্তীকালে এখানে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন চণ্ডী গুপ্ত। সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন নিখিল দাশগুপ্ত, প্রশান্ত ওঝা, সচ্চিদানন্দ মুখার্জী। বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক কাশিনাথ মাজি ও সচ্চিদানন্দ মুখার্জী।

৩) পাড়া-সাঁওতালডি অঞ্চল — পাড়া পঞ্চায়েত সমিতি ও সাঁওতালডি থানা এলাকাটি এই অঞ্চলের অধীন। প্রথম সভাপতি চিত্তরঞ্জন সেন ও সম্পাদক নিতাই লাহা। পরবর্তীকালে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন গোলাব আনসারি ও অশোক গুপ্ত। বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক নিতাই চৌধুরী ও ভূবন মাজি।

৪) নেতুড়িয়া অঞ্চলটি গঠিত হয়েছে ১৯৯৫সালে। প্রথম সভাপতি রাজবল্লভ পাঠক। সম্পাদক হিসেবে প্রথমাবধি কাজ করেছেন ধরণী ব্যানার্জী। বর্তমান সভাপতি কার্তিক শর্মা।

৫) সাঁতুড়ি অঞ্চল শাখা — এই শাখাটি একসময় সাঁতুড়ি ও নেতুড়িয়া এই দু'টি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সনৎ রায় ও শঙ্কর বিশ্বাস। বর্তমান সাঁতুড়ি অঞ্চল শাখা ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করছে। সম্পাদক শঙ্কর বিশ্বাস। সভাপতি রামনাথ মণ্ডল।

৬) পুরুলিয়া অঞ্চল — পুরুলিয়া পৌরসভার সমস্ত বিদ্যালয় এই অঞ্চলের অধীন। নবগঠিত অঞ্চলটি ১৯৯২ থেকে কাজ করছে। আড়ষা থানার বিদ্যালয়গুলি এই অঞ্চলের অধীন ছিল। পরে আড়ষা অঞ্চল পৃথক হয়ে যায়। প্রথমে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসাদ অধিকারী ও প্রণব চ্যাটার্জী। পরে সম্পাদক হন জ্ঞানরঞ্জন সিংহ মহাপাত্র ও সভাপতি হন প্রণব চ্যাটার্জী। বর্তমান সভাপতি জ্ঞানরঞ্জন সিংহ মহাপাত্র ও সম্পাদক বিভূতি পরামাণিক।

৭) পুরুলিয়া ১নং অঞ্চল শাখা — ১৯৯২তে গঠিত হয়েছে। সভাপতি সত্যেন্দু গুপ্ত। বর্তমান সভাপতি অশ্বিনী ত্রিপাঠি। সম্পাদক হিসাবে প্রথমাবধি কাজ করছেন অশোক ব্যানার্জী।

৮) পুরুলিয়া ২নং অঞ্চল শাখা — ১৯৯২ সাল থেকে কাজ করছে। সভাপতি ছিলেন ইন্দিরা আচারিয়া। সম্পাদক হিসাবে প্রথমাবধি কাজ করছেন বাহাদুর মাহাত। বর্তমান সভাপতি সুভাষ মাহাত।

৯) জয়পুর অঞ্চল শাখা — ১৯৯২ সালে গঠিত হওয়ার পরবর্তীকালে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন মুরুলিধর পরামাণিক ও অশোককুমার পতি।

১০) ঝালদা ১নং অঞ্চল — এই শাখার কাজ ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে ঝালদা পৌরসভা ও ঝালদা ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় অঞ্চলটির কার্যধারা বিস্তৃত। একসময় ঝালদা ২নং পঞ্চায়েত সমিতিটি এই অঞ্চলের অধীন

ছিল। প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক শক্তিপদ গোস্বামী ও মধুসূদন মাহাত। পরে সভাপতি হন চণ্ডীচরণ চন্দ্র ও সম্পাদক হন পার্থপ্রতিম মণ্ডল। বর্তমান সম্পাদক আফাজউদ্দীন আনসারি। সভাপতি অন্য অঞ্চলে বলে যাওয়ায় সভাপতির পদ পূরণ করা যায়নি।

১১) ঝালদা ২নং অঞ্চল বা কোটশিলা অঞ্চল — এই অঞ্চল শাখা ১৯৯৯ সালের ২২শে আগস্ট সত্যভামা বিদ্যাপীঠে কনভেনশনের মধ্যদিয়ে তৈরী হয়। বর্তমান সভাপতি রসরাজ মাহাত ও সম্পাদক মধুসূদন মাহাত।

১২) বাঘমুণ্ডি অঞ্চল শাখাটির প্রথম সভাপতি হিকিম মাঝি ও সভাপতি দানিয়েল সাণ্ডিল। বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক প্রয়াগচন্দ্র কুমার ও দুলালচন্দ্র মাহাত।

১৩) বলরামপুর অঞ্চল — এই অঞ্চল শাখার ১৯৯২-এর সম্মেলনে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন অমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও রবীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী। সে বছরই মহকুমা সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় রবিবাবু পদত্যাগ করলে সম্পাদক হিসাবে তখন থেকেই দায়িত্ব পালন করছেন প্রবীর পাল। এখানে সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন কিশোরীলাল চৌরাসিয়া ও কৃষ্ণচন্দ্র গোপ (বর্তমানে কর্মরত)।

১৪) বরাবাজার অঞ্চল — এই অঞ্চলটিতে সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে ১৯৯২ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন খগেন্দ্রনাথ মাহাত ও মনোতোষ রায়।

১৫) বান্দোয়ান অঞ্চল — এই অঞ্চলে ১৯৯২ সাল থেকে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন ভোলানাথ মণ্ডল। বর্তমান সভাপতি প্রকৃতিরঞ্জন দত্ত।

১৬) মানবাজার ১নং অঞ্চল — ১৯৯২তে গঠিত হওয়ার পর সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন অনিল মাহাত। সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন সতীশ মাহাত ও সৌরীন মিশ্র। বর্তমান সভাপতি শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭) মানবাজার ২নং অঞ্চল — ১৮.৮.৯৯ তারিখে আর এম আই ইনস্টিটিউশনের কনভেনশনে অঞ্চলটি পৃথকসত্তা পায়। প্রথমাবধি সভাপতি ও সম্পাদক আছেন ভক্তরঞ্জন মাহাত ও দশরথ মুদি।

১৮) পুঞ্চা অঞ্চল — প্রথম সম্পাদক লম্বোদর মণ্ডল। পরে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন বিপদতারণ ঘোষ। সভাপতি হিসাবে দায়িত্বে আছেন সন্তোষ মাহাত।

১৯) হুড়া অঞ্চল — ১৯৯২ সাল থেকে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে সুধীরচন্দ্র মণ্ডল ও বরুণচন্দ্র মাহাত দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান সভাপতি বরুণচন্দ্র মাহাত ও সম্পাদক সুভাষচন্দ্র মাহাত।

২০) আড়ষা অঞ্চল — অঞ্চলটি ২১.৮.১৯৯৯ তারিখে গঠিত হওয়ার পর থেকে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন খান্দুলাল মাঝি ও অনিল কুইরী।

(চলবে)

স্কুল ও দেশ বাঁচাতে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করুন

(ধারাবাহিক)

এ বি টি এ'র বীরভূম জেলার শিক্ষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

রাধাবল্লভ রায়

১৯৫৮ সালে রামপুরহাটে প্রাদেশিক সম্মেলনের পর আমি বি টি পড়তে যাই এবং সভা করে এক বৎসরের জন্য জন্মেজয় প্রামানিককে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমার যতদূর মনে পড়ছে, এই সময় অরুণ চৌধুরীও বি টি পড়তে গিয়েছিল। এই সময় আমি কলকাতায় থাকি। বীরভূমের সঠিক খবর জানি না, তবে তখনকার দু'টি উল্লেখযোগ্য বিষয় Welfare Institution Bill এবং প্রতিক্রিয়াশীল মাধ্যমিক বোর্ড বিলের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি হয়েছিল কিনা আমার সঠিক জানা নেই। বি টি পাশ করার পর আমাকে আবার স্কুলের স্বার্থে ১৯৬০ সালে পদার্থবিদ্যায় কনটেন্ট ট্রেনিংয়ে কলকাতা যেতে হয়। ফলে আমার যা কিছু কাজ তখন কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এই সময়ই নগরী স্কুলটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয় বলে মনে হয়। ১৯৬০ সালে আমার সময় এবং জন্মেজয় সম্পাদক থাকাকালীন যোগাযোগের অসুবিধার জন্য বেশীরভাগ সভা মল্লারপুরে করতে হতো। যাক এই সময় এটা বুঝেছিলাম যে, সম্পাদকের দায়িত্ব সিউড়ীর কোন নূতন শিক্ষকের হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তখন সিউড়ীর কোনো শিক্ষকই জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক ছিল না। আমরা প্রচণ্ড চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম। সেজন্য নগরী সিউড়ী থেকে দূরে হলেও অরুণ চৌধুরীকে সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুশৃঙ্খল এবং কর্মঠ অরুণ চৌধুরী দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।

এই সময় জেলা সংগঠনের নীচে একমাত্র মহকুমা সংগঠন ছিল, এই মহকুমা সংগঠন খুব দুর্বল ছিল। তার আয়ের কোনো উৎস ছিল না। স্বভাবতই তার নিজস্ব উদ্যোগে কিছু করার ক্ষমতাও ছিল না। বছরে একটা-দুটো মিটিং হতো এবং তার টি এ জেলা কমিটি অনুদান হিসাবে দিত। এই টি এ-এর ব্যবস্থা থাকলেও মিটিংয়ে কোরাম হতো না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিভূতি ব্যানার্জী (সদর) এবং কমলাকান্ত মণ্ডল (রামপুরহাট) সম্পাদক ছিলেন। এর পরবর্তীকালে রামপুরহাটে মানিক নন্দী (জামালপুর হাইস্কুল), কালীপদ সেনগুপ্ত (সোনারকুণ্ডু হাইস্কুল), সুনীলপ্রসন্ন রায় প্রমুখ সম্পাদক হয়েছিলেন, আর আমাকেও কিছুদিন দায়িত্ব নিতে হয়। পরে আমি গণপুর হাইস্কুলে গিয়েছি। আর সদরে গুরুপদ নন্দন অনেক বছর সম্পাদক ছিলেন। পরে আমাকে হতে হয়েছিল, তারপর পারুল এবং তারপর চণ্ডীও সম্পাদক হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষ হয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি (পরবর্তীকালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি) এবং এ বি টি এ'র উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে। তখন প্রথমদিকে এ বি টি এ'র প্রকাশ্য মিটিং করা সম্ভব হচ্ছিল না। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, তাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

মানিক সাব-ডিভিসনের মিটিং ডেকেছে। আই বি হাইস্কুল, প্রাথমিক স্কুল একটার পর একটা স্থানে বাধা সৃষ্টি করছে, মিটিং করতে দিচ্ছে না। এমনকি নিজের বাড়িতে করবো মনস্থ করলেও আই বি জরুরী অবস্থার কথা উল্লেখ করে তাদের ভয় দেখাচ্ছিল। ফলে বাধ্য হয়ে মিটিংয়ের দিনে একটা গোপন স্থানে সভ্যদের নিয়ে গিয়ে মিটিং করা হয়। মনে রাখা দরকার, তখন যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল ট্রেন।

অপর একটি ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আমাকে নিয়ে। সে

সময় স্কুলের ছাত্ররা কিছু দাবী-দাওয়া নিয়ে অনশন আন্দোলন করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করি। ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক এবং অপর একজন সদস্য ছাড়া অবশিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল সদস্যগণ এবং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধা আমার কিছু সহকর্মী এস ডি ও-কে দিয়ে আমাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে শোকজ করান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার স্কুলের সম্পাদক কিন্তু শোকজ করেন নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে সত্যপ্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি একটি জব্বর জবাব লিখে দেন এবং সেটি আমি উত্তর হিসাবে দিই। এরপর এই ঘটনা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য লক্ষ্য করলাম না।

এই এস ডি ও সাহেব মল্লারপুরে নাইট হল্টে এলে আমার সঙ্গে তাস খেলতেন। তিনি একদিন খেলতে খেলতে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "উত্তরটি কোথা থেকে লিখে এনেছিলেন?" আমি তাকে জানিয়েছিলাম আমাদের নেতা সত্যপ্রিয় রায় এই উত্তর লিখে দিয়েছেন। তিনি শুধু আমাকে বলেছিলেন — "আচ্ছা বোম ঝেড়েছিলেন মশাই"।

এছাড়াও এ সময় সাঁইথিয়া টাউন জুনিয়র হাইস্কুলের তিনজন এবং পরে আর একজন কর্মচ্যুত হন। এঁরা হলেন ব্রজ মুখার্জী, চণ্ডী সাধু, জগন্নাথ দাস এবং রবীন্দ্রচন্দ্র লোধ। এঁরা কিন্তু সমিতির কাছে কোনো আবেদন করেন নি। অবশ্য করলেও সমিতি কিছু করতে পারতো বলে মনে হয় না।

এই সময় সরকার শিক্ষকদের উপর একটা নতুন আক্রমণ নামিয়ে আনল। শিক্ষকদের চাকুরি অনুমোদনের জন্য পুলিস ভেরিফিকেশন অপরিহার্য করল। এতে বীরভূম জেলায় অরুণ চৌধুরীর উপর খাঁড়াটি প্রথমেই নেমে এল। সে তখন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছে। তার অনুমোদনের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে। স্বভাবতই সে কম্যুনিস্ট বলে এই অনুমোদন হবে না। যেজন্য সে সংগঠনগতভাবে সিউড়ীর বিভিন্ন জননায়ক এবং শিক্ষকদের কাছে এর যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। জননায়ক এবং বুদ্ধিজীবী সকলেই এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। এই নিয়ে সিউড়ীতে একটা সভা হয়। সেই সভায় ননী সেন মশায় (অধ্যাপক, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ) সভাপতি হন। সন্তোষদা এসেছিলেন এবং সিউড়ীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভাতে সরকারের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অপরদিকে এ বি টি এ এটা নিয়ে আন্দোলনও শুরু করে। পুলিশ ভেরিফিকেশন রোধের জন্য ৬ই সেপ্টেম্বর বিধানসভা অভিযান করা হয়, তাতে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম। পরে ১৮/১৯ দিন আমরা কর্মবিরতি পালন করি। চাপের কাছে সরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে অরুণ চৌধুরী ওয়ার্কিং এবং ফিনান্স কমিটির সদস্য হন। ১৯৬৪ সালে সরকার স্নাতক এবং অবস্নাতক শিক্ষকদের জন্য পাঁচ টাকা, স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের জন্য ১০ টাকা এবং অশিক্ষক কর্মীদের জন্য ডি এ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ বি টি এ এই ডি এ বয়কটের আহ্বান জানান। কিন্তু আমরা শিক্ষকদের আটকাতে পারিনি। আমাদের জেলায় আমরা ৩/৪ জন বাদে সকলেই এই ডি এ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে নতুন বেতনহার এবং সমহারে মহার্ঘ্যভাতার দাবীতে একদিনের বিক্ষোভ মিছিল হয়। তারপর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। এই সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনকে সফল করবার জন্য রামপুরহাট মহকুমার মুরারই থানার পূর্বাংশের স্কুলগুলির, নলহাটির রেল লাইনের কাছে তিনটি স্কুল, রামপুরহাট থানার পূর্বদিকে তিনটি স্কুলের সঙ্গে প্রায় হেঁটে যোগাযোগ করি। তখনও বাসের ব্যবস্থা চালু হয়নি। ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে কর্মবিরতি ও অবস্থান হবে জেনেই যোগাযোগ করি। এই সময় বামপন্থী নেতৃত্বের চাপে সরকার সকলের জন্য সমহারে মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা করেন।

এই সময় এ বি টি এ'র একক আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব হবে না — এই বোধ থেকে সত্যপ্রিয়বাবু এবং কে জি বোসের নেতৃত্বে ৪৪/৪৫টি গণ-সংগঠনকে নিয়ে '১২ই জুলাই কমিটি' গঠন করা হয়। তৎকালে এর যৌক্তিকতা থাকলেও আমাদের এ বি টি এ'র পক্ষে এই সংগঠনকে শক্তিশালী করা সম্ভব হয়নি। আজকের দিনেও এর গুরুত্ব আমরা শিক্ষক মহাশয়দের কাছে তুলে ধরতে পারিনি।

১৯৬৬ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষাকে অবৈতনিক করা প্রভৃতি দাবীগুলি নিয়ে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। '৫৪ সালের চেয়ে এই আন্দোলন কোন অংশেই কম নয়। শিক্ষার দাবীকে জাতীয় দাবীতে

পরিণত করার জন্য শিক্ষকরা যেমন ফুঁসছে, অপরদিকে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক (বামপন্থী) আন্দোলন তখন তুঙ্গে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের ১০ই সেপ্টেম্বর আন্দোলন শুরু হয়। একদিকে শিক্ষকরা তাদের দাবী পূরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অন্যদিকে সরকারও কোনরকম দাবী-দাওয়া মানতে অনিচ্ছুক। এই সময় সরকারের সাহায্যার্থে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কিছু বিভেদকামী শক্তিকে নিয়ে এই আন্দোলন বানচাল করারও চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি শুরু হলেও ১৩ তারিখ থেকে রাজভবনের সামনে অবস্থান শুরু হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে আইন অমান্য হয় সত্যপ্রিয়বাবু এবং সন্তোষদার নেতৃত্বে। প্রথমদিন আইন অমান্য আন্দোলনে আমি ছিলাম। এইদিন প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষক গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই সময় জেলা সমিতির প্রচার তুঙ্গে থাকায় সমিতির সিদ্ধান্তমতো দফায় দফায় কারাবরণ করবে এই সিদ্ধান্ত থাকায় সাঁইথিয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের জেলা থেকে রোজ সত্যাগ্রহী পাঠানো হতো। প্রায় ৫০/৬০ জন এই জেলা থেকে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সবচেয়ে আনন্দের কথা, মল্লারপুর হাইস্কুল ১৬ জন সত্যাগ্রহী পাঠিয়ে জেলা থেকে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণকারীর স্থান করে নিতে পেরেছিল।

৭ই অক্টোবর আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। তখন দেখা যায় প্রায় ২৫০০ জন শিক্ষক জেলে গিয়েছেন। এই অন্তর্বর্তীকালে এ বি টি এ'র নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের জেলখানায় দফায় দফায় আন্দোলন চলছে। আমরা কিন্তু সমাধান হওয়ার কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সমিতির নেতৃত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হচ্ছে এই বিবেচনা করে আন্দোলন প্রত্যাহারে সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোষণা হয় যে শিক্ষার প্রতি দরদহীন অগণতান্ত্রিক এবং অনিচ্ছুক সরকারকে উচ্ছেদ না করলে শিক্ষকদের দাবী পূরণ হবে না। তাই স্লোগান দেওয়া হলো "Oust this anti-people and anti-education Government".

সাময়িকভাবে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম কারণ বেশীরভাগ শিক্ষক কিছু না পাওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন। '৬৭ সালে নির্বাচন এসে গেল। প্রথমটাই হতাশা কাটাতে কিছুটা কঠিন মনে হলেও পরে শিক্ষক মহাশয়দের বোঝাতে পেরেছিলাম যে কারণে '৬৭ সালে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছিল। এরপর ঐ বছরেই সিউড়ীতে প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকা ছিল। নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ায় আমরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সম্মেলনকে সফল করতে নেমে পড়লাম।

'৬৬-এর আন্দোলনের পর আমরা জেলায় অনেক নূতন মুখ দেখতে পাই, এদের মধ্যে সকলের নাম মনে না থাকলেও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে — চণ্ডী সাধু, পারুল রায় চৌধুরী, রবীন্দ্রচন্দ্র লোধ, সন্তোষ দাস, ব্রজ মুখার্জী, তারক ব্যানার্জী, বটুক মজুমদার, মহম্মদ হাসিফউদ্দীন প্রমুখ। সিউড়ী সম্মেলন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য উদ্বোধন করেন। শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা এবং পেনসন বিধি প্রণয়নের আশ্বাস দেন। এই সরকারের অর্থমন্ত্রী জ্যোতিবাবু শিক্ষকদের মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা সমিতির একইহারে মহার্ঘ্যভাতার দাবীর সঙ্গে একটু সঙ্গতিবিহীন ছিল। শিক্ষকদের জন্য একরকম এবং অ-শিক্ষকদের জন্য আর একরকম ডি এ ঘোষণা হয়। সমিতি থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো টাকাটা বিদ্যালয়ে এলে আমরা সমানভাবে ভাগ করে নেব। সমিতির প্রভাব-প্রতিপত্তি যেখানে ছিল, সেখানে এই নির্দেশ পালিত হয়, অন্যান্য খবর আমার জানা নাই। এই সময় আমাদের জেলার শিক্ষক সমিতির নেতা ছিলেন অরুণ চৌধুরী। আমরা পরিকল্পনা করে সকলে মিলে জেলার বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এর ফলে এই সম্মেলন সফল হয়।

'৬৮ সালে প্রতিক্রিয়াশীলরা চক্রান্ত করে শিক্ষকদের আশার আলো এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। তাই আমাদের অর্জিত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ আরম্ভ হয়। প্রথমেই আমাদের বঞ্চনামূলক বিধির জন্য আন্দোলন করতে হয়।

ইতিমধ্যে '৫৯ সালের নির্বাচনে আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের মন্ত্রিসভায় সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষামন্ত্রী হন। তিনি শিক্ষকদের সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল ছিলেন তাই শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বিষয়ে কিছু নিয়মের পরিবর্তন করার এবং স্কুল পরিচালক সমিতির শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বোর্ড আইনের পরিবর্তন করা হয়। এই দু'টি পরিবর্তনে শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা অনেকখানি সুনিশ্চিত করে।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার জন্য মাত্র ৮ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে দাবী করেছিলেন। সেই

টাকা দেওয়ার দাবীতে দিল্লীতে শিক্ষকরা একটি মিছিল করেন। আমাদের জেলা থেকেও আমরা সহ কয়েকজন শিক্ষক যোগদান করেছিলেন। এই সময়ে আদিবাসী তপশীল প্রাথমিকে পাঠরত মেয়েদের পোষাক দেওয়া হয় এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়।

'৬৭ এবং '৬৯ সালে অনেক নতুন নতুন কর্মী সংগঠনে এসেছেন। এদের মধ্যে সকলের না হলেও কয়েকজনের নাম আমার স্মরণে আছে। তার কিছু উল্লেখ করছি। অবশ্য দুই/একজন আগে-পরে এসেছেন — (১) মফিজুদ্দিন, (২) পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, (৩) শান্তিরাম চৌধুরী, (৪) প্রভাত ঘোষ, (৫) অন্নদাবাবু (নলহাটি), (৬) বদরুজ্জামান, (৭) অজিত ঘোষাল, (৮) জ্যোৎস্নাবাবু (বাঁধগড়া), (৯) ষষ্টিবাবু, (১০) মাধববাবু, (১১) সমর সেন, (১২) বনশ্রী সিংহ, (১৩) ভারতী, (রামপুরহাট গার্লস), (১৪) দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী, (১৫) হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী, (১৬) আবদার রহিম, (১৭) অশোক রায় (ময়ূরেশ্বর), (১৮) অনুকূল শীল, (১৯) তৃপ্তি শীল, (২০) সুশান্ত এবং (২১) মহঃ ইসমাইল প্রমুখ।

'৭০ সালে চন্দননগরে সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে এ বি টি এ'র গঠনতন্ত্রকে আরও গণতান্ত্রিক করার জন্য এবং প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন করার জন্য সম্মেলনে প্রস্তাব আনা হয়। মনে রাখা দরকার, প্রতিটি সম্মেলনে উত্তরোত্তর সদস্য বৃদ্ধি হচ্ছিল তাই এই সংশোধন প্রয়োজন ছিল। এই সম্মেলনে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার জন সদস্য উপস্থিত হন। এই সম্মেলন থেকে সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি'র কিছু শিক্ষক সংগঠনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং প্রায় ২০০/৩০০ জন শিক্ষক-সদস্যদের নিয়ে বেরিয়ে যান।

এই সময় আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের নজর রাখা দরকার। '৬৭ সাল থেকে জমির আন্দোলন তীব্র হচ্ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ তাঁরা এ বি টি এ'র আন্দোলনের বিরোধিতা করছিলেন এবং তাঁদের সংগঠন ডব্লিউ বি টি এ'র শক্তি কম ছিল। তাই তাঁরা জমির মালিক এ বি টি এ'র সদস্যদের এ বি টি এ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য নানাভাবে মদত দিচ্ছিলেন।

১৯৭০ সালে আবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব নেন। স্বভাবতই তিনি শিক্ষকদের এতদিনের অর্জিত অধিকার বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে নিচ্ছিলেন। এ বি টি এ '৭০ সালে আগস্ট মাসের শেষের সাতদিন কর্মবিরতি পালন করেন। এই সময় জেলাতে 'শিক্ষা বাঁচাও' দাবীতে সিউড়ীতে অবস্থান করা হয়।

আস্তে আস্তে নকশাল দমনের নামে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। '৭৩ সালে জুলাই মাসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে ডেপুটেশন এবং অবস্থান করা হয়। '৭৪ সালে ১১৮ টাকা মহার্ঘ্যভাতা দাবী করা হয়। কিন্তু '৭৫ সাল থেকেই জরুরী অবস্থা জারীর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিভীষিকার রাজ কায়েম করা হয়। এই সময় গণ-আন্দোলনের কর্মীদের নকশাল দমনের নামে হত্যা করা শুরু হয়। অনেক শিক্ষককে হত্যা করা হয়, অনেক কর্মীকে গৃহছাড়া করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য কায়েম করে পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়। এই অবস্থা '৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

'৭৭ সালের মে মাসে সিউড়ীতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে আমাদের জেলা সংগঠনকে আরও দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করানো সম্ভব হয়। অবশ্য আজকালের নেতা ও কর্মীরা সন্ত্রাসের যুগ এবং বামফ্রন্ট আসার সুবর্ণ যুগের বিষয় বিস্তৃতভাবে জানেন, সেইজন্য আমার কথা সংক্ষেপে রাখার চেষ্ট করলাম।

শিক্ষকদের সুবর্ণ যুগ

'৭৭ সালের বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সমাজের সমস্ত স্তরের খেটে-খাওয়া মানুষ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শিক্ষাব্যবস্থায় একটা সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হলো। প্রায় আন্দোলন না করেই শিক্ষক মহাশয়রা অপ্রত্যাশিত সব সুযোগ পেতে লাগলেন। তাঁদের পাওয়ার প্রত্যাশা বেড়ে গেল। তাঁরা ভুলে যেতে লাগলেন, চাকুরির নিরাপত্তা এবং বাঁচার মতো মজুরি বা বেতন পেলে আরও বেশী কর্তব্যনিষ্ঠ হবার কথা। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা পূর্বে এই ধারণা পোষণ করতেন।

আমার আজকে খুব খারাপ লাগে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের অপ্রত্যাশিতভাবে দিয়েছেন তবুও নূতন স্কেলে ১০ বছর এবং ২০ বছরের যে ইনক্রিমেন্ট তা স্থগিত রাখলে, তার জন্য ডব্লিউ বি টি এ যে কর্মবিরতির ডাক দেয়, তাতে অনেক এ বি টি এ সদস্য (যাঁরা বেশীরভাগ দু'টি সংগঠনের সদস্য) অংশগ্রহণ করেন। আমি ভাবি, এই ধরণের শিক্ষক যাঁদের দ্বৈত চরিত্র, তাঁরা জাতির কি চরিত্র

গঠন করবেন?

শেষে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৮৭ সালে আবার এই জেলায় সমিতির সম্মেলন। তার জাঁকজমক আমার কাছে খুব বাহুল্য মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল যে ৩০/৪০ হাজার টাকা শুধু শুধু অপচয় করা হলো। '৮৭ সালের এবং '৭৭ সালের সম্মেলনের কোন হিসাব দেওয়া হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। অবশ্য '৮৭ সালের কথা আমার জানার অবকাশও ছিল না, কারণ এই সময় পার্টি নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমি নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিই।

১৯৬৯ সালের পরবর্তীকালে জেলা নেতৃত্বে আসা কিছু জনের নাম আমি উল্লেখ করছি, যদিও সকলের নাম মনে নেই। (১) ওবায়েদুল্লা, (২) সুধাংশু বিকাশ কাহালী, (৩) অশোক রায় (দুবরাজপুর), (৪) হরেরাম মণ্ডল (কুন্তলা), (৫) বৈদ্যনাথ সিংহ, (৬) বেন্‌জির রহমান, (৭) রবিউল হক, (৭) জগন্নাথ রায়, (৯) আনসার আলি (মৃত), (১০) অনিল দাস, (১১) সন্তোষবাবু (সাঁইথিয়া), (১২) সন্তোষ (ইলামবাজার), (১৩) অলোক রায় (শ্রীরামকৃষ্ণ), (১৪) শ্রীকুমার চ্যাটার্জী, (১৫) ধীরেন মণ্ডল, (১৬) ধীরেন ঘোষ (তাঁতিপাড়া), (১৭) ননী ঘোষ [এই ননীবাবুকে সিউড়ী বাংলা স্কুল থেকে তাড়ানো হয়েছিল, আমরা কিছু করতে পারিনি এটা খুবই দুঃখের], (১৮) মহঃ মুসা, (১৯) ধীরেন মণ্ডল (নারানপুর), (২০) অন্নদা মণ্ডল (শ্রীরামকৃষ্ণ), (২১) শিলাদি, (২২) দুর্গা ঘোষ, (২৩) এস এ এ মোবিন, (২৪) রাধাশ্যাম দাস (ডেউটা), (২৫) গঙ্গাধর মণ্ডল (কোটাসুর), (২৬) বিশ্বরূপ কাঁঠাল [ইনি ১৯৫৪ সালের আন্দোলনে কলকাতায় ছিলেন]।

আমার নটে গাছটি যখন মুড়োতে চলল, তখন আমার স্নেহভাজন এবং পুত্রস্থানীয় এক শিক্ষক আমাকে বললেন, আমাদের কি করণীয় আপনার মতানুসারে তার একটু উল্লেখ করবেন। সেইটুকু মাত্র উল্লেখ করে আমার কথা শেষ করছি।

বামফ্রন্ট সরকার আমাদের পূর্বের যে দাবী ন্যূনতম বেতন তার অনেক বেশী শিক্ষক মহাশয়দের দিচ্ছেন। একদিন মনে করা হতো, শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা এবং ন্যূনতম বেতন দিলে তাঁদের জাতিগঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন। হা-হতোশ্মি! সেদিনের প্রত্যাশা আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে।

আজকের দিনে কংগ্রেস, বি জে পি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কৃপায় বন্‌ধ, বিক্ষোভ এবং অবস্থান যেন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তাই আর পেশাগত দাবী-দাওয়া নিয়ে ঐগুলি করার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, কারণ বামফ্রন্ট সরকার চাইবার পূর্বেই দিচ্ছেন। তাই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি শিক্ষক মহাশয়দের কাছে আবেদন রাখছেন যে, নিজের দায়িত্বটা যেন আমরা সুষ্ঠুভাবে পালন করি। এ যেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বের সরকারী কর্মচারীদের কাছে আহ্বান 'ঠিক সময়ে অফিসে আসা এবং যাওয়া ও নিজের দৈনন্দিন কাজ সুষ্ঠুভাবে করা'। কিন্তু বাস্তব চিত্র মোটেই আশানুরূপ নয়। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি অনুরূপভাবে শিক্ষক মহাশয়দের নিকট দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারছেন না এবং যেটুকু বলছেন তা কার্যকরী করার জন্য প্রায় সুষ্ঠু কোন কর্মপন্থাই নেই। স্বভাবতই আবেদনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সকলে তাঁর দায়িত্ব অবহেলা করছেন তা কিন্তু নয়, কারণ তা হলে শিক্ষাব্যবস্থাটা চলছে কি করে। কিছু দায়িত্বহীনদের জন্য দুর্নাম হচ্ছে।

তাই আমার প্রস্তাব, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষকদের জন্য re-orientation-এর যে ব্যবস্থা করেছিলেন সেটি গুরুত্ব সহকারে কার্যকরী করলে ছাত্র-ছাত্রীদের অশেষ উপকার হবে।

তবে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে "১৯৩৮ সালে হেতমপুরের রাজাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় হেতমপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল।"

[শেষ]

সময়াভিযান

দুর্গাদাস ভট্ট

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

চারদিকে আগুন ছুটছে। পিন্টু এবং রুণার এখন মাঝে মাঝে কেমন দিশাহারা মনে হয়। বিকেলের দিকে তাদের ক্লাবঘর এখন প্রায়ই ফাঁকা। নিতান্তই তাদের না দেখলে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না এমনই দু'চারজন সন্ধ্যার দিকে বাইরের মাঠের কামিনী গাছটার তলায় এসে জড়ো হচ্ছে। কিন্তু কেউই যেন তেমন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। প্রতিদিনের রেডিওর খবরে বলছে পূর্ব রণাঙ্গনের কথা। গুজবও তুঙ্গে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপ-বাহিনী রেঙ্গুণের দখল নিচ্ছে। অচিরেই ভারতে ঢুকবে। বড় বড় শহর ছেড়ে মানুষ পালাচ্ছে। বিশেষ করে কলকাতা শহর থেকে। এদের মুখেও অনেক কথা।

আজই সন্ধ্যায়, যখন ক্লাবঘরের কাছে রুণা এবং পিন্টু বসে আছে। রসকে আর ষষ্টি বেশ উত্তেজিত হয়েই ছুঁটে এলো,

—এই পিন্টু, জানিস তো আজ সকালেই আমার মামার বাড়ির বেশ ক'জন কলকাতা ছেড়ে এল। ওখানে মাঝে মাঝে সাইরেনের মহড়া, জানিস তো?

—সাইরেন আবার কি?

প্রচণ্ড কোঁ কোঁ শব্দে বিমান আক্রমণ হলে কিভাবে পালাতে হবে, কে কোথায় আশ্রয় নেবে তারই আগাম ব্যবস্থা। রসকে বলে। ওকে ভীষণ উত্তেজিত আর চিন্তিত মনে হয় পিন্টু আর রুণার।

—তা সত্যিই সত্যিই যদি বোমা পড়ে মানুষ কোথায় ঢুকবে?

—তাও জানিস না। আমার বড় মামা বলছে কলকাতার প্রতিটি পার্কে যে কোনো ফাঁকা জায়গায় এখন ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে। গভীর গভীর খাদ তাঁর মধ্যে লুকালে স্প্রিন্টার লাগবে না।

—স্প্রিন্টার কিরে?

—বোমার টুকরো অবশ্য। এছাড়া ব্ল্যাকআউট সেও এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড।

—ভয়ঙ্কর কিসের?

রসকেকে অনেকেই রসিক মোড়ল বলে ডাকত। ওর বাচনভঙ্গিতে সবসময়েই একটা সবজান্তা ভাব লেগে থাকে। রুণা ও পিন্টু যে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনছে এতে রসকে আরো পুলকিত বোধ করে। সে সোজা দাঁড়িয়ে বাঁহাতের তালুর ওপর ডান হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চাপর মেরে বলে,

—সারারাত অন্ধকারে বুঝলি, লন্ঠনের আলো জ্বালিয়েও তাতে কাগজের ঠোঙা ফিট করতে হবে কিংবা ভূষোকালি দিয়ে সামান্য টিমটিমে করতে হবে। নইলে এ আর পি, পুলিশ সব দৌড়ে আসবে। মোটা টাকা ফাইন বোঝ ঠেলা।

—এতো মহামুস্কিল।

রুণা বলে। তাঁর মুখের কথা টেনে নিয়ে ষষ্টি বলে,

—শুধু, শুধু তা-তা-তাই কি রুণাদি।

আ-আ-আরো আছে।

ষষ্টি এমনিতেই তোতলা। উত্তেজিত হলে আরো তোতলা হয়। সে আবার বলে,

—আ-আ-আমাদের বাড়ির সামনের স-সহদেব বলছিলো,

—তুই থামতো ষষ্টি। আমি বলছি

রসকে আবার শুরু করে। সহদেব বলছিলো, বাড়ির মেয়েদেরও খুবই অসুবিধা। বড় রাস্তায় যাওয়া চলবেনা। গোরা সৈন্যরা রাইফেল কাঁধে টহল দিচ্ছে। উঁচু উঁচু সাঁজোয় গাড়ি এমনভাবে রাস্তা অতিক্রম করছে যেন কাউকে পরোয়া করেনা। একটু অসাবধান হলেই থেঁতলে একেবারে মাটিতে লেপটে দিয়ে যাবে। গোরা সৈন্যরা অনেক মেয়েকে নাকি ইতিমধ্যেই তাদের ডেরায় ধরে নিয়ে গিয়েছে। আবার ছেড়েও দিয়েছে অনেককে। রসকে কথাগুলো বলতে বলতে হাঁফিয়ে যাচ্ছিল। পিন্টু আর রুণার এসব ভয়ের কথা শুনতেও ভালো লাগছিল না। ওরা ভাবছিল জাপান কি সত্যি সত্যিই

ভারত আক্রমণ করবে। করবে নাইবা কেন? তাদের মূল শত্রু তো এক্ষেত্রে ইংরেজ। নইলে কলকাতা শহরের ওপর এত লক্ষ্য কেন? বোমা পড়ার আশঙ্কা আছে বলেই সেখানে ব্ল্যাকআউট হচ্ছে, ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে। দোকানের সামনে সামনে পাঁচিল তুলে শেল্‌টার দেওয়া হচ্ছে। তারমধ্যে এই মুহূর্তেই আরো একটা নতুন খবর এসে যায়। পিন্টু রুণার কাকা মানবেন্দ্রকে সাইকেল চালিয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকতে দেখা যায়। ওদের সামনে দেখে বলেন,

—রুণা, দাদা কি বাড়িতে আছেন?

—না। বাবা তো সেই দুপুর নাগাদ কোথায় যেন বেড়িয়েছেন। এখানো ফেরেননি।

—তাহলে কথাটা কাকে বলি। বৌদি তো এমনিতেই ঘাবড়ে যান।

—কি কথা কাকা? আমরা তো বড় হয়েছি, আমাদের বলুন না।

—কথা হচ্ছে। ঘরে যা টাকা পয়সা আছে সে সব দিয়ে কেরোসিন তেল, ডাল মশলা এবং আর যা যা দরকার যতটা সম্ভব কিনে রাখা দরকার। ধুবুলিয়ায় এরোড্রাম হচ্ছে। ওখানেও একটা সেনাছাউনী দু'একদিনের মধ্যেই হবে। সুতরাং এদিককার সব বাজার থেকে ওরা মাল কিনতে শুরু করল বলে।

—তাতে কি মাল ফুরিয়ে যাবে?

পিন্টু উদ্বেগের সঙ্গে বলে,

—তাতো যাবেই। বহু মাল কালোবাজারে চলে যাবে। কালোবাজার শব্দটা পিন্টু তার দাদাদের মুখে মাঝে মধ্যে শুনেছে। বড় বড় আড়তদারেরা যে মাল চেপে রেখে বাজারে দাম বাড়ায়, এই নিয়ে বড়দা আর অমলদার মধ্যে একদিন কথা হচ্ছিল। সেদিনই ওদের মুখ থেকে কালোবাজারি শব্দটা সে শোনে। কিন্তু কালোবাজারটা যে কোথায় সে জানেনা। এবার খোদ কাকাকে সামনে পেয়ে সে সবিনয়ে জানতে চায়,

—কাকুমণি একটা কথা বলব?

—কি কথা রে পিন্টুবাবু। ওঃ ভুল হয়ে গেছে। তুই তো বড় হয়ে গিয়েছিস বলে দাবি করছিস, তোর ভালো নামটাই বলি শ্রীপবিত্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

পিন্টু প্রায় ফিস ফিস করে বলে,

—ওই কালোবাজারটা কোথায় কাকুমণি। তার ঠিকানাটা পুলিস জানেনা।

পিন্টুর কাকা কিন্তু হাসেন না। সাইকেলটা কামিনী গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে পিন্টুর মুখের সামনে কোমর বেকিয়ে দাঁড়ান। তারপর প্রায় ফিস ফিস করে পিন্টুর মতই বলেন,

—ওর ঠিকানা আছে মানুষের মনে। মানুষের অতিরিক্ত লোভই মানুষকে কালোবাজারি শেখায়। এর কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। মালগুলো ন্যায্যদামে কিনে কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। তারপর প্রয়োজন যখন ক্রেতাদের অস্থির করে তোলে, তখন অনেক বেশিদামে তারা বাজারে মাল ছাড়ে।

এর কদিনের মধ্যেই চারদিকের পরিস্থিতি মানুষের চিন্তাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। পিন্টু এ অবস্থায় ভেবেই পাচ্ছিল না তার কি করা উচিত। দাদারা সব কোথায় কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু মেজদা অমলের খবরই জানা গেছে মল্লিকাদি মারফত। মল্লিকাদি যে খবরটি কিভাবে পেয়েছে তা জানা যায়নি। মল্লিকাদি রুণাকেও বলেনি। তার এককথা, আমি বলব না। তোমরা যা খুশি ভাবতে পার। মল্লিকাদির সেই স্নেহকোমল ভাবটাও যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। তাকে দেখলে মনে হয় কি একটা ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞায় সে যেন এতটাই অবিচল যে বড় বড় সমুদ্রের ঢেউও তার কাছে তুচ্ছ। সে শুধু এইটুকুই বলেছে, তোমরা অমলদার কথা ভেবনা। সে ভালো আছে। পুলিসের ক্ষমতা নেই তাকে খুঁজে বার করার.........।

এসবের মধ্যেই শহরে ছোট-বড় মিছিলও বেরুচ্ছে। তেরঙ্গা পতাকা, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে। পুলিসের তাড়া খেয়ে কারো ঠ্যাং ভেঙেছে, কারো মাথায় লাঠির বারি। মেদিনীপুরের ঘটনাও এখন মুখে মুখে। একটা বিশাল মিছিল তমলুক শহরের থানা দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলে পুলিস গুলি চালায়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। তার হাতে গুলি লাগলেও তিনি জাতীয় পতাকাকে উঁচুতে ধরে রেখেছিলেন, ছাড়েন নি। এরপর তার কপাল লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েও জাতীয় পতাকাকে শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, ইত্যাদি। পিন্টু কিন্তু এখনও বুঝতে পারছেনা বড় বড় নেতারা তো 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র ডাক দিয়ে জেলে গিয়ে বসে আছেন, তাদের এখন নেতৃত্বটা দেবে কে? এর উপর যুদ্ধের আশঙ্কা, ভয়, বাজারের অবস্থা, হু হু করে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া — সবের মধ্যেই একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগের ইঙ্গিত। তারমধ্যেই খবর এলো পিন্টুর পরিচিত এবং যে একসময় পাড়ার পুকুরগুলো জমা

নিয়ে মাছের ব্যবসা করত সেই রতনদা মিলিটারী কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। ষ্টেশন যাওয়ার পথে চৌধুরী বাবুদের আমবাগানে প্রচুর আনাজপাতি এবং অন্যান্য কাঁচামাল জড়ো করেছে।

তখনও ঠিক পুরোপুরি শীতকালটা আসেনি। সবে ফুলকপি, শিম, বিট, গাজর আর নতুন আলু উঠতে শুরু করেছে। আমন ধান মাঠে মাঠে পাকছে। কিন্তু পৌষের আগে কাটা হবে না। এখনই যদি ক্ষেত মালিকদের কাছ থেকে রতন সাধুখাঁ তরকারি কিনতে শুরু করে তাহলে বাজারের যে কি অবস্থা হবে সংসারি মানুষেরা জানে। কিন্তু তাদের কিছু করার নেই।

পিন্টু আর রুণা মা এবং পিসিমাদের সংগে এসব নিয়ে কথা বলল। পিসিমাদের এককথা—এব্যাপারে সাধারণ মানুষের কি করার আছে। ইংরেজ জাপানের সংগে যুদ্ধ করছে, এতেইবা তাদের কি বলার আছে। পাড়ার বেশকিছু ধর্মপ্রাণা মহিলা তাদের কাছে আসেন। রোয়াকের উপর পাটি শতরঞ্জি পাতা হয়। মাটিতে রাখার জন্য একটা ডেস্ক গোছের সামনে ধরে কখনও বড় পিসিমা, কখনও মেজ পিসিমা রামায়ন কিংবা মহাভারত পড়েন। বড় পিসিমা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপর্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বলছেন, কারণ ব্যাখ্যা করছেন, সেইসব কথা বড় পিসিমার অপূর্ব কণ্ঠস্বর, জ্ঞান এবং বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করছে, তখন পাড়ার মহিলারা কেন, পিন্টু এবং তার দিদি রুণারও হাঁ করে শোনা ছাড়া উপায় থাকে না। সেসময় মাথার উপর দিয়ে জাপানী বোমারু বিমান উড়ে গেলেও তারা বোধহয় দেখতে পেতনা। একটা বিশেষ পরিবর্তন যা পিন্টু এবং রুণার কারোরই চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না সেটা হচ্ছে তাদের বাবা এবং মা এখন মাঝে মাঝেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। এতদিন ধীরেন্দ্রনাথ যেন নিজের জগৎ নিয়েই ছিলেন। শুধু বই-পত্র বিভিন্ন বয়স্ক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, অধ্যাপক, অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী, সমাজকর্মী এইসব নিয়েই কাটাতেন। এখন যেন তার সামনে ভিন্ন একটা জীবন এসে হাজির হয়েছে। এইতো গতকালই সকালের দিকে পিন্টু তার সাদা রঙের সোয়েটারটা খুঁজে পাচ্ছিল না। চারিদিকে হাঁটকাচ্ছিল আলনায় খুঁজতে গিয়ে সব জামাকাপড় মেঝেতে ফেলে দিল। তখন রুণা বলল, মাকে একবার জিজ্ঞেস কর তো। মনে হয় ওই সোয়েটারটা মা-ই তুলে রেখেছে। তখন খুব তাড়াতাড়ি পিন্টু রান্নাঘরে এলো এবং মায়ের উনুনের পাশেই বেতের মোরায় বসা ধীরেন্দ্রনাথকে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলো। এসময় সাধারণত তিনি বাইরের ঘরে থাকেন। শ্যামকাকু আসেন। অনেকসময় জমিদারির কাগজপত্র নিয়ে চরণ ঘোষালও এসে যান। কারণ এই শহরে ঘোষাল মশাইয়ের এক আত্মীয়েরও বাড়ী। তিনি অনেকসময়ই আগেরদিন সেখানে আসেন। তাই নিতান্ত এই অসময়ে পিন্টু তার বাবাকে মায়ের সংগে কথা বলতে দেখে রীতিমত অবাক হলো। ধীরেন্দ্রনাথের গলার স্বর গম্ভীর। নীচু গলায় কথা বললেও একটা গম্‌গমে ভাব থাকে। পিন্টু যে রান্নাঘরে ঢুকেছে তারা বোধহয় প্রথমে টের পাননি। ধীরেন্দ্রনাথ তখন বোধহয় একটা কিছু বলে দ্বিতীয়বার সেটা উচ্চারণ করছিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে পুষ্পহারটার কথাই বলছি। তাছাড়া গলার চিকটাও তো থাকার কথা। পিন্টুর মা এমনিতেই চুপচাপ। মাথা তুলে বিশেষ কথা বলেন না। একবার শুধু বললেন, রুণারও বিয়ে হয় নি। তাছাড়া ছেলের বৌদের জন্যেও কি কিছুই রাখবে না। তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়ালেন এবং পিন্টুকে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই পিন্টু বলল,

—মা তুমি সাদা সোয়েটারটা কি সরিয়ে রেখেছ?

—হ্যাঁ, ওটা আমি দোতলার ছাদে রোদে দিয়েছিলাম। দালানের দেরাজটায় রুণাকে খুঁজতে বল।

কথাটা শোনার পরই পিন্টু রান্নাঘরের বাইরে চলে এলো। মা-বাবার মধ্যে যে মায়ের গয়নাগুলো নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে, এটা বুঝতে তার অসুবিধা হল না। বিশেষ করে একটা কথা প্রায় তিন/চারমাস ধরে এ বাড়িতে আলোচিত হচ্ছে। এখনও প্রায় গোপনে কিন্তু প্রসঙ্গটা ভীতিকর। পিন্টুদের এই পরিবারের পক্ষে রীতিমত বিধ্বংসী। তাই সেইসব চাপা শব্দ আর ঠিক চাপা অবস্থায় নেই। ধীরেন্দ্রনাথের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। মানবেন্দ্রও মাঝে মাঝে এসে তার দাদার কাছে বসছেন, কিন্তু চারিদিকের চোখ বাঁচিয়ে। পিন্টু, রুণা জানে তাদের কাকিমা তার ভাইয়ের পরামর্শে হয়তো বিশেষ কোনো প্রস্তাব আনতে যাচ্ছেন।

এ অবস্থায় ধীরেন্দ্র, মানবেন্দ্র এবং শ্যামকাকু তিনজনে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন এবার পৌষেই 'পুন্নাহ' অনুষ্ঠানের সময় তারা অন্তত সাত/আটদিন গ্রামেই কাটাবেন। উদ্দেশ্য কিছু বেশি পরিমাণে খাজনা আদায়। তাদের ঘাড়ে যে সুদের বোঝা, কথাটা এখন প্রকাশ্যেই এসে গেছে। চৈত্রের শেষে সরকারের পাওনা মেটাতে হবে। কিন্তু তারাও কানাঘুষো শুনছেন সুনির্মল এবং তার দলবল ওই রাঢ় অঞ্চলের

বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে আছে। ওরা নানাভাবে বাধা দেবে। কিন্তু বাধাটা ঠিক কিভাবে আসবে তখনও অজানা।

সেটা ইংরাজী মাসের শেষ সপ্তাহ। পিন্টুর বাবার কলেজ থেকে পাওয়া মাইনেটা মনে হয় ফুরিয়ে এসেছিল। ইতিপূর্বে সেকথা কারো মনেই থাকতো না। জমিদারীর অফুরন্ত আয় সবদিক যেন কানায় কানায় পূর্ণ করে রাখত। আর্থিক টানাটানি যে কি জিনিষ এবাড়ির মানুষগুলো তেমন বোঝেনি এতকাল। পিন্টু, রুণা এবং তাদের দাদারা ইতিপূর্বে অনেকবারই দেখেছে সামান্য দু'চারটাকাও তাদের প্রতিবেশীরা বা শহরের অনেকেই কত সাবধানে খরচ করে। চোখের সামনে খুব একটা বড় প্রয়োজন এসে হাজির হলে ক্লাবের ছেলেমেয়েরাও বলে 'আগে মাকে বলি, আগে বাবাকে বলি তবে কথা দেব।' যেমন পিন্টুদের কিশলয় সংঘ ক্লাবে প্রতিবছর সরস্বতী পূজো হয়। শহরের অন্যান্য ক্লাবে পূজোর আড়ম্বর যতটা জমকালো হয়, কিশলয় সংঘে তা হয়না। পূজোমণ্ডপ বলতে পিন্টুর বাবার বৈঠকখানার সামনের বারান্দা। তার সামনের রোয়াকটা কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়। একবার ক্লাবের অনেকেই চাইছিল এবার পুরো মাঠটাই ঘেরা হোক। ঠাকুর কেন বারান্দায় বসানো হবে? তারজন্যে একটা সাজানো মণ্ডপই বা হবে না কেন? আমরা সকলেই তো চাঁদা দিই। রুণা বলল,

—ঐ সামান্য চারআনা আটআনা চাঁদায় কিন্তু তাহলে হবে না। অন্তত দুটাকা করে দিতে হবে।

শুনে সকলেই চুপ। একেবারে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। পিন্টু হেসে বলেছিল,

—কিরে, দুটো করে টাকাও দিতে পারবি না? কি হবে অত টাকা জমিয়ে?

এবারও সকলেই চুপ। ঘটনাটা ঘটছিল তাদের ক্লাবঘরেরই মধ্যে। ঘরের আসবাবপত্র একপাশে সরিয়ে সকলের বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। এটা ছিল একটা আলোচনাসভা। সরস্বতী পূজোয় কার কি করার ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা, সখ সবই যেন ঠিকমতো আলোচিত হয়—এই ছিল রুণা, পিন্টু এবং বিনয়দারও উদ্দেশ্য। এখানে শুধু হিন্দুরাই নয়, তাদের মুসলিম সভ্যরাও যোগ দিয়েছে। আনন্দ করেছে। কিন্তু সেদিনের সভাটা কেমন যেন অন্যমাত্রায় চলে গিয়েছিল। পিন্টু সরল মনেই বলেছিল, "কিরে দুটো করে টাকাও দিতে পারবিনা? প্রশ্নটা অনেকেরই আত্মসম্মানে লাগল। আসলে তাদের আর্থিক অবস্থা যে ভাল নয়। এদিকেই হয়ত পিন্টু আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। মণীন্দ্র আর সুজন রীতিমত ফোঁস করে উঠে। ওদের কৈশোরোত্তীর্ণ মুখ দুটিতে যেন আগুনের আঁচ। ওরা প্রথমে উঠে দাঁড়ায়, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুজনই প্রথমে বলে,

—পিন্টুদা, তুমি কি বলতে চাও বলতো। আমরা গরিব আর তোমরা বড়লোক। এটাই কি তুমি বলতে চাইছ।

মণীন্দ্র তারমধ্যে একটা ব্যঙ্গের খোঁচা জুড়ে দেয়,

— আমাদের কিন্তু জমিদারী নেই পিন্টুদা। বাবা স্কুল মাষ্টার। তাকে কি কতদিকে হিসেব করে চলতে হয় এটা আমরা জানি।

পিন্টু এবার উঠে দাঁড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি করেছিল যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। অন্য সকলে তো বটেই, রুণা, বিনয়দা সকলেই অবাক হয়ে যান। সে দুহাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে বলে,

—আমি বুঝতে পারিনি রে, বুঝতে পারিনি। কথাটা যে তোদের কোথায় গিয়ে লেগেছে, এখন বুঝতে পারছি। আমাকে ক্ষমা কর ভাই, আমাকে ক্ষমা কর। তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। চোখের দু'কোণ বেয়ে জলও পড়ে। সুজন আর মণীন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল।

সংসারের একটা সম্পন্ন অবস্থা বাড়ির আর সকলকে যে প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে দেয়নি এটা এখন স্পষ্ট। কিন্তু এই সম্পন্ন অবস্থাটা কিছু গোঁজামিলের উপর যে দাঁড়িয়েছিল এটা বুঝতেও অসুবিধা হয়না। অথচ তাদের সবই ছিল। বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা, পূর্বপুরুষেরা রাণীগঞ্জের দিকে কোলিয়ারী, সিংভূম জেলায় অভ্রের খনি পর্যন্ত কিনেছিলেন। কিন্তু বহরমপুরের এই চ্যাটার্জী পরিবারের পরবর্তী পুরুষেরা সেসব ধরে রাখতে পারেননি। তারা অধিকাংশই ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, অতিরিক্ত আলস্য এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অদম্য ঝোঁক যা সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়েছিল। তারা কর্মচারীদের বিশ্বাস করতেন। একটু বেশি মাত্রায়ই বিশ্বাস করতেন। ফলে যা হবার সেটাই হয়েছিল। পিন্টু এবং রুণা কিন্তু এই কথাটা ঠিকই জানে, তাদের বাবা ধীরেন্দ্র আর যাই হোক অযোগ্য নন। ক্ষমতা তার যথেষ্ট। প্রচুর খাটতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত জমিদারের মত খুব বেশি নিষ্ঠুর-নির্মম হতে পারেন না।

বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের লোক বিরাজদাকে ইতিমধ্যেই বেলুন গ্রামে পাঠানো হয়েছিল। সে বেলুন গ্রামেরই লোক। তার দুই ছেলে, নাতি, ভাই, ভাইপোরা সবই ঐ গ্রামে এবং গ্রামের চারপাশে চাষ আবাদ করে। তারাও যে ঠিক ঠিক

জমিদারের খাজনা দেয় না, এটাও বিরাজ মণ্ডল জানে। তাকে যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামে পাঠানো হচ্ছে, এটা সে জানতো। শুধু তাই নয়, গ্রামের লোকেরা যে জমিদার বাবুদের আজকাল কি চোখে দেখছে এটাও তার অজানা নয়। কিন্তু তাকে যেতে হয়েছিল। যে বাবুরা এতকাল তাকে দেখেছে, শুধু তাকেইবা কেন, তার গোটা পরিবারটাকেই দেখেছে, সেই বাবুদের বিপদে যদি কিছু করা যায়, এই ছিল তার গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্য।

কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই সে মুখ শুকনো করে ঘুরে এলো। মা শ্যামলতা বললেন,

—কি গো বিরাজ, তোমার ছেলেরা, ভাইরা সব কি বলল ?

বিরাজ চুপ। তার মুখের অবস্থাটাই এখন অন্যরকম। তিন/চার দিন দাড়ি কাটেনি। দাড়ির জঙ্গল। চোখ দুটো কোটরগত। মাথার চুল এতটাই রুক্ষ যেন বাবুইবাসা। সে মুখে কিছু দিচ্ছেনা। রোয়াকের এককোণে উঁবু হয়ে বসে আছে। একদিনে তার শরীরটাও বেশ ভেঙেছে। বয়স তার সত্তরের বেশিই হবে। কিন্তু কোনদিন তার হাড়কণ্ঠা দেখা যেতনা। এখন কণ্ঠার হাড় উঁচিয়ে আছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে বিরাজের। আপন মনেই গজরাচ্ছে—বেইমান, বেইমান, বাবুগো উরা মনুষ্যি লয়।

বিরাজের নানা কথার মধ্যথেকে শুধু একটা কথা বেরিয়ে এল—এখন জমিদার বাবুদের গ্রামে না গেলেই ভালো। এবারেও পৌষের ফসল ভালো হয় নি। অতবড় ভাঙন না হলেও দ্বারকা নদীর বাঁধ এবারেও ভেঙেছিল। বিলের জমিগুলো এখনও জলের তলায়। পরছিঁদা জমি থেকে ওরা কিছু ফসল তুলেছে ঠিকই তবে তেমন কিছু নয়। ওরা এবার বেশিকিছু খাজনা দিতে পারবে না।

সব শুনে শ্যামকাকা এবার লাফিয়ে উঠলেন। খাজনা এবার দিতেই হবে। 'পারুম না বাবু'। আমরা অনেক শুনেছি। আর নয়। জমিদার যদি যেতে নাই পারেন আমি যাব। ওরা মিথ্যা কথা বলছে। আমি জানি জমিদারকে তার প্রাপ্য টাকা না দিয়ে কে কে সুদে টাকা খাটায়। ওদের গোলাগুলো তো আমরা নেড়ে ঘেটে দেখিনা। অভাবী সময়ে ওরা অনেক বেশিদামে চাল বেচে গরিবদের।

কথাগুলো রুণা, পিন্টু, ধীরেন্দ্রনাথ সকলেই কান পেতে শুনে। ঘটনাটা ঘটছিল ধীরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানার ঘরে। তখন সকাল ফুরিয়ে দুপুর এসে যাচ্ছে। আজ স্নান-খাওয়ার কথাও যেন কারও মনে নেই। চৈত্রমাসের মধ্যেই সরকারের প্রাপ্য মেটাতে হবে। কোথায় টাকা, কোথায় টাকা। একটা নিঃশব্দ চিৎকার। সকলের গহন আলোড়ন থেকে উঠে আসছে। ঠিক এই সময় দেখা গেল বেশ ক'জন গ্রামীণ মানুষ যেন কি একটা বলার জন্যে হাঁক পাঁক করতে করতে ছুটে এসেছে। এরা প্রায় সকলেই ভাগচাষী। নিজস্ব কোনো জমি নেই, কিন্তু চোখেমুখে এমন ভাব ফুটে উঠছে যেন ইচ্ছে করলেই তারা অনেক কিছু করতে পারে। তারা বলছে, চলুন বাবু। আমরা জানি কে কোথায় টাকা লুকিয়ে রাখে ? আপনারা চলুন, আমরা সঙ্গে আছি।

এর দু'দিনের মধ্যেই খবর এলো সুনির্মল, অরুণ এবং তাদের বেশ কয়েকজন সঙ্গী ধরা পড়েছে। তারা এখন বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের লকআপে। তারা রাজবন্দী হিসেবে গণ্য হচ্ছে কিনা সে খবর তখন পর্যন্ত কারো জানা নেই।

(ক্রমশ)

ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষা করতে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করুন

'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র এক বছরের মহিলা কবিদের কবিতা

অশোক অধিকারী

কবিতা আলোচনায় 'পক্ষ' অবলম্বন একপ্রকার পক্ষপাতিত্ব। লিঙ্গভেদে কবিতা — কবিতাই। তার পক্ষে কথা বলাই শ্রেয় ও সুখকর। কবিতা রচনায় স্থান দখল যেমন প্রাতিষ্ঠানিক, তেমনই কবিতা রচনায় 'আমি পক্ষ' বা 'সে পক্ষ' বিবেচনা করে তার বিশ্লেষণ অনেকাংশে 'পত্রপাঠ বিদায়ের' পর্যায়ে পড়ে যায়। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সময়নিষ্ঠার সাথে হাত খুলে লেখার যেমন পরামর্শ দিয়ে আসছে, ঠিক তেমনই সাম্প্রতিক ভাবনা ও সঙ্কটের স্বরূপ হাত ফাঁক করে দেখিয়ে দেবার আবদার ও দাবী করে আসছে লেখক/লেখিকাদের কাছে। যে কথা বলছিলাম, কবিতা তা সে পুরুষ কবি বা মহিলা কবি যেই লিখুন না কেন, তা একশো শতাংশ কবিতাই। তবুও নিবন্ধের নামকরণে কেউ আপাত স্ববিরোধের কোনো মেদহীন গন্ধ খুঁজে পেলে আমি তাকে 'সুপবন' ভেবেই মাথা পেতে নেব। শিক্ষা ও সাহিত্যের মহিলা কবিদের সংখ্যা প্রতি বছরই সমান্তর প্রগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। সেটা গুণোত্তর প্রগতিতে কবে বাড়বে সে অপেক্ষায় আমরা সবাই। শিক্ষা ও সাহিত্যের মহিলা কবিরা শুধু কবিতায় কলম ধরেন না। তাঁরা সংগঠনও করেন। সংগঠন করার সঙ্গে সঙ্গে কলম ধরার যে এক বিপরীত সম্পর্ক তা তাঁরা ভালো করেই জানেন। তবুও লেখেন। এই ইচ্ছাকে কবিদের অনিবার্য তাগিদ বলে ভাবতেই আমি পছন্দ করি। সেই তাগিদ যত দীর্ঘমেয়াদী হবে, ততই ঋদ্ধ হবে শিক্ষা ও সাহিত্যের পাতা। গত এক বছরে খুব বেশিজন যে কবিতা দিয়ে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে ছুঁয়েছেন তা নয়। তবুও যাঁরা সময় বার করে লিখেছেন, আমাদের ভাবিয়েছেন, মনস্ক করার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁদের কবিতা দিয়েই এবারের আলোচনা। 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র যেসব কর্মশালাগুলি সারা রাজ্যজুড়ে চলছে, সেখানেও একটা আশার ঝলক লক্ষ্য করে আনন্দিত হওয়া যাচ্ছে। কর্মশালাতে তাৎক্ষণিকভাবে যাঁরা তাঁদের সম্পদ তুলে দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই মহিলা কবি। এবং শিক্ষকতায় নূতন। চিন্তা-ভাবনায় স্বীকৃত। পড়াশোনায় সমৃদ্ধ। তাই সেদিক দিয়ে আগামী আমাদের অনেক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবে না। লেখাকে যদি 'শ্রমে'র সংজ্ঞার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যদি 'শ্রম', সম্পদের অলঙ্কারে সালঙ্কারা হয়, তবে অবশ্যই সমাজসুগত। এই লেখ্য সম্পদ আগামীর সঞ্চয়। আগামীর নিপীড়ন থেকে মুক্তির আপ্তসমৃদ্ধ সঞ্চালন। অবশ্যই জরুরী অঙ্গ সঞ্চালনের বিশেষণ। সমাজ পরিচর্যার ইঙ্গিত।

'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র এক বছরে ১১ জন মহিলা কবি তাঁদের কলম ব্যবহার করেছেন কবিতার জন্যে। নূতন ও পুরনোর মেলবন্ধনে আশ্চর্য অনুভবের আকাশ ধরা পড়েছে তাঁদের কবিতায়। প্রথমেই উত্তর ২৪ পরগণার কবি নীলিমা মণ্ডলের কবিতার প্রসঙ্গে আসি। এক বছরে মোট ৩টি কবিতা তাঁর প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যের পাতায়। 'ছুট', 'তোলো আওয়াজ' ও 'একটি কবিতা চাই'। নীলিমা মণ্ডলের কবিতার সঙ্গে যুক্ত তাঁর সুস্থ বেঁচে থাকার পক্ষে যাবতীয় শব্দাবলী। সমাজ উৎপীড়নে পীড়িত মানুষ যখন হিংসার শিকার হয়, যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধহীন পৃথিবীর জন্যে। তখনই কেঁপে ওঠে কবির কলম। সব ক'টি নির্ভীক শব্দাবলী তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তিনি লেখেন — 'সব ছিঁড়ে/জাগে মুক্তি/জাগে উল্লাস' (ছুট)। কিংবা 'মানবতা ভুলুণ্ঠিত/জেগে ওঠার কবিতা চাই' (একটি কবিতা চাই)। তাঁর 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' — তোলো আওয়াজ/ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দাও আজ' (তোলো আওয়াজ) স্লোগানের মতো মনে হয়। কবির শব্দ ব্যবহার, কিংবা প্রতিবাদের ভাষাচয়ন যথার্থই মুষ্ঠিবদ্ধ করার আবেগ এনে দেয়। তবুও এ ধরনের কবিতার যে বিপদ তার

থেকে তিনিও মুক্ত নন। প্রতিটি লাইনেই 'বিজয় দম্ভ ঘোষণা' এক ধরনের প্রতিশোধ আর প্রতিরোধেই যেন দানা বেঁধে যায়। সত্যিই তো — 'দেয় ডাক/পড়ে থাক্/ছুটে চল্/ মাঠ প্রান্তর (ছুট্)। এখানে কিছুটা বাইরের বাতাস যেন কবির কলমে খেলা করে। যেখানে 'ঝড়ো হাওয়া' কিংবা 'মেঘ বলাকা'র 'পাখার বাতাস' কবির অনুভবে যেন প্রকৃতিলালিত একটু ঘুম আনে। বুঝিবা জীবনের সেই সারসত্যে সকলের সঙ্গে কবিও রাত জাগেন। শব্দ সাজিয়ে প্রতিবাদ তাই যেমন শক্ত, বন্ধ দুয়ার খুলে ছুটে যাওয়া আরো কঠিন। কবির প্রতিবাদ দৃঢ় হোক। আমাদের ভাবনায় মূর্ত হোক।

দীপালি সেনশর্মার এক বছরের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা ২। তিনি হাওড়ার কবি। তাঁর কবিতা দু'টির একটি 'বিদ্রোহিনী', অপরটি 'তোমাকেই খুঁজি'। 'বিদ্রোহিনী' আদ্যোপান্ত একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা। অন্তমিল শব্দের প্রাসঙ্গিকতায় চার চার স্তবকে ভাবনার সমতল প্রকাশ ক্রমাগত বিদ্রোহকেই উস্কে দেয়। আমাদের সামাজিক ব্যাধির সেই চিরকালীন ও নিত্যসূত্রে 'কনে দেখা আলো'য় যে কান্না লুকিয়ে থাকে। তারই প্রতিবাদী চোখের জল 'আমি সেই মেয়ে' বলে জেহাদ ঘোষণা করে। কবি লেখেন — 'কি জানি কেমন করে সেই ভীরু মেয়ে/ জেহাদের ভাষা লিখে প্রতিবাদ করে/অগ্নিঝরা চোখ মেলে দেখে চেয়ে চেয়ে/চুপ কথা, শান্তভাব মাথা কুটে মরে' (বিদ্রোহিনী)। কিন্তু এই স্তবকের শেষ লাইন নিয়ে আমাদের আপত্তি থেকেই যায়। তার অগ্নিঝরা চোখে কেন কবি 'চুপ কথা' কিংবা 'শান্তভাব' দিয়ে তাকে 'মাথা কুটে' মরতে দিলেন বোঝা গেল না। তবুও দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে 'স্নিগ্ধ চোখের' চাউনি যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালায় সেই স্বতঃসিদ্ধে পৌঁছাতে কবির এক মিনিট সময়ও লাগে না। তাঁর অপর কবিতা 'তোমাকেই খুঁজি' প্রবাদপ্রতিম অনিলা দেবীকে নিয়ে। কবি যখন লেখেন 'শিক্ষার আলোকদ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়/ গভীর প্রত্যয় নিয়ে করেছিল জয়' (তোমাকেই খুঁজি)। যথার্থ প্রত্যয় নিয়েই সেই উত্তাল দিনগুলিকে স্পর্শ করে যথার্থ শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন বলেই তিনি অনিলা দেবী। 'হঠাৎ নিথর হোল তেজদীপ্ত কায়া' — এ এক আশ্চর্য পরিণাম। তবুও তেজদীপ্ত কায়ার সঙ্গে তাঁর তেজদীপ্ত কণ্ঠ মিলিয়ে যায়নি। যেতে পারে না। যে কণ্ঠ চিনিয়েছিল সংগ্রামের পথ। কবির এই 'খোঁজা' শাশ্বত। সত্যসন্ধানে দিকনির্দেশী কম্পাস।

'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র পরিচিত কবি ফিরোজা বেগম। তাঁর নামের আগের সংযুক্ত পালক (ডঃ) বেমানান মনে হয় (কবিরা ক্ষমা করেন জানি)। ফিরোজা বর্ধমানের কবি। তাঁর 'চর্যাপদের হরিণী' ও 'কাফনের ভিতর এক অন্য সময়' দু'টি কবিতাই দীর্ঘ লাইনের টানা কবিতা। তাঁর হাত দিয়ে এ ধরনের দীর্ঘ কবিতা দেখতে আমরা অভ্যস্ত। 'চর্যাপদের হরিণী' কবির কথাতেই 'গুজরাত নিধনের তীব্র প্রতিবাদে ১৫ই জুলাই, ২০০২-কে সামনে রেখে রচিত'। ইতিহাস জানিয়ে দিয়েছে আমাদের 'গুজরাত' কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রাথমিক ব্যবহারিক পরীক্ষা যথারীতি সিক্ত ও শুষ্ক পরীক্ষা। যার ফল দিয়ে তারা সারা ভারতে এই পরীক্ষা চালানোর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাই কবি ফিরোজা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন এভাবে — 'আগুন বাতাসে রাজনীতির ছিনালী কপটতা ঘিরে'। এ যেন তাঁর 'আগুননদী পার হওয়া'র শব্দ চাবুক। আমাদের 'আট পৌরে দুঃখ'কে সরিয়ে 'রক্তকরবীর আভাস' এনে দেয়। তাই চর্যাপদের হরিণীরা থেকেই যায়। শুধু মাটি বদলে যায়। আক্রমণের ভাষা পাল্টে যায়। সাহিবা, সেলিম আর শাকিল'দের নালিকাটা বক্ষপাঁজরের ওপরই ঘৃণার ফুল ফোটে। ফিরোজা এ কবিতায় গুজরাতের ক্ষতস্থান চিনিয়ে দিয়েছেন আমাদের। শব্দ প্রক্ষেপণ এ কবিতার ক্ষেত্রে মানিয়ে যায়। 'কাফনের ভিতর এক অন্য সময়' কবিতার মধ্যদিয়ে কবি ফিরোজা 'আবর্তিত এ জীবনের সুদীর্ঘ সময়' পেরিয়ে — 'পরমাত্মা হতে হতে মানুষ' 'হওয়ার" কথা শুনিয়েছেন। তবুও কেন 'ভেঙে যায় এ নষ্ট হৃদয়', কেন ভাঙে, সেও কি 'জেগে থাকা এক মানুষে'র জন্যে। ঐতিহাসিক সত্যে 'ধর্ম-মোক্ষ-কাম' সহ সব কিছু শাশ্বত জেনেই 'চরৈবেতির' কাব্যরচনা আজ বেশি প্রাসঙ্গিক। 'সময় আপন হয়ে' উঠলেই মানুষ কথা বলে। এ কবিতাও আমাদের ভাবায়।

বর্ধমানের কবি সুজাতা সান্যাল চট্টোপাধ্যায়-এর দু'টি কবিতা গত এক বছরে প্রকাশ পেয়েছে। 'রক্তের নদী টাইগ্রীস' ও 'সুখে বাঁচার দেনা'। প্রথমেই 'সুখে বাঁচার দেনা' কবিতায় আসা যাক্। কবিতাটি ছন্দসমৃদ্ধ। অবশ্যই বৃহত্তর ভাবনায় উদ্বেলিত। তিনি যখন লেখেন — 'কোলের ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে/দেয় আগুন কে/কে হেঁকে যায় লোকটা আছে/ ত্রিশূল বিঁধে দে'। তখন আর বুঝতে সামান্যতম দেরিও আমাদের হয় না — কোন্ বিশেষ প্রেক্ষিত এ কবিতার বিষয়। তবুও এ কবিতা কবির স্বাভাবিক আবেগের শিকার।

'সুখে বাঁচার দেনা' সত্যিই কোনোদিন শোধ করা যায় না। কিন্তু সেখানে যদি জীবনের ঋণাত্মক অনুভূতি শুধু হত্যার আর হত্যালিপির কদর করে তখন প্রতিবাদ আর প্রতিষ্ঠা দিয়েই তার মোকাবিলা করতে হয়। এ কবিতায় প্রতিবাদ যেন 'দিশেহারা' বিভ্রমকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। আরো কঠিন আগুনে দগ্ধ করার ভাষা আজ জরুরী। 'রক্তের নদী টাইগ্রীস' কবিতায় হাত শক্ত করার বেশ কয়েকটি লাইন রয়েছে। 'বিশ্বের মানুষ আজ হাতে হাত ধরো' প্রাসঙ্গিক এক জরুরী বার্তা। কবির কথাতেই সায় দিয়ে এবং অবশ্যই প্রতিজ্ঞা প্রস্তুতির শপথ করে আমরাও জানাই — 'মরীয়ার নেই মরণের ভয়/যে করেই হোক করবোই জয়'।

উত্তর ২৪ পরগণার কবি নীলিমা সমাদ্দারের একটিমাত্র কবিতা 'এই একুশের ভোরে' গত এক বছরে প্রকাশিত হয়েছে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনকে মনে নিয়ে এবং বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগকে মেনে নিয়ে ভারী সুন্দর ছন্দের চয়নশৈলীতে কবি সমাদ্দার তাঁর লেখনীকে তৃপ্ত করেছেন। 'প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল ঢাকার পথ। মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা এই আমাদের মত/ তীক্ষ্ণকণ্ঠে এই ঘোষণায় সকলেই সোচ্চার/ঘাতক বন্দুক গর্জে ওঠে দুর্দম দুর্বার'। আজ আর শুধু ঢাকা নয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবসের অধিকার ছিনিয়ে এনেছে বরকত, রফিক আর সালামের মৃত্যু। আসামের শিলচর কিংবা ঢাকার রমনা প্রান্তর সর্বত্রই একই শপথ, একই ভাষার আবেগ — 'ওদের সেই হাহাকার আজও স্মরণ করে/পথের মাঝে রক্তগোলাপ সাজায় থরে থরে'। পরিশীলিত ভাবনার, সহজ ভাষা আর শব্দচয়নের মুন্সীয়ানায় সমুজ্জ্বল এমন কবিতা আরো উঠে আসুক কবির কলমে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের কবি মিঠু জানার লেখা আমাদের নজরে আসে কম। তাঁর একটিমাত্র কবিতা 'বে-পরোয়া' এক বছরে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সোজা-সাপ্টা বলতেই অভ্যস্ত লেখা পড়ে বোঝা গেল। সরাসরি বলেই বাঁচেন — 'ভাঙো/নিয়ম কারা/সব ঘুণ ধরা/ভাঙো'। তাঁর কাছে 'শাসন, শোষণ, তোষণ, অনুশাসন' সব কিছুকেই ভাঙতে পারলে, বদলাতে পারলে আমরাও আনন্দিত হই। খুব সুন্দর অনুভব তাঁর। 'জাগো/ফাগুনে আগুনে/রক্তিম মননে/জাগো'। ছোট ছোট শব্দের গভীর ব্যঞ্জনায় অফুরাণ তাঁর সৃষ্টিকৌশল। তাঁর কথাতে তাই আবারও বলি — 'রাখো/হাতে হাত/চোখে চোখ/রাখো'। তিনি আরো লিখুন।

উপাসনা নদী তাঁর একটিমাত্র কবিতা 'শুধু ছবি নয়' দিয়ে সারা বছরের দায় সেরেছেন। শিক্ষা অঙ্গন যাঁকে না পেলে তৃপ্ত ও ঋদ্ধ হতো না, সেই সংগ্রামী জীবন অনিলাদির স্মরণে লেখা এ কবিতা। এই ধরনের স্মৃতি ধরে রাখা কবিতায় যে ধরনের নস্ট্যালজিয়া লেগে থাকে তার থেকে তিনি মুক্ত। এ তো শুধু স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়। কঠিন সংগ্রামে সিদ্ধ এ জীবনের শব্দচয়ন এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'তুমি শুধু ছবি নও, নিত্য আছ আমাদের বোধে/সত্তায়, যেন আজও কথা কও হৃদয় গভীরে'।

মালদহের কবি শিপ্রা বসাক ভৌমিক কম লেখেন। তাঁর কবিতা 'পথ চলা' একপ্রকার ব্যক্তিগত অনুশাসনে ন্যুব্জ। জীবনের 'সুচিস্মিত দিনে' একপ্রকার 'সাবধানী সংগ্রাম'। কিন্তু সংগ্রাম কিভাবে সাবধানী হয় তার ইঙ্গিত নেই কবিতায়। 'ট্রান্স বৈকালিকায়' স্নান সেরে যারা জীবনের উচ্ছ্বাসে হারিয়ে যেতে চায়, তাদের জীবনেও নামে শরবিদ্ধ যন্ত্রণার ফোঁটা রক্ত। তবুও তারা চলে। অব্যাহত গতিতে। কবির কথায় — 'ট্রান্স বৈকালিকার জমাট বরফে/তবু পথ চলে বারবার'। অপর কবিতা 'কালপুরুষ চিনতে ভয় পেতাম' পূর্ব কবিতার বিপরীত ভাবনায় সম্মিলিত উচ্চারণ। এ কবিতায় কবি ভৌমিক অনেকটাই প্রকাশিত। আবেগ ব্যবহার কম। পায়ের কাছের হিংস্র অথচ অনুগত কুকুরের জন্য এখন তাঁর স্পর্শ কম। তাই দিনে দিনে যথার্থ অনুবীক্ষণ কায়দায় তিনি আকাশ লক্ষ্য করতে ভালবাসেন। তিনি দেখলেন — 'একদিন মেঘের উপর মেঘ জমল/সর্পিল রাত থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে/বেরিয়ে এল নৃসিংহ দাঁত/আকাশও টুক্‌রো টুক্‌রো'......। কিন্তু একদিন — 'দিগন্তবিস্তৃত আকাশ ছিল আমাদের/ডালের কুয়াশা স্বপ্ন/নক্ষত্রখচিত এক সন্ধ্যায়/আমি ছিলাম ওর বকুল সই'। অতীত যাপনের সঙ্গে বর্তমান কষ্টের সার্থক 'এলিজি' তাঁর এ কবিতা।

হাওড়ার কবি কোয়েলী বসু'র লেখা ইতিউতি নজরে আসেনি। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' একটিমাত্র কবিতা 'চাঁদ তুমি' গত এক বছরে প্রকাশ পেয়েছে। ছোট্ট অবয়বের কবিতা। প্রাণান্তকর ক্লান্তি নেই এ কবিতায়। সুকান্তের সেই কষ্টকল্পিত কবিতার লাইন 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' তার সঙ্গে সর্বতো সাযুজ্য না থাকলেও কবি কোয়েলী প্রথম লাইনেই লিখেছেন — 'চাঁদ তুমি ঘুমাতে পারো'। কারণ বিশ্লেষণে তিনি লেখেন — 'পৃথিবীর অসুখ যে একটাই/খিদের আগুন শুধু জ্বলছে'। এ কবিতার শেষ দু'টি লাইন কবির কাছে

এবং অবশ্যই আমার কাছেও শ্রেষ্ঠ লাইনের অন্যতম। 'উপবাসী যুযুধান্ স্বাগতম/নবান্নে ভরে যাক প্রতিঘর'। ছন্দের হাত আছে তাঁর। আরো লিখুন।

মঞ্জুলিকা ঘোষের একটি কবিতা 'ইজরায়েলী বুলডোজারে নিহত মার্কিন কন্যা র‍্যাচেল কোরী স্মরণে' প্রকাশিত হয়েছে গত এক বছরে। র‍্যাচেল কোরীর মৃত্যু শুধু মৃত্যুর শোকগাঁথা নয়। কবির হাতে এক প্রতিবাদী কনভয়। যা 'মানবতার লাঞ্ছনার চক্রান্ত ব্যর্থ করার প্রয়াসে' এক মৃতার অযুত বৎসর বেঁচে থাকার 'এপিটাফ'। কবি লিখেছেন — 'র‍্যাচেল, তুমি ঘুমিয়ে থাক শুভ্র রজনীগন্ধার পাপড়ি বিছিয়ে/যে নগ্ন ঘৃণ্য বর্বরতা কুৎসিত বীভৎসা তোমার প্রাণটুকু নিল ছিনিয়ে/তার প্রতিবাদে প্রতিরোধে সকলে আমরা এগিয়ে'। কবিতায় ভাবনার খোরাক কম হলেও সময়ের দাবী স্বীকার করে নিয়ে কবি দায়বদ্ধ।

হাওড়ার কবি সেবা চক্রবর্তীর লেখা আমরা কম পড়ার সুযোগ পাই। কিন্তু যখন কলম ধরেন তা হয়ে ওঠে অনবদ্য ভাবনার প্রতিপ্রভা। গত এক বছরে একটিমাত্র কবিতাই আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত 'পঁচিশে বৈশাখ'। এ কবিতার প্রায় প্রতিটি লাইনই মনে আঁক কাটে। যেমন — 'আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছি অনেক/রবীন্দ্রকাব্য আবৃত্তি করে মুগ্ধ হয়েছি/ মোহিত করেছি অসংখ্য মানুষকে/ কিন্তু জনমনে দিতে পারিনি রবীন্দ্র শিক্ষা'। এ এক অভ্রান্ত সত্যকথন। রবীন্দ্রনাথ যেমন আটকে থাকেন কাঁচের আলমারিতে। তেমনই আমাদের শৌখিনতার শিকার রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন — 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলেনা, করে শুধু মিছে কোলাহল'। এ কবির অন্তর্গত ভবিষ্যবাণী। যা আজ শাশ্বত হয়ে আমাদের বুকে বেঁধে। সেবা চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় এত কথা বলার অবকাশ আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। ভাবিয়ে ছেড়েছেন। তাঁর আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ না প্রকাশিত হবার — 'তাই আজও ভাঙে বাবরি মসজিদ, জ্বলে গুজরাট/ধর্মান্ধতার আর বিচ্ছিন্নতার বলি হয় অসংখ্য মানুষ'।

পরিশেষে একটা অত্যন্ত সত্য কথা সহজ সুরে বলি। এক বছরে এগারো নয়। অসংখ্য এগারো কবিতা শিক্ষা ও সাহিত্যের দপ্তরে আসে। আমি নিজে যেহেতু কবিদের সৃষ্টিতে কলম চালানোর পক্ষে কথা বলতে অভ্যস্ত নই। তাই অজস্র কবিতা খুঁজতে খুঁজতে এই এগারোর ধাক্কা সামলে উঠতে অনেক বড়, বৃষ্টি পোয়াতে হয়। তবুও আরো কবিতা আসুক। আরো সমৃদ্ধ ভাবনা আসুক। শুধু 'কৈবল্য' শিকারী নয়। যথার্থ সময় উপলব্ধির কলম ভাষার আঙরায় তাত্ পাক্। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' তাই চায়। আমরা যে দেশে থাকি সেখানে সমালোচক বেশি। সকলেই সমালোচক নয়, কেউ কেউ সমালোচক(!)। আমি সেই আল ধরে এতটুকুও হাঁটতে কোনোদিন সাহস পাইনি। কবিতাগুলি সম্পর্কে যা বলেছি তা আমার কবিতগুলি বারবার পড়তে পড়তে যা মনে হয়েছে একরকম তাই। এ ব্যাপারে কবিরাই শেষ কথা। শিক্ষকতায় যুক্ত অনেক মহিলা কবি অনেক অনেক লিখুন। তাই দিয়ে এবারে শেষের বাঁশি।

- শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী।
- শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।
- শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রতিবেদন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে

- কেন্দ্রীয় সরকাররের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে
- রাজ্যের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনার বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে
- শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধে
- শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ বরাদ্দ করার দাবীতে
- রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত অর্জিত অধিকার রক্ষা
- রাজ্য সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের দাবীতে

এবং

- সুপ্রীম কোর্টের ধর্মঘট বিরোধী রায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২৪শে ফেব্রুয়ারী '০৪-এর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে

কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ডেপুটেশন

স্থান ঃ রাণী রাসমণি রোড, কলকাতা

তারিখ ঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

সময় ঃ বেলা ২টা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার রাণী রাসমণি রোডে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের এক বৃহৎ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে এবং উপরিউক্ত প্রধান দাবী ও অন্যান্য দাবীগুলি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি গভীরভাবেই উপলব্ধি করে যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য সব রাজ্যগুলির ওপর আর্থিক বঞ্চনার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে যে আর্থিক সংকটের আবর্তে জনজীবন বিপর্যস্ত তার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনের যে তালিকা আছে তাতে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, সড়ক প্রভৃতি জনজীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মূল দায়িত্ব অর্পণ করা আছে রাজ্য সরকারগুলির ওপর। অথচ এই দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করার সুযোগ রাজ্য সরকারগুলির যা আছে তা তুলনামূলকভাবে অতি সংকীর্ণ। ২০০৩-২০০৪-এ একা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায় হল ২,৫৩,৯০০ কোটি টাকা আর রাজ্য সরকার সমূহের রাজস্ব আদায় ৩,০৩,৪০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর বাবদ আদায় ২,৪৮,৯০০ কোটি টাকা আর রাজ্য সরকার সমূহের কর বাবদ আদায় ১,৪৯,১০০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার সমূহ কেন্দ্রের আদায় করা করের মাত্র ২৫ শতাংশ পায়। ২০০৩-০৪-এ পেয়েছে ৬২,৫০০ কোটি টাকা। (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক পলিসি রিভিউ রিপোর্ট, পৃঃ ১১৮ এবং ১২০) জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ যৌথভাবে বারেবারে দাবি জানিয়েছেন যে রাজ্যগুলির এলাকা থেকে কেন্দ্রের আদায় করা করের অন্তত অর্ধেক রাজ্যগুলিকে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সে দাবীকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে চরম অনমনীয় মনোভাব পশ্চিমবঙ্গ সহ সব রাজ্যকে তীব্র আর্থিক সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ সংগ্রহ করছেন ৭/৮ শতাংশ সুদে আর সেই অর্থ রাজ্যগুলোকে ঋণ হিসাবে দিচ্ছে ১২ শতাংশ সুদে। রাজ্যের আর্থিক সংকটমোচনে এই সুদের হার কমানোর দাবী কেন্দ্রীয় সরকার বারেবারে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। সার, বিদ্যুৎ, কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল (সম্প্রতি ১৫ দিনের মধ্যে দু'বার পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে), সাবান প্রভৃতি প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর লাগামছাড়া কর বসিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে এ বছর সংগ্রহ করবে ১৩,২০০ কোটি টাকা। নোট ছেপে সংস্থান করেছে ৩৫,৪০০ কোটি টাকা। বাজার থেকে ঋণ নিয়েছে ১,০৭,২০০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারগুলি এ বছর বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করেছে মোট ১৩,৭০০ কোটি টাকা। অন্য সুযোগগুলি রাজ্য সরকারের নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত 'ইকনমিক সার্ভে' ২০০২-২০০৩ অনুযায়ী বিদেশ থেকে ভারতের নেওয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,৯৩,৫০৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতীয় জনগণের মাথাপিছু বিদেশী ঋণের পরিমাণ ৪,৭৯১ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,২১,৭৩৯ কোটি টাকা—মাথাপিছু ৯,৯২০ টাকা। দেশী-বিদেশী ঋণ মিলিয়ে ভারতের জনগণের মাথাপিছু ঋণ ১৪,৭১১ টাকা (ঐ রিপোর্ট, পৃঃ৩১)। কেন্দ্রীয় সরকার ফাণ্ড-ব্যাঙ্কের পরামর্শে চলে দেশটাকে দেউলিয়া করে তার দায় রাজ্য সরকারের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এরই প্রতিবাদে এই সমাবেশ।

কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে কোনোদিন 'উৎপাদনমূলক' বিষয় বলে মনে করেনি। শিক্ষাকে তারা 'সমাজসেবা মূলক' বিষয় বলে ভেবেছে। আর তাই বিশ্বব্যাঙ্ক যেই বলেছে সমাজসেবা মূলক খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমাতে হবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই আজ্ঞা তারা পালন করেছে। গ্যাট চুক্তির ৪ ও ১৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শিক্ষা আমদানি-রপ্তানি করা যাবে। ভারত এই চুক্তি মেনে নিয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার 'দোহা' সম্মেলনে 'শিক্ষা' কে পণ্য হিসাবে গণ্য করে শিক্ষা নিয়ে অবাধে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত নেবার পর দেশে দেশে বহুজাতিক শিক্ষা কোম্পানী 'শিক্ষা' বেচে মুনাফা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলিকে ভারতে অবাধে 'শিক্ষা' রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে ফলে ভারতের প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারীকরণ হচ্ছে এবং দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এখন রাজস্থানে ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি ঃ শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে, কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ও জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০১-০২ সালে জাতীয় আয়ের মাত্র ২·৮ শতাংশ ব্যয় করেছে। ভারতে শিক্ষাখাতে মোট সরকারী ব্যয়ের মাত্র ১১ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার, বাকি ৮৯ শতাংশই বহন করে রাজ্য সরকারগুলি। অথচ শিক্ষাকে রেখে দেওয়া হয়েছে যুগ্ম তালিকায়। দাবী ঃ শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রের এন ডি এ সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যে পাঠক্রম তৈরী করেছে তা সঙ্ঘ পরিবারের শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রকল্প দ্বারা নির্দেশিত। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ধ্বংসসাধনের লক্ষ্যে রচিত এই পাঠক্রমের বিরুদ্ধে এই সমাবেশ। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই

পাঠক্রম সম্পর্কে এই নীতি প্রত্যাহার করতে হবে। তাছাড়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী পেনসনবিধি চালু করেছে এবং কোর্ট গ্র্যাচুইটি শিক্ষকদের প্রাপ্য নয় বলে যে আওয়াজ তুলেছে সমিতি তার তীব্র বিরোধিতা করছে। শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের জনদরদী ও শিক্ষাদরদী বামফ্রন্ট সরকার গত ২৬ বছরে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করেছেন, শিক্ষার পাঠক্রমকে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রেখেছেন, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন এবং সাক্ষরতার সফল অভিযান সংঘটিত করেছেন। ফলে অতি দরিদ্র ঘরের সন্তানরাও আজ হাজারে হাজারে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে চলেছে। গত ২১ বছর শিক্ষকদের বেতন ভাতা মিলিয়ে ২৪ গুণ বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। পেনসন প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কতকগুলি দাবী দাওয়া দীর্ঘদিন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। প্রতি দশ বছর অন্তর শিক্ষাকর্মীদের পরবর্তী স্কেলে নিয়ে যাবার জন্য দাবী আজও অমীমাংসিত। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতনপ্রদানে বিলম্ব, অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটি ও কমিউটেশনের অর্থ সময়মতো না দেওয়া, সিনিয়র ও জুনিয়র শিক্ষকদের বেতনের ফারাকের সমস্যা, রোপা' ৯৮-এর অর্থ এখনও হাতে না পাওয়া, ডিএ-প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর জন্য সুষ্ঠু কোনো সরকারী নিয়মনীতি ঘোষণা না করার সমস্যাগুলি এখনও অমীমাংসিত। ১৩·১২·২০০০ তারিখের পর এ রাজ্যে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে ৬০ শতাংশ শিক্ষাকর্মীর শূন্যপদ পূরণ করা হবে। এ ব্যাপারে অর্থদপ্তর সম্মতি দিয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়ে পরিষ্কার সরকারী আদেশ জারি করা হোক। অনুমোদনপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মীদের বেতন অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। শিক্ষাকর্মীদের সমস্ত শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাকর্মীদের অভাবে বিদ্যালয়গুলিতে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে না পারলে শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন ব্যাহত হবে। কারণ শিক্ষাকর্মীদের কাজ শিক্ষকদেরই করতে হচ্ছে। ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় সমিতির আহ্বানে মহকুমায় মহকুমায় এই সব দাবীতে বিক্ষোভ অবস্থান করা হয়েছে। এছাড়া জেলায় জেলায় সভা ও কনভেনশন করে দাবীসনদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে স্বঘোষিত চার শতাংশ মহার্ঘভাতা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জানুয়ারী, ২০০৪ থেকে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন রাজ্য সরকার। সমিতি মনে করে, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সমদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণ করা উচিত ছিল। মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। অর্জিত অধিকার রক্ষা ও রাজ্য সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের দাবীতেও এই ডেপুটেশন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সমিতি মনে করে জনস্বার্থ বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর বামফ্রন্ট সরকারকে তার নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বজায় রাখতে বাধ্য করার জন্য সংগ্রামের ধারা এক ধরণের হতে পারে না। বামফ্রন্ট সরকারকে তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের পথ তৈরীতে সাহায্য করা বা বাধ্য করার জন্য সংগ্রাম আজকের পরিস্থিতিতে একটি জরুরী পদক্ষেপ। এই ব্যাপারে শিক্ষক সমাজকে পথ দেখাতে হবে। পাশাপাশি এই সরকারকে সাথে নিয়ে কেন্দ্রের নীতিহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই আজ আশু কর্তব্য হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত। পুঁজিবাদী সংকটের হাত থেকে মুক্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও লড়াই করে সামনের দিকে এগুতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ধাক্কায় বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধতা বাড়ছে—একে কিছুটা অতিক্রম করার উপায় বার করে দিতে পারে একমাত্র শক্তিশালী গণ আন্দোলন। সেই আন্দোলনের শরিক হতে হবে আমাদের। তাই এই সমাবেশ।

সুপ্রীম কোর্টের ধর্মঘট বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের যে আহ্বান জানিয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে ও যৌথ উদ্যোগে ধর্মঘটের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতেও এই সমাবেশ।

তাই ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সমাবেশ ও ডেপুটেশনকে সফল করার জন্য বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রচার করতে ও ঐদিনের সমাবেশকে বৃহত্তম সমাবেশে পরিণত করতে সর্বাত্মক প্রয়াস নেবার উদ্যোগ নিতে হবে সদস্যবন্ধুদের। আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সমিতির অতীত ঐতিহ্যকে অম্লান রাখতে আসুন, আমরা এই সমাবেশকে ঐতিহাসিক সমাবেশে পরিণত করি।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ।
শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ।

অভিনন্দন সহ,
অমল ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে

● কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে ● রাজ্যের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনার বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে ● শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধে ● শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করার দাবীতে ● রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত অর্জিত অধিকার রক্ষা ● রাজ্য সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের দাবীতে এবং ● সুপ্রীম কোর্টের ধর্মঘট বিরোধী রায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২৪শে ফেব্রুয়ারী '০৪-এর ধর্মঘটের সমর্থনে

কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ডেপুটেশন

স্থান ঃ রাণী রাসমণি রোড, কলকাতা
তারিখ ঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪
সময় ঃ বেলা ২টা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিগত ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত দাবীসমূহ নিয়ে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ রাণী রাসমণি অ্যাভিনিউতে প্রায় বিশ হাজার সদস্যের উপস্থিতিতে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের হাতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী ২৩ দফা দাবি-সম্বলিত এক স্মারকলিপি তুলে দিলেন। এই বিশাল কেন্দ্রীয় সমাবেশে রাজ্যের ১৯টি জেলা থেকে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষাকর্মীরা সকাল থেকেই উপস্থিত হতে শুরু করেন। উপচে পড়ে রাণী রাসমণি রোডের উভয় পার্শ্ব। এই কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ডেপুটেশন পরিচালনা করেন সমিতির সভানেত্রী ক্ষমা ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি অধিক্রম সান্যাল, উপাসনা নন্দী, অশোক ভট্টাচার্য ও রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতেই কলকাতা জেলার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশন করে কেন্দ্রীয় সমাবেশের উপযোগী



পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সমাবেশে সভানেত্রী ক্ষমা ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি ও অর্থনীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং রাজ্য সরকারকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত দাবীগুলির সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য উদ্যোগ নেবার অনুরোধ করেন।

সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী তাঁর বক্তব্যে এই সমাবেশ ও ডেপুটেশনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বিশ্বায়নের পথে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে দেশকে দেউলিয়া করছে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারকে তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের পথ তৈরি করতে সাহায্য করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সরকারকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের নীতিহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে আমাদের। সমাবেশে স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭ দফা এবং রাজ্য সরকারের কাছে ১৬ দফা দাবির প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেন। সভায় অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক মিত্রা ভট্টাচার্য বামফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রের দুর্নীতিগ্রস্ত এন ডি এ সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান। গরিব মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকারের প্রশাসনকে আরও জনমুখী করার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শেখানোকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি যে সমর্থন করে না তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কসরেন। তিনি বলেন, ২৪শে ফেব্রুয়ারীর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট 'ছুটির দিন' নয়। তিনি সমবেত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে আগাম নোটিস দিয়ে জানিয়ে দিন '২৪শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট করছি তাই বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকব না ঐ দিন।' আসন্ন চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে বি জে পি-জোটকে পরাস্ত করা এবং রাজ্যে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের যুগ্ম-সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন শিক্ষা ও সাহিত্য-এর সম্পাদক প্রশান্ত ধর। ২৪শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন অপরেশ ভট্টাচার্য এবং এই প্রস্তাব সমর্থন করেন কোষাধ্যক্ষ রীতা সেন। অন্যতম সহ-সাধারণ



সম্পাদক লুৎফুল আলম তাঁর বক্তব্যে পেশাগত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করেন ও আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন।

সমাবেশে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেন, এ বি টি এ'র পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে ৭দফা দাবি এবং রাজ্য সরকারের কাছে যে ১৬ দফা দাবি পেশ করা হয়েছে তার সবগুলির সঙ্গেই রাজ্য সরকার একমত। বকেয়া মহার্ঘভাতা, বিলম্বিত গ্র্যাচুইটি ও কমিউটেশন প্রদান, শূন্যপদে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ ইত্যাদি দাবিগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে তার উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত যে বিদ্যালয় শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী অবসর নিয়েছেন তাঁদের গ্র্যাচুইটি এবং কমিউটেশনের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে অবসর নিয়েছেন এমন ৪৫ হাজার জনের মধ্যে কঠিন অসুখের চিকিৎসার জন্য অথবা মেয়ের বিয়ের জন্য প্রয়োজন এমন ৫ হাজার জনকে গ্র্যাচুইটি এবং কমিউটেশনের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৪০ হাজার জনের মধ্যে তিনভাগের একভাগ অংশের টাকা ১লা এপ্রিল থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে মিটিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, ফেব্রুয়ারী মাসের বেতনের সঙ্গেই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারীর বকেয়া চার শতাংশ মহার্ঘভাতার টাকা হাতে পাবেন। এছাড়া রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে যে ৮ হাজার শিক্ষাকর্মীর পদ শূন্য রয়েছে সেই পদগুলির ৬০ শতাংশ পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের অর্থমন্ত্রক। ক্যাবিনেট কমিটিতে অনুমোদিত হওয়ার পর খুব শীঘ্র এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে।

মাননীয় দাশগুপ্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখান কেমন করে কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে দেশে দারিদ্র্য, বেকারী, অনাহার ডেকে এনেছে, সর্বনাশ করেছে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের। তিনি বলেন, এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে হবে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের। কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পাওনা টাকা না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আর্থিক সংকটে ফেলেছে তাও তথ্য-প্রমাণাদিসহ তিনি উল্লেখ করেন।

মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস শ্রদ্ধার সঙ্গে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ১৯৫৪ সালের স্মরণীয় বারোদিনের গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটা ঐ ঐতিহাসিক আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের বর্ষ। আজ থেকে ৫০ বছর আগে এই ১৬ই ফেব্রুয়ারী আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর রাজ্যের তৎকালীন কংগ্রেস যে পুলিসী দমন-পীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছিল তিনি তার বর্ণনা দেন।

শ্রীবিশ্বাস বলেন, প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি ফিরিয়ে আনা নিয়ে ইতোমধ্যেই নানা স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনা হতেই পারে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে কমিশনও করা যেতে পারে। সমাবেশে সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন এস টি এফ আই-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীতুষার পঞ্চাননসহ এ বি পি টি এ'র সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী বনানী বিশ্বাস ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

শ্রীকান্তি বিশ্বাস
মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয় মহাশয়,

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিগত ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত দাবীসমূহ আমরা আজকের সমাবেশের পক্ষ থেকে আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপন করছি।

রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপিত দাবীগুলির মধ্যে ১, ৪, ৬ এবং ১৫নং দাবীর ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যেই কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। এই বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২, ৫, ১১, ১২ এবং ১৩নং দাবী নিয়ে আপনার সাথে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং এইগুলি বিবেচনাধীন রয়েছে। অন্যান্য দাবীগুলিও সুবিবেচনা পাবে বলেই আমরা আশা রাখি।

শিক্ষাদপ্তরের তরফে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুধু আমাদের সমিতির সাথে নয়, সকল স্বীকৃত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি চালু রাখার জন্য আমরা

আপনাকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। এই প্রক্রিয়া সরকারের ঘোষিত নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সরকারের সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অবহিত। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের দাপট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সেই নীতির প্রতি একান্ত অনুগত থাকার প্রক্রিয়া চালু করায় রাজ্য সরকারকে করে তুলেছে আরো সঙ্কটাপন্ন। এই অবস্থার মধ্যেও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে এই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারের উদ্যোগের পাশে আমরা দৃঢ় অবস্থান নিতে প্রস্তুত।

শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকীকরণের পরিকল্পিত উদ্যোগ দেশব্যাপী এক ভয়াবহ পরিমণ্ডল তৈরী করছে। ইতিহাসের বিকৃতি ও পাঠক্রম-পাঠ্যসূচীর গণতান্ত্রিক উপাদানসমূহকে অপসারিত করার প্রয়াস শিক্ষকসমাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আর এস এস ও সঙ্ঘ পরিবারের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার এই জঘন্য অবস্থান নেওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন হতে চলেছে। আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ যে, সরকার এইসব ক্ষেত্রে সঠিক এবং দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে।

তথাকথিত উদারনীতি বর্তমান স্তরে এসে বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক অবস্থাকে দ্রুতগতিতে আরো খারাপের দিকে প্রসারিত করছে। এই অবস্থার মুখোমুখি হয়েও রাজ্য সরকার শিক্ষার প্রসার, মানোন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যে অবস্থান নিয়েছেন, দ্রুত তার কার্যকরী রূপ প্রদান করতে হবে।

পাশাপাশি আমরা একথাও খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের চাপে জনস্বার্থবাহী এই সরকার যেন তার ঘোষিত নীতি থেকে সরে না দাঁড়ায়। এই সব বাধা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সরকারকে অগ্রসর হতে হবে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে পথ তৈরী করে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছি এবং করবো।

আমলাতান্ত্রিক বাধা ও শ্লথতা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সরকারকে তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো কাটিয়ে ওঠা খুবই জরুরী।

কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটু বিলম্বে হলেও মহার্ঘভাতা ঘোষিত হয়েছে। এই মহার্ঘভাতা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দ্রুত পাবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটি ও কমিউটেশনের প্রাপ্য অর্থ সম্প্রতি ঘোষিত সরকারী আদেশনামা অনুযায়ী যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তৎপরতা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে তিন বছরের চেয়ে বেশী সময় লেগে যাচ্ছে — বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে আবেদন করছি।

শিক্ষাকর্মী নিয়োগে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আপনি যতটা অগ্রসর হয়েছেন, তার চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যান্য দাবীগুলিও দ্রুত মীমাংসার জন্য অনুরোধ করছি।

কিছু দাবী আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সেই দাবীগুলিও এই স্মারকলিপিতে আমরা উল্লেখ করলাম। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের একটা নীতিনিষ্ঠ অবস্থান আজ সর্বজনবিদিত। কেন্দ্রের সরকারের কাছে আমাদের দাবীগুলির প্রশ্নে রাজ্য সরকারের অবস্থান শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের পক্ষে। আমাদের অনুরোধ, এই দাবীগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমাদের দাবীসমূহ

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী

১) সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

২) শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং ইতিহাস বিকৃত করার অন্যায় পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৩) শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযানের বরাদ্দ কমানো চলবে না।

৪) ধর্মঘটের অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে। দমন-পীড়নমূলক সমস্ত আইন বাতিল করতে হবে।

৫) জনস্বার্থ-বিরোধী অর্থনৈতিক নীতি বাতিল করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করা বন্ধ করতে স্ব-নির্ভরতার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৬) প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আমানতের সুদের হার ১২ শতাংশ করতে হবে। নয়া পেনশন প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

৭) মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। রাজ্যের উপর আর্থিক বঞ্চনার বোঝা চাপানো চলবে না।

রাজ্য সরকারের কাছে দাবী

১) রঞ্জুগোপাল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ সমস্ত শিক্ষক

সংগঠনের সাথে আলোচনা করে দ্রুত কার্যকরী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২) কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজের মূল প্রবাহের সাথে সমসুযোগের ভিত্তিতে অগ্রগতির ধারা উন্মুক্ত করতে হবে। স্থায়ীভাবে পিছিয়ে থাকার বাধাগুলো সরাতে হবে।

৩) প্রশাসনিক কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারে আরো অগ্রগতি ঘটাতে হবে। রাজ্য সরকার অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরাজি বাধ্যতামূলক রাখা চলবে না।

৪(ক) পেশাগত দাবীর প্রশ্নে সরকারের তরফে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তৎপর হতে হবে। শিক্ষাকর্মী নিয়োগে এমবার্গো অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। বিলম্বিত গ্র্যাচুইটি ও কমিউটেশন প্রদানে সরকারী নির্দেশনামা জারী করতে হবে। প্রবীণ শিক্ষকদের বেতন নবীনদের চেয়ে কম হওয়ার ক্ষেত্রগুলির সুরাহা করতে হবে। ঘোষিত মহার্ঘভাতা প্রদানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বিষয়টি সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে।

(গ) শিক্ষার অঙ্গনে কর্মরত অন্যান্যদের সাথে ছুটির বিধি সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে।

৫) ট্রেজারীতে বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা জমা দেবার দিন থেকে প্রাপ্য সুদ দিতে হবে। বিধিসম্মত সুদ নিয়মিত জমা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬) মহার্ঘভাতা-প্রাপক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমস্যা নিরসনে প্রতিশ্রুত নির্দেশনামা দ্রুত প্রকাশ করতে হবে।

৭) কেবলমাত্র মহার্ঘভাতা-প্রাপক বিদ্যালয়ে ও সরকারী সাহায্যবিহীন পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বৃত্তিগত নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে হবে।

৮) স্পনসর্ড বিদ্যালয়ে নির্বাচিত পরিচালন সমিতি গঠনের বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

৯) বিদ্যালয়গুলিতে সর্বমোট অনুমোদিত পদসমূহের সুষম বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

১০) শিক্ষার্থীবিহীন বা খুব কম শিক্ষার্থী এমন বিদ্যালয়গুলিকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১) শিক্ষকদের নিয়মিত অভিমুখীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাগত বিষয়ে পরিদর্শনের দায়িত্ব পর্ষদ ও কাউন্সিলকে দিতে হবে।

১২) স্কুল সার্ভিস কমিশন ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষক নিয়োগে অস্বাভাবিক বিলম্ব দূর করতে হবে।

১৩) পঞ্চম শ্রেণীর সরকারী পাঠ্যপুস্তক সময়মতো বন্টনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪) এস সি ই আর টি-কে আরো কার্যকরীর রূপ দিতে হবে।

১৫) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের গণতান্ত্রিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬) শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

অমল ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

অধ্যাপক অসীম দাশগুপ্ত
মাননীয় অর্থমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয় মহাশয়,

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিগত ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত দাবীসমূহ আমরা আজকের সমাবেশের পক্ষ থেকে আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপন করছি।

রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপিত দাবীগুলির মধ্যে ১, ৪, ৬ এবং ১৫ নং দাবীর ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যেই কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। এই বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২, ৫, ১২, ১২ এবং ১৩ নং

দাবী নিয়ে আপনার সাথে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং এইগুলি বিবেচনাধীন রয়েছে। অন্যান্য দাবীগুলিও সুবিবেচনা পাবে বলেই আমরা আশা রাখি।

সরকারের সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অবহিত। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের দাপট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সেই নীতির প্রতি একান্ত অনুগত থাকার প্রক্রিয়া চালু করায় রাজ্য সরকারকে করে তুলেছে আরো সঙ্কটাপন্ন। এই অবস্থার মধ্যেও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে এই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারের উদ্যোগের পাশে আমরা দৃঢ় অবস্থান নিতে প্রস্তুত।

শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের প্রতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকীকরণের পরিকল্পিত উদ্যোগ দেশব্যাপী এক ভয়াবহ পরিমণ্ডল তৈরী করছে। ইতিহাসের বিকৃতি ও পাঠক্রম-পাঠ্যসূচীর গণতান্ত্রিক উপাদানসমূহকে অপসারিত করার প্রয়াস শিক্ষকসমাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আর এস এস এবং সঙ্ঘ পরিবারের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার এই জঘন্য অবস্থান নেওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন হতে চলেছে। আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ যে, সরকার এইসব ক্ষেত্রে সঠিক এবং দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে।

তথাকথিত উদারনীতি বর্তমান স্তরে এসে বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক অবস্থাকে দ্রুতগতিতে আরো খারাপের দিকে প্রসারিত করছে। এই অবস্থার মুখোমুখি হয়েও রাজ্য সরকার শিক্ষার প্রসার, মানোন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যে অবস্থান নিয়েছেন, দ্রুত তার কার্যকরী রূপ প্রদান করতে হবে।

পাশাপাশি আমরা একথাও খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের চাপে জনস্বার্থবাহী এই সরকার যেন তার ঘোষিত নীতি থেকে সরে না দাঁড়ায়। এই সব বাধা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সরকারকে অগ্রসর হতে হবে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে পথ তৈরী করে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছি এবং করবো।

আমলাতান্ত্রিক বাধা ও শ্লথতা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সরকারকে তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো কাটিয়ে ওঠা খুবই জরুরী।

কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটু বিলম্বে হলেও মহার্ঘভাতা ঘোষিত হয়েছে। এই মহার্ঘভাতা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দ্রুত পাবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটি ও কমিউটেশনের প্রাপ্য অর্থ সম্প্রতি ঘোষিত সরকারী আদেশনামা অনুযায়ী যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তৎপরতা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে তিন বছরের চেয়ে বেশী সময় লেগে যাচ্ছে — বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে আবেদন করছি।

শিক্ষাকর্মী নিয়োগে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আপনি যতটা অগ্রসর হয়েছেন, তার চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যান্য দাবীগুলিও দ্রুত মীমাংসার জন্য অনুরোধ করছি।

কিছু দাবী আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সেই দাবীগুলিও এই স্মারকলিপিতে আমরা উল্লেখ করলাম। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের একটা নীতিনিষ্ঠ অবস্থান আজ সর্বজনবিদিত। কেন্দ্রের সরকারের কাছে আমাদের দাবীগুলির প্রশ্নে রাজ্য সরকারের অবস্থান শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের পক্ষে। আমাদের অনুরোধ, এই দাবীগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

অমল ব্যানার্জী
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

[গত ১৬·০২·০৪-এর কেন্দ্রীয় সমাবেশে মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাসকে যে ২৩ দফা দাবীপত্র দেওয়া হয়েছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক অসীম দাশগুপ্তকেও একই দাবীপত্র দেওয়া হয়েছে। তাই আর ঐ দাবীপত্রের উল্লেখ করা হলো না।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ রাণী রাসমণি এভিনিউতে কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ডেপুটেশনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্তর ভাষণ

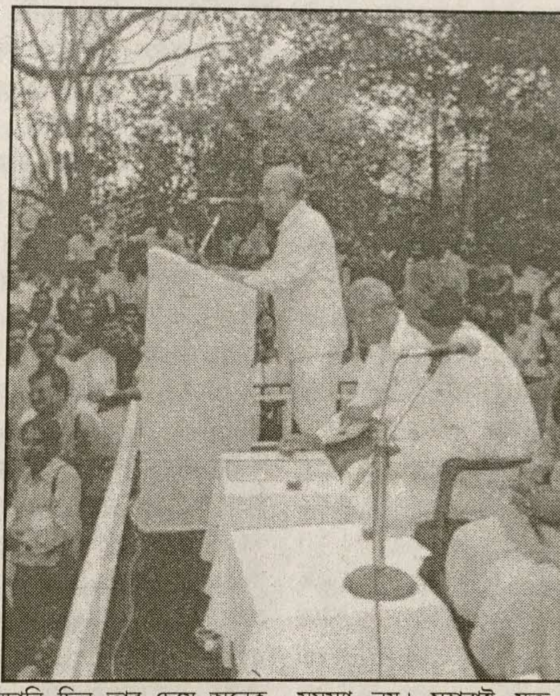
সভাপতিমণ্ডলী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আমার বন্ধু শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মিগণ,

আমি প্রথমেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে অভিনন্দন জানাবো যে তাঁরা আজকে যে দাবীগুলি একত্রিত করে এখানে এই রাণী রাসমণি রোডে কেন্দ্রীয় জমায়েতের আহ্বান করেছেন তার জন্য। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনারা আজকে কষ্ট করে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এই দাবীসমূহের সমর্থনে তার জন্য আমার বুকের ভেতর থেকেই সংগ্রামী উষ্ণ অভিনন্দন আপনাদের প্রত্যেককে আমি জানাচ্ছি। মাননীয় সভাপতিমণ্ডলীর কাছে আমি একটা অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি আপনারা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করেছেন অর্থমন্ত্রী হিসেবে। আমি তো সপ্তাহে এখনো একদিন অবৈতনিকভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আমি তো এখনো শিক্ষক, প্রায় ৩৬ বছর পড়াচ্ছি, আমি কি এখানে বক্তব্য রাখতে পারি? হ্যাঁ, অর্থমন্ত্রী হিসেবে তো অবশ্যই, কিন্তু শিক্ষক হিসাবে কি পারি? তাহলে একটু খোলাখুলি বলা যায় কথাগুলো।

প্রথমেই আমি আর একটু এগোনোর আগে যে দাবীসমূহ একত্রিত করে স্মারকলিপি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাকে আপনারা দিয়েছেন, আমি সেই স্মারকলিপি অবশ্যই গ্রহণ করছি এবং স্মারকলিপিটি এখানে বসেই আমার পড়ার সুযোগ হল। এই স্মারকলিপির মাধ্যমে আপনারা যতগুলি বিষয় উল্লেখ করেছেন, আমি প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি। সহমত পোষণ করে সারা দেশের ক্ষেত্রে আপনারা যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন, সেগুলির ওপর সংক্ষেপে বলবো। আর রাজ্যস্তরে যে বিষয়গুলি আপনারা উল্লেখ করেছেন তার ওপর সহমত পোষণ করে এখন ঠিক যেটুকু বলা যায়, যতদূর আমরা করতে পেরেছি সেটা খোলাখুলি বলবো। যেটা পারিনি তাও বলবো, আগামীদিনে কি করতে চাই তাও বলবো। আর সব শেষে এ সমস্ত ছাপিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর যে মূল আক্রমণটি চলে এসেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কি করবো সেটার ওপর বক্তব্য রেখেই আমি শেষ করবো।

বন্ধুগণ, আপনারা এই সমাবেশের আয়োজন করেছেন, সত্যি সারা দেশেরই একটি সংকটের সময় শুধু আর্থিক নয়, আর্থিক এবং সামাজিক সংকটের সময়। এর মূল সূত্রপাত আপনারা জানেন। তাই সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে ভারতবর্ষের সরকার দেশের মধ্যে কোনো আলোচনা না করে, দেশের যে নির্বাচিত সংসদ, 'পার্লামেন্ট' সেখানেও কোনো আলোচনা হয়নি, আলোচনা না করে প্রকৃত অর্থে তা গোপন রেখেই বিদেশ থেকে, নির্দিষ্টভাবে বলা যায় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে একটা বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণ গ্রহণ করে ফেলেন। এবং পরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিতে সই করেন, সেখানেও আগে আলোচনা হয়নি। এই ঋণ এবং এই চুক্তি, তার অনেকগুলি শর্ত ছিল। সেই শর্তগুলোই যদি কেউ যোগ করেন তাহলে দেখবেন মোড়কে করে তার নামই দেওয়া হল 'উদার নীতি'। তারই ক্ষতিকারক দিকগুলি একের পর এক গত ১৩ বছরে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাবে শ্রমজীবী মানুষের ওপরে নির্দিষ্ট ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের প্রত্যেকের ওপর আসছে। কারা এই ঋণ দিলেন, তারা কারা? আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কি সংস্থা? এই সংস্থা এমনি যে একদিক থেকে সব দেশই তার সদস্য হতে পারেন, আমাদের দেশও সদস্য। কিন্তু এর নিয়ামক শক্তি, এর নিয়ন্ত্রক শক্তি, তার মধ্যে যে গোষ্ঠী, সেটা কিন্তু ধনী দুনিয়ার প্রথম বিশ্বের দেশগুলি এবং তার মূল চাবিকাঠি কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। তারা যখন ঋণ দিলেন, তাদের শর্তে মূল কথাটাই ছিল যে, ধনী দুনিয়ার যে বড় বড় উৎপাদক গোষ্ঠী, বহুজাতিক সংস্থা তারা যে পণ্য তৈরী করছেন, শুধু শিল্পপণ্য নয়, কৃষিপণ্য এবং পরিষেবার ক্ষেত্রেও তারা যা প্রস্তুত করছেন তার জন্য ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের একটা বড় বাজারকে খুলে দিতে হবে। এইটাই কিন্তু মূল চিন্তা থেকেছে, কি করে ওরা বাজার দখল করতে পারবেন? আমাদের দেশের সরকারের কল্যাণকর ভূমিকা ইত্যাদি যা আংশিকও আগে ছিল, তার ওপর দাঁড়িয়ে বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে একটা শুল্ক ছিল। গড় শুল্কের হার ছিল ৫০ শতাংশ। আমি মনে করি ঠিকই ছিল। ওরা বললেন, এই সব কিছু বিদেশী পণ্যের ওপর শুল্ককে, দেশের শিল্প-কৃষিকে প্রস্তুতির সময় দেওয়া যাবেনা। দ্রুততার সঙ্গে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নির্বিচারে ৫০ শতাংশ থেকে ৫ বছরের মধ্যে ১০ শতাংশে,

তারপর ৫ শতাংশে, তারপর ২ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। বন্ধুগণ, সত্যিই তাই হয়ে গেলো। ৫০ শতাংশ আর নেই। প্রথমে ২০, তারপরে ১০, তারপরে ৫, কোথাও কোথাও তারও নীচে নেমে গেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু পরিমাণগত বাধা ছিল। বিদেশীরা আপত্তি তুললেন। এখন থেকে বছর পাঁচেক আগে, বর্তমানে যারা ভারত সরকারে আছেন, যে গোষ্ঠী আছেন, এটাতো রাজনৈতিক সভা নয়, আমি সেইভাবে বলছি না, তারা, যেটা আগে শুরু হয়েছিল তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে গিয়ে সমস্ত পরিমাণের বাধা তুলে দিলেন। ১৪০০'-র বেশী পণ্য, আমরা জীবনে তার চেয়ে বেশী কেউ পণ্য ব্যবহার করিনা, যা যা পণ্য আমরা ব্যবহার করি, সমস্ত পণ্যের ওপর নির্বিচারে সমস্ত বাধা তুলে দেশের বাজারে আমদানির দরজা একেবারে খুলে দেওয়া হল। এর ফলে পাছে বিরোধীরা কেউ প্রশ্ন তোলে, তাই কেন্দ্রীয় সরকার-এর যে প্রকাশিত তথ্য 'আর্থিক সমীক্ষায়' প্রকাশ করেন, এবার কিন্তু সেটা গোপন রেখেছেন। যে তড়িঘড়ি বাজেট পেশ করলেন সেখানে সেই তথ্য নেই। গত বছর পর্যন্ত প্রকাশিত যে তথ্য তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখন থেকে ১৩ বছর আগে আমাদের দেশে যেভাবে আমদানি ছিল তার চেয়ে অনেক গুণ আমদানি বেড়ে গেছে। কিন্তু কোন প্রথম বিশ্বের দেশ আমাদের দেশ থেকে রপ্তানির দরজা খুলে দেয়নি। তাই আমদানি-রপ্তানির মধ্যে যে ব্যবধান, যে বিপজ্জনক ব্যবধান, যেটা ১৩ বছরের আগে ছিল ৪ হাজার কোটি টাকার মত, এক একটা বছরে, ১২ বছরে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে আর ৪ হাজার কোটি টাকায় নেই। ১০ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪৩ হাজার কোটি টাকাতে চলে গেছে। অর্থাৎ অনেক আমদানি পণ্য ঢুকেছে, রপ্তানি তার তুলনায় কিচ্ছু বাড়েনি। তার মানে দেশের কোন একটি কারখানা তার দেশের বাজার হারিয়েছে, বিদেশের বাজার খোলেনি। অর্থাৎ নিট্ অর্থে তিনি বাজার হারিয়ে ফেলেছেন, যে মুহূর্তে কোন কারখানা বাজার হারায়, সেই কারখানা বন্ধ এবং রুগ্ন হয়। আমাদের দেশে এখন থেকে ১৩ বছর আগে রুগ্ন ও বন্ধ কল-কারখানার সংখ্যা ছিল—আমাদের যা প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য পড়ে যা আমরা দেখেছি, সেই তথ্যেই বলছে, সেই সংখ্যা ছিল সোয়া দু লক্ষের মতো। এখন প্রায় চার লক্ষে পৌঁছে গেছে। বড় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত, তার চেয়ে বেশী মাঝারি শিল্প, তার চেয়েও বেশী আপনার এলাকার ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত। সবচেয়ে বেশী রুগ্ন ও বন্ধ কল-কারখানা কিন্তু পশ্চিমবাংলায় নয়, মহারাষ্ট্রে। তার পরে কমবেশী প্রত্যেকটি রাজ্যে কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে। আমার আপনার বাড়ীতে যদি কোন বেকার যুবক-যুবতী থাকে, তিনি হয়তো আপনার এলাকার একটি কারখানা বন্ধ দেখে তার মনে হচ্ছে এ বুঝি পশ্চিমবাংলার সমস্যা। একই ভাবে আজকে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহরের একটি কারখানা বন্ধ দেখে একজন মারাঠি যুবকের মনে হবে তার সমস্যা, পাটনার একজন যুবকের মনে হচ্ছে সেটা তার সমস্যা, খোদ দিল্লীর যুবকের মনে হচ্ছে তার সমস্যা। যদি প্রত্যেকটি রাজ্যের মানুষের মনে হয় তার সমস্যা, সেটা শুধু কোন একটি রাজ্যের আলাদা সমস্যা নয়। মহারাষ্ট্র যুক্ত, গুজরাট যুক্ত, দিল্লী যুক্ত, পশ্চিমবাংলা যুক্ত, এই করতে করতে সমস্ত দেশ দেখছে দেশের সমস্যা সরকারের এই নীতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা প্রত্যেকে, আমাদের বাড়ীতে বেকার। এই যন্ত্রণা আমরা বুঝিনা? কিসের সুখী হওয়া? কার সুখী হওয়া আমরা বুঝিনা? কি বলছেন ওঁরা? আমি এ প্রসঙ্গ আর বাড়াচ্ছি না। এটা শুধু কল-কারখানা নয়, একই ভাবে কৃষিপণ্য দেশের মধ্যে নির্বিচারে আমদানি করাতে কৃষক সারা বছর ধরে যে ফসল উৎপাদন করেছেন হঠাৎ দেখলেন বিদেশ থেকে চাল ঢুকে গেলো, গম ঢুকে গেলো, বিভিন্ন পণ্য ঢুকে গেলো, কৃষক দাম পেলেন না। এই কারণে জানবেন সারা



দেশ জুড়ে শিল্প, কৃষি, পরিষেবায় বেকারী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র নথিভুক্ত বেকার, যার সংখ্যা ১৩ বছর আগে ছিল ৩ কোটির মত, এখন ৪ কোটি অতিক্রম করে চলে গেছে। এগুলো শুধু নথিভুক্ত বেকার। তার বাইরে বিপুলসংখ্যক বেকার আছেন। এটা ভয়াবহ সমস্যা। যখন এই সমস্যা হয়, যদি সাধারণ মানুষ, সাধারণ বেকার যুবক-যুবতী যদি একবার বুঝে ফেলেন তাহলে তো দিল্লীর এই নীতি এক দিনও থাকতে পারেনা। তাই তাদের মনটা কি করে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, কি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায় সেই চেষ্টা করছে এরা। তাই এরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করার—ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে, একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে আঞ্চলিকতাবাদের নামে—খেলায় মেতেছে। এইতো গত ৫ বছরের মধ্যেই দেখলাম ২৫টা রাজ্যের মধ্যে ভেঙে ভেঙে ২৮টা রাজ্য হয়ে গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তৈরী করা—এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো যাতে মানুষের মনটা ঐদিকে চলে যায়। তাতেও তো কেউ ভুলছেন না। বেকারীর যন্ত্রণাতো যাচ্ছে না। তাই বন্ধুগণ, মানুষ কিন্তু আস্তে আস্তে ক্ষোভে উত্তাল হতে শুরু করেছেন। যখনই প্রক্রিয়া চলছে তার সঙ্গে সঙ্গে এরা পরিষেবার ক্ষেত্রেও, শুধু শিল্প-কৃষি নয়, পরিষেবাতেও একই চিন্তা, সরকারের ভূমিকাকে খর্ব করো। সরকারের যেটা কল্যাণকর ভূমিকা তাকে খর্ব করো। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের কল্যাণকর ভূমিকাকে খর্ব করো। জানবেন শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আঘাত সে আঘাত তো সেটাই--শিক্ষাতে যেন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি প্রবেশ করে। শিক্ষাকে যেন পণ্য করা হয়। এই কিন্তু মূল জায়গা। যাতে সরকারকে সরিয়ে দিয়ে ব্যবসায়ী ঢুকতে পারেন। দেশের ব্যবসায়ী নয়, প্রথমে বোঝা যায় নি, আস্তে আস্তে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে ঢুকতে পায়ে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা কিন্তু খুব ধীর পদক্ষেপে কিন্তু খুব নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষে ঢুকতে শুরু করেছেন। বন্ধুগণ, তার কিন্তু আঘাত প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান। আমরা পশ্চিমবাংলায় আমাদের দুর্গ রক্ষা করার চেষ্টা করছি। আমাকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয়, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন বাবু বললেন, কিছুদিন আগে মুম্বাই শহরে একটি এই ধরণের বড় সম্মেলন হয়েছিল সারা দেশের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিয়ে। তারা সেখানে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। মহারাষ্ট্রের মত একটি সরকার, যাকে বলা হয় শক্তিশালী সরকার, তারা সরাসরি বলছেন শিক্ষক-অধ্যাপকদের—এই গুটিকয়েক সরকারী বিদ্যালয়, সরকারী মহাবিদ্যালয়ের বাইরে—শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর দায়িত্ব থেকে তারা সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে নেবেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলতে শুরু করেছেন যে সাধারণ ভাবে অবসরকালীন ভাতা দেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন দায়িত্ব তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর আগের মত রাখবেন না। বন্ধুগণ, এই কিন্তু সর্বভারতীয় চিত্র। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে কিন্তু আজকে আমরা সমাবেশ করছি। তাই আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে যে দাবীগুলি এখানে রেখেছেন তার সঙ্গে আমি একশো শতাংশ সহমত। এই দাবী কিন্তু শুধু রাণী রাসমণি রোডে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষকদের কিন্তু একত্রিত হতে হবে। সেটা আমি পরে বলে শেষ করবো। এর মুখে দাঁড়িয়ে সঠিক ভাবেই একটু আগে মাননীয়া শিক্ষিকা, তিনি নেতৃস্থানীয়া শিক্ষিকা খুব সুন্দর বলছিলেন। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে, খুব সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা বামফ্রন্টের তরফ থেকে সারা দেশের ক্ষেত্রে বলছি যে এটাই একমাত্র পথ নয়।

বাঁচার একটা বিকল্প পথ আছে, সারা দেশের ক্ষেত্রে বলছি— আপনাদের পথ আপনারা বদলান। আর একই সঙ্গে যদি ওঁরা না করেন, আমরা আমাদের রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় কতটুকু করতে পারছি, কতটা করতে পারছিনা, সাধারণভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। সারা দেশের ক্ষেত্রে আমরা একথা বলছি, এটা জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে বসে আমরা বলছি। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। এখানে কৃষিটা বলছি, শিল্প অল্প বলছি, আপনারা এটা করছেন কি ? আমার এটা মনে পড়ছে তাই মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীকে বলছি, কয়েক বছর আগে দিল্লীতে সভা হয়ে গিয়েছিল জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের। প্রধানমন্ত্রী সাধারণত সভাপতি হন, মুখ্যমন্ত্রীরা সদস্য থাকেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা থাকেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষামন্ত্রীরাও ছিলেন, কৃষিমন্ত্রীরাও ছিলেন, আমরাও ছিলাম। কোনো কারণে সভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ততার কারণে আমাদের যেতে বলেছিলেন। প্রত্যেক রাজ্যকে ১৫ মিনিট করে সময় দেওয়া হয়। আমরা একটু পরে সময় যখন পাই এবং বলতে শুরু করি, ১৫ মিনিট পরে ঘণ্টা বাজিয়ে দেন। যখন ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন, তখন আমরা একটু বিস্মিতই হলাম। তখন অনেক রাজ্যের প্রতিনিধিগণ এবং রাজনৈতিক দলের বক্তারা, মুখ্যমন্ত্রীগণ বললেন "আমার যেটা বলার সময় ছিল, সেটা আমি পশ্চিমবাংলাকে দিয়ে দিচ্ছি"। তাঁকে দেখে আর একজন মুখ্যমন্ত্রী বললেন। এই করে করে আমরা আরও বাড়তি আধ ঘণ্টা সময় পেয়ে

গেলাম। আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম এটা কিন্তু ভারতবর্ষের সব মানুষজন শুনছেন। আমরা এটা বলে শুরু করলাম--এটা আপনারা কি করছেন ? এতবড়ো দেশ আমাদের, কেন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বা যিনি যাচ্ছেন, তিনি অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে আগে কথা বলে হাতে হাত মিলিয়ে কেন বলতে পারবেন না যে, "গত একশো বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এবং প্রথম বিশ্বের দেশগুলি তাদের দেশের কৃষিতে, শিল্পে ভর্তুকি দিয়ে দিয়ে এবং তাদের দেশে আমদানি শুল্কের একটা প্রাচীর সৃষ্টি করে কোন পণ্যকে ঢুকতে দেয়নি, পরে পরিপুষ্ট হয়ে আজকে হঠাৎ বলছেন, ভারতবর্ষের মত একটা দেশের আমদানি শুল্ক সরাও। ভর্তুকি তুলে দাও। বলছেন কৃষির ওপর থেকে সব সরিয়ে দাও"—কেন আমরা বলতে পারবো না ? আপনারা যেটা একশো বছর করেছেন, আমরা চাই খেলার ক্ষেত্রে একটু সমান প্রতিযোগিতা হোক। খেলার মাঠটা যেন সমান সমতায় থাকে। যেন ঢালু না হয়। আমাদের বিরুদ্ধে কেন ঢালু করে দিচ্ছেন। কেন, শুধু একবার বলুন। আমাদের একটু সময় দিন, কুড়ি বছর সময়। আদি অনন্তকালও চাইছি না। এরমধ্যে আমরা নিজেরা উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে যুঝে নেবো। বন্ধুগণ, আমরা অবাক হলাম, সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরা সাধারণ ভাবে কিন্তু সহমত হল। ভারত সরকারকে এই কাজ করতে হবে, বলতে হবে নির্বিচারে আমদানি থামান। যদি থামে কৃষিতে, শিল্পে একটু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আমাদের বন্ধ কল-কারখানাগুলো খুলবে, চিমনী দিয়ে একটু ধুঁয়ো বের হবে, আপনি যে পাড়ার বিদ্যালয়ে পড়ান, যেখানে ছাত্রগুলো পড়তে আসছে দু বেলা না খেয়ে, হয়তো একটু হলেও কিছুটা প্রয়োজন পরিমাণ খেতে পারবে, আপনার পড়াতে সুবিধা হবে। আমাদের কিন্তু হাত মেলাতে হবে এই মূল নীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। আর একই সঙ্গে আমরা বলেছি, দেশের মধ্যে একটু সমান সুযোগ, সমান প্রতিযোগিতা করুন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করুন। একচেটিয়া কেন্দ্রের হাতে রাখবেন না। শিল্পকে আপনারা যৌথ তালিকায় নিয়ে গেছেন। সাধারণভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য সরকারের যা বাজেট তাতে আমি সাধারণ ভাবে বলছি, ৫ শতাংশ অর্থওতো কেন্দ্রীয় সরকার দেন না। ৯৫ ভাগ তো দরিদ্র বামফ্রন্ট সরকারকেই দিতে হয়। তা আপনারা যদি একটু বিকেন্দ্রীকরণ করেন, ক্ষমতা একটু রাজ্যকে দিন না, আমরা পারি কিনা দেখুন না। এর মুখে দাঁড়িয়ে যখন কেন্দ্রীয় সরকার তার নীতি পরিবর্তন করছেন না, আমরা যাত্রা শুরু করি এই ভাবে,—আমরা কৃষিকে দিয়ে শুরু করি, সমান সুযোগ কৃষিতে মানে জমিতে সমান অধিকার, মানে ভূমি সংস্কার। সত্যিই তো ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে খেটে খাওয়া কৃষক ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকের হাতে মাত্র জমি আছে ৩৩ শতাংশ। একমাত্র পশ্চিমবাংলায়, হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলাতেই জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে, খেটে খাওয়া কৃষকের হাতে, এই ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকের হাতেই ৭৫ শতাংশ জমি এখন চলে এসেছে। ভারতবর্ষের আর কোনো রাজ্যে এটা আসেনি। তার কাছে যেটুকু সেচ, যেটুকু উন্নত বীজ পৌঁছে দেওয়া গেছে, তাতে পাঞ্জাব, হরিয়ানাকে হারিয়ে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হারের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম স্থানে চলে গেছে পশ্চিমবাংলার কৃষক। এটা আমরা বলবো না ? আমাদের বিকল্প নীতির এই সুফলের কথা বলবো না ? তাই কৃষকের হাতে একটু কেনার অর্থ এসেছে, অর্থ এসেছে বলেই তারা শিল্পজাত পণ্য চাহিদা করছেন, আর করছেন বলেই আমাদের রাজ্যের মূল শিল্পের বাজারটা রাজ্যের মধ্যে হচ্ছে বলেই শিল্পায়নের পরিবেশ আগের থেকে একটু উন্নত হয়েছে। আগে যেখানে বড়-মাঝারি শিল্পে পাঁচশো কোটি টাকার মত বিনিয়োগ হতনা, এখন ২০০০ কোটি টাকার মত হচ্ছে। কিন্তু সেখানে কর্মসংস্থান বেশী হচ্ছে না। তাই মূল জোরটা আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের ওপরে যেখানে কর্মসংস্থান হবে। আমি এই সুযোগে বলি রাখি, চালু ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা সারা দেশের তুলনায় আমাদের রাজ্যে কিন্তু অনেক বেশী হারে পাচ্ছে। এই কাজ যখন আমরা করতে চলেছি তখন একে ধরে রাখার জন্য যে পরিকাঠামোগুলি লাগবে, তার মধ্যে সামাজিক পরিকাঠামো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি অন্য পরিকাঠামোর মধ্যে প্রবেশ না করে মূলত শিক্ষায় প্রবেশ করছি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি আমাদের এই উন্নতি ধরে রাখতে হয়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। শুধু সাক্ষরতার মারফৎ নয়, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার দ্বারা নয়, মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার প্রসার করতে হবে। এ একটা বড় মাপের কাজ। আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। আমি গতকালকে বাঁকুড়ার একেবারের প্রত্যন্ত এলাকায় একটি কাজে গিয়েছিলাম—সেই সমীক্ষা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা করছিল—সেই গ্রামের দরিদ্র বাড়িতে প্রবেশ করেও দেখেছি ১০০ ভাগ মানুষ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, তারা কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের ঘরের শিশুকে পৌঁছে দিতে চাইছেন। এটা

দশ বছর আগে ছিলনা। এটা খুব আনন্দের খবর। এটা সম্ভব হয়েছে তো সাধারণ মুনষের আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায়। এই সাক্ষরতা কর্মসূচীতে তো শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যে মুহূর্তে এতো শিশু আসছে, তার জন্য শুধু বিদ্যালয় সংখ্যা বাড়াতে হবে তাই নয়, শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতেই হবে। পরিকাঠামোকে উন্নত করতেই হবে। আমরা জানি না? আমি তো শিক্ষক হিসাবেই জানি। যদি সত্যিই একটি শ্রেণীকক্ষে ৪০ জনের বেশী ছাত্র থাকে, ৫০ জন পর্যন্ত ঠিক আছে, তার চেয়ে যদি বেশী হয়, যেখানে বেঞ্চিতে শ্রেণীতে বসতে পারছে না, কি করে একজন সাধারণ শিক্ষক পড়াবেন? যেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এমন হয়েছে যে দুটি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে বিভাজন করেও সম্ভব হচ্ছেনা কি করে পড়াবেন? এই পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষাকর্মী পদ পূরণ করা আমরা মনে করছি এই শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং সর্বস্তরের শিক্ষার প্রসারের কল্যাণকর দায়িত্ব সরকারকেই পালন করতে হবে। এর থেকে আমরা যেন এতটুকু সরে না যাই। খুব পরিষ্কার করে আমরা বলছি, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি বামফ্রন্ট সরকারেরই। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা এবং অন্যত্র মূল দায়িত্ব সরকারের হাতেই থাকবে। রক্ষা করতে হবে। কিন্তু যখনই কাজ আমরা করতে যাচ্ছি—যে ইতিবাচক ধুয়ো উঠেছে সাক্ষরতার কর্মসূচী থেকে শুরু করে সর্বত্র তার জন্যে তো অনেক অর্থের প্রয়োজন। এইখানে আমি সর্বশেষে আপনারা যে দাবীগুলো রেখেছেন সেখানেই আসবো। যখনই বিকল্প নীতিতে আমরা এগিয়ে চলেছি—কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষাতে এই কাজ করতে চলেছি, এগিয়ে চলেছি ঠিক সেই সময় ২৮টি রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার ওপরেও আঘাত হানছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্য থেকেই এবং সব রাজ্য থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার তার করগুলি আদায় করে নিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের তো নিজস্ব জায়গা জমি নেই, ঐ মুষ্টিমেয় কিছু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছাড়া। জায়গা-জমিগুলো তো রাজ্যগুলোতেই। মানুষ তো রাজ্যেই থাকেন। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার টাকাটা পান কোথা থেকে? পান তো রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে, আপনাদের কাছ থেকে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। তাদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর আদায় করে নিয়ে চলে যান। কর আদায় করে নিয়ে চলে গেলেন, কাজগুলি করতে হচ্ছে রাজ্যগুলোকে। শিক্ষায় হোক, স্বাস্থ্যে হোক, রাস্তায় হোক, পরিবহণে হোক, বিদ্যুতে হোক—মূল কাজ করতে হচ্ছে রাজ্যকে। তাই আমাদের বারংবার বক্তব্য ছিল কেন্দ্রীয় করের, যেগুলি মূল কর—আয়কর বলুন, শুল্ক বলুন, তার শুধু ৫০ ভাগ আমাদের দিক, বাকিটা আমরা সামলে নেবো। এখনো ২৯ শতাংশের বেশী আমরা পাইনা। ২০০১-২০০২-এ আর্থিক সংকটের শুরু। আমাদের যা প্রাপ্য ছিল তার থেকে ৮০০ কোটি টাকা কম পাই। গত আর্থিক বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা কম পাই। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো এ বছরে বদলাবে, এ বছর ৮০০ কোটি বা ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা নয়, ২০০০ কোটি টাকা আমরা কম পেতে চলেছি। একাদশ অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের যেটা দিতে বলেছিলেন সেটাও দিলেন না। বন্ধুগণ, একটু মনে রাখবেন, এই রকম ঘাটতি অবস্থায়, শুধু আমরা নয়, প্রত্যেকটি রাজ্যের ওপর একটা আঘাত এসেছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সহায়তাগুলি সেটা সেচের ক্ষেত্রে হোক, অন্যান্য ক্ষেত্রে হোক, আগে অনুদান হিসাবে পাওয়া যেত, এখন ওঁরা ঋণ হিসাবে দেন। ঋণ যখন দিচ্ছেন কত সুদ নিচ্ছেন, সুদের হারটা কতো, ওরাইবা বাজার থেকে কত সুদের হারে টাকাটা তুলছেন? কেন্দ্রীয় সরকার টাকা তুলছেন বাজার থেকে ৬ শতাংশ হারে, হাত ঘুরিয়ে রাজ্য সরকারকে ঋণ দিচ্ছেন ১২ শতাংশ হারে। গ্রামের মহাজন যখন মহাজনী করেন, নিজের টাকায় করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই মহাজনী করছেন রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলির টাকা নিয়ে। অর্থাৎ রাজ্যের ব্যাঙ্কে কার টাকা থাকে,—আপনার টাকা, রাজ্যের মানুষের টাকা ৬ শতাংশ হারে নিয়ে গিয়ে রাজ্য সরকারকে ১২ শতাংশ হারে—এটা কী মহাজনী করছেন? এই মহাজনীর ভার কেন্দ্রীয় সরকার যদি একটু কমায় যদি ১২ থেকে, রাতারাতি অনেক কমাবে আমাদের অতো দুরাশাই নেই। ১২ থেকে যদি ৮ শতাংশও করেন আমাদের সমস্যা মিটে যায়।

আমরা সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে একটি কমিটি করি, রাজনীতির ঊর্ধে উঠে করি। কেন্দ্রীয় সরকারকেও বলি। কিন্তু বন্ধুগণ, এই মূল সমস্যাগুলোর কিন্তু এখনো সুরাহা হয়নি। এইখানে দাঁড়িয়ে এক একটি রাজ্য সরকার এক একটি কাণ্ড করছেন মানে করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রেই। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, খোঁজ নেবেন একটু মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা, বেতন দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। বলছেন অবসরকালীন ভাতা থেকে সরে আসবেন। মহার্ঘভাতা তো দূরস্থান। এই জায়গায় কিন্তু

ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি চলেছে। এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা বামফ্রন্ট সরকার, মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যত আঘাতই আসুক আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আমাদের আর্থিক সমস্যাটা মোকাবিলা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো, চেষ্টা করবো আপনাদের সম্মান জানিয়ে চলতে। এই সম্মান না জানালে শিক্ষায় এই সরকারের কল্যাণকর ভূমিকা থাকবে না। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের নিজস্ব কর আদায়কে বাড়াতে। অনেক বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চলছে। একটা পুরোনো আইন—১৯৭৩ সালে পঞ্চায়েত আইন, সেখানে এইসব ছিল। গৃহপালিত পশুর ওপর কর বসানোর কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। পঞ্চায়েত দপ্তরকে শুধু বলা হয়েছে এই আইনকে আপনারা আলোচনা করতে পারেন, আলোচনা করে রাজ্য সরকারকে জানান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থদপ্তরকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, এই বিষয়টা আলোচনা করুন। কিন্তু গৃহপালিত পশু ইত্যাদি এইসব ব্যাপারের ওপর কর কোনোদিন আপনারা বসাবেন না। সাধারণ কৃষক, সাধারণ গ্রামবাসীর ওপর কোনো নতুন কর বসাবেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রের বিক্রয়কর ইত্যাদির কর ফাঁকিগুলো বন্ধ করে কর আদায়টা একটু উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সেখানে দাঁড়িয়ে যে যে দাবী দাওয়াগুলো আপনারা রেখেছেন এবং মূলত তিনটি দাবীর ক্ষেত্রে আপনারা আরও নির্দিষ্টকরণ করেছেন, এটা করে ভালো করেছেন, আমার বলতে সুবিধা হবে। আমি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মাননীয় নেতৃত্বকে আবার ধন্যবাদ দেব যে এটা ঠিকই বলেছেন, আমরা গত ৭/৮ মাসে তিনবার বসেছি—কি করতে পারছি আর কি করতে পারছি না এসব নিয়ে। অনেক খুটিনাটি বিষয় আছে। ভবিষ্যতেও আমাদের বসতে হবে।

প্রথম একটি দাবী রেখেছেন, আমি সেইভাবে বলছি যে, শিক্ষাকর্মী যেখানে পদ সৃষ্টি হয়ে আছে, তারা অবসর নিয়েছেন সেখানে পদপূরণের ক্ষেত্রে,—হ্যাঁ, বিধিনিষেধ এগুলো ছিল। তাতে খুব সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো বিদ্যায়তনে একটিও কর্মী নেই এরকম দেখা দিয়েছে। একথা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বও বলেন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও আমরা দুজনে এটা নিয়ে আলোচনা করি। আপনারা বলেছেন যে এর ওপর যে বিধিনিষেধ আছে, কথা প্রসঙ্গে বলেছেন যে নিষেধের অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ হলেও আপনারা তুলে দিন এবং সেটায় সম্মতি প্রদান করুন। না, বন্ধুগণ আমরা ৫০ শতাংশ পারছি না, আমরা ৬০ শতাংশ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানেন এই ৬০ শতাংশ বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে শিক্ষাদপ্তরের কাছে এই নথিটি এক মাস আগে অর্থদপ্তর পৌঁছে দিয়েছে। শিক্ষাদপ্তরও খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। আমাদের মন্ত্রীপর্যায়ের একটি কমিটি আছে। সেখানে সেটি নৈমিত্তিক সইয়ের অপেক্ষায় আছে, আগামী ২৪ তারিখে হবে। কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত দুই দপ্তর যখন সহমত হয়ে যায় বাকি থাকে নৈমিত্তিক বিষয়। আমি খুব পরিষ্কার করেই বলে দিলাম। দ্বিতীয় একটি বিষয়, সেটি অবসরকালীন ভাতাকে কেন্দ্র করে। সারা দেশের পরিস্থিতি আমি আগেই বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকার খোদ তাদের সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে অবসরকালীন ভাতার ওপর তারা আঘাত হানতে চলেছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আঘাত হানতে চলেছেন। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এদের কথাতো চলেই এসেছে।

আমরা মনে পড়ে ২০০১-২০০২ সালে যখন মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া যে কেসগুলি আছে, আমি বকেয়া বলছি রাজ্যের অর্থদপ্তরে যখন আসে, সেটা অনেকটা জমে গিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত জমে গিয়েছিল। তখন আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিই, আলোচনা করে নিই আমাদের যে কর্মী সংগঠনগুলি আছে, যে এই একটি ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করবো। তাড়াতাড়ি যাতে এর নিষ্পত্তি করা যায়। তাতে সত্যি আমরা লক্ষ্য করলাম, কয়েক মাসের মধ্যে ৪৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী যারা অবসর নিয়েছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যে সেই নিষ্পত্তির পর পি পি ও, পেনশনের যে নির্দেশ সেটা আমরা বন্টন করে দেওয়ার জায়গায় চলে গেলাম। আমি খুব খোলাখুলি আপনাদের বলছি। ৪৫ হাজার মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের যে অবসরকালীন ভাতা এক বছরে, যেটা এক একটা বছরে গড়ে ১০/১২ হাজারের মতো নিষ্পত্তি হয়ে আসছিল আমরা আর্থিক দিক থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু ওটা সেই বছর ২০০১-০২ সাল যেখানে ৮০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেলাম না। তার পরের ঘাটতি, তার পরের ঘাটতি বললাম। তখন আমরা তাই বললাম যে অবসরকালীন ভাতার মূলত তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম, তিনি যখন অবসর নিচ্ছেন, তার শেষ মাসের যে মূল বেতন, তার শতকরা ৫০ ভাগ মূল পেনশন সেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। একটা হচ্ছে গ্র্যাচুয়িটি মানে সাড়ে ষোল মাসের বেতনের সমান,

যার সর্বোচ্চ হচ্ছে আড়াই লক্ষ টাকা কিংবা আর একটু কমও হতে পারে। সেটি এবং কমিউটেড ভ্যালু অব পেনশন, যে অবসরকালীন ভাতা তিনি পেলেন, তার শতকরা ৪০ ভাগ তিনি আগে নিতে পারেন, এই দুটি আমরা তক্ষুনি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। আমরা বললাম, এর মধ্যে যে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী যারা খুব দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন অথবা তার বাড়ীতে মেয়ের বিবাহ একেবারে কাছে এসে গেছে, আমরা সেই ক্ষেত্রে এই মূল বেতনের অবসরকালীন ভাতার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুটিরও নিষ্পত্তি করে দেবো। আমি এখানে আসার আগে সর্বশেষ তথ্যটি আবার একটু যাচাই করে নিলাম। এই ৪৫ হাজারে আমরা যেটা শুরু করেছিলাম এবং তারপরে যেগুলো এসেছে তাতে আপনারা লক্ষ্য করবেন, তারপর থেকে কিন্তু ঐ যে প্রথমটি অর্থাৎ অবসর নেওয়ার পরেই বেতনের ৫০ ভাগ পাওয়া এটা কিন্তু প্রায় নিয়মিত হয়ে গেল। আর বেশী পড়ে থাকছে না। এখন গড় হিসাবে দেখা যাচ্ছে দু মাসের মধ্যে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তার আগেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে। আরও এই ৪৫ হাজারের মধ্যে সেই অসুখ অথবা মেয়ের বিয়ে এই ক্ষেত্রেও ৫ হাজারের মত আমরা নিষ্পত্তি করতে পেরেছি। কিন্তু বাকিটা পড়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা যেটা পারবো সেটা আপনাদের বলছি, আমরা ঠিক করলাম এভাবে বকেয়া রাখা চলবে না। তাই বস্তুত ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বাকি দুটি ক্ষেত্রে, প্রথমটা তো লাগু হয়েই আছে, পঞ্চাশ শতাংশ তো পেয়ে যাচ্ছেনই, ৯৮ শতাংশ গ্র্যাচুয়িটি এবং কমিউটেড ভ্যালু অব পেনশন এগুলো সমস্তই নিষ্পত্তি হয়ে আছে। ১৯৯৯-২০০০ সাল, দুই বছর করে ধরছি, একসঙ্গে সবটা, বন্ধুগণ আমরা এই মুহূর্তে বলার জন্য প্রস্তুত নই, কিন্তু ১লা এপ্রিল অর্থাৎ আগামী বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৯-২০০০ এই দুই বছরে সেটা কিন্তু ৪৫ থেকে যদি ৫ হাজার বাদ দেন, ৪০ হাজারের তিন ভাগের এক ভাগ সাধারণভাবে আমি দেখলাম যে আগামী বছরের মধ্যে বাকি দুটি সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি করতে পারবো। এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার পরে যে অংশটা বাকি থাকছে পরের কিস্তিতে আমরা সেগুলিরও নিষ্পত্তি করতে চাইছি। আমি বলছি যে এখন সরকারের যা আর্থিক অবস্থা তার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা এটুকু চিন্তা করতে পারছি। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করছি এই আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে, নিজেদের ক্ষমতার ওপরেই দাঁড়িয়ে করতে হবে। ঠিক যে যে উন্নতিটি হবে আমরা কিন্তু সেইভাবেই এই সুযোগটা আরও বৃদ্ধি করবো। সর্বশেষে মহার্ঘভাতা, নতুন এই আর্থিক সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েই তো একটা সময়ের ব্যবধানে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এবং অন্যান্য সংস্থায় মহার্ঘভাতাটা ১লা জানুয়ারী থেকেই দিতে হল। এটা শিক্ষক হিসাবে আপনার যন্ত্রণা আমি আমার বুকের মধ্যে গ্রহণ করছি। এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা একটা বক্তব্য রেখেছেন যে আপনারা তো বললেন ১লা জানুয়ারী, কিন্তু সেটা হাতে পাচ্ছি কোথায় ?

আমি সর্বশেষে বলি যে, নিয়ম এই যে সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা সরকারী সাধারণ নির্দেশ শিক্ষাদপ্তরকে জানাই, শিক্ষাদপ্তর তারপর তাদের দাবীটা জানান, সেই দাবীটি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, আমরা এখন থেকে ১২ দিন আগে শিক্ষাদপ্তর থেকে সেটি পাই। আমি আপনাদের বলছি এখন থেকে ঠিক ৫ দিন আগে সে নথিটি মুক্ত করে আমি শিক্ষাদপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এই ফেব্রুয়ারীর বেতনের সঙ্গে আপনারা জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—এই ২ মাসের মহার্ঘভাতা পেতে শুরু করবেন। সেটা অর্থদপ্তর থেকে মুক্ত করে দিয়েছি। আমি আবারও বলছি, আর্থিক অবস্থার যেভাবে যেভাবে উন্নতি হবে, যেখানে যেখানে অন্য অসুবিধা আমরা পাইনি, আমি তো খোলাখুলিভাবে বলবো। কারণ একদিকে তো সাধারণ মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের প্রকল্পগুলি অব্যাহত রাখতে হবে, সেগুলো তো রাখতেই হবে কারণ আপনারা বেশিরভাগ সদস্যই যুক্ত এবং শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে এইভাবে আমরা করে চলবো। যখন চালিয়ে যাচ্ছি, মনে রাখবেন বন্ধুগণ, আঘাতটা কিন্তু শুধু আর্থিক বিষয়েই নয়, তার মোকাবিলা করার কথা আমি তো বললাম। মূল আঘাত আসছে রাজ্যের কল্যাণকর ভূমিকার ওপরে। আসছে কিন্তু শিক্ষায় সরকার থাকবে কি না, তার বিরুদ্ধে আমাদের এক হতে হবে। শিক্ষা পণ্য নয়, আমি শিক্ষক হিসাবে ছাত্রকে তখনই পড়াতে পারবো যদি আমি ছাত্রকে ভালোবাসি। তার পরে তো পড়াবো। যদি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী হয়, সেটা থাকে না। সেটা আমরা ঢুকতে দেবো না। সেই মূল আন্দোলনে জানবেন আপনাদের পাশে শিক্ষক হিসাবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে সকলে এবং সরকার হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের সম্পূর্ণভাবে ছিল এবং থাকবে। আপনাদের দাবী দাওয়ার সমস্ত নিয়েই আমরা একত্রিত থাকবো। আমরা কিন্তু একই নৌকার যাত্রী। এই কতগুলো কথা বলে সকলকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অনুলেখক ঃ বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ রাণী রাসমণি এভিনিউতে কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ডেপুটেশনে মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাসের ভাষণ

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে আহুত এই সভার সভাপতিমণ্ডলী, মন্ত্রীসভার আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত এবং আমার শ্রদ্ধেয় অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ,

আমি প্রথমেই পুনর্বার আমার পক্ষ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলায় আচার্য শক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি! এটা ২০০৪ সাল। আজকে তারিখ ১৬ই ফেব্রুয়ারী। আমি বাংলার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করবো স্মরণ করুন আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর আগের ঘটনা। ইংরাজী ১৯৫৪ সাল, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, এরই পাশের এস্‌প্ল্যানেড ইষ্ট। সেখান থেকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মিছিল বিধানসভায় রওনা হয়েছিল। দাবী ছিল সামান্য,—শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন ২০০ টাকা দিতে হবে। পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের অল্পসংখ্যক বিদ্যালয় আর্থিক সাহায্য পেত। বাকী বিদ্যালয়গুলি কোনো সাহায্য পেতনা। তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এই রকম কিছু দাবী নিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তারা রওনা হয়েছিলেন। তখন বিধানসভার অধিবেশন চলছে। বিধানসভার সামনে গিয়ে বাংলার আচার্য শক্তি বাংলার শিক্ষার অঙ্গনকে প্রসারিত করবার জন্যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ন্যূনতম ২০০ টাকা মাসিক বেতন দিতে হবে—এই দাবীতেই তারা রওনা হয়েছিলেন। এসপ্ল্যানেড ইষ্টের বাঁদিকে যে জায়গা আছে, সেই জায়গায় মিছিল যাওয়ার পরে সেখানে পুলিশের গুলি চলে, ৭ জন নিহত হন। অগনিত মানুষ আহত হন। বাংলার মস্‌নদে তখন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পুলিশের গুলিতে ১৯৫৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, এখন থেকে ঠিক ৫০ বছর আগে কলকাতার রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছিল, লাল হয়েছিল। শিক্ষকদের দাবীকে, শিক্ষাকর্মীদের দাবীকে ভাঙবার জন্যে এই ঘটনা ঘটেছিল। আমি আজকের এই সমাবেশ থেকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেইখানে যারা নিহত হয়েছিলেন, যারা আহত হয়েছিলেন, যারা নিগৃহীত হয়েছিলেন বাংলার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার দাবীকে আদায় করবার জন্যে। আপনাদের স্মরণ করতে বলবো ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ সাল। এই ধরণের আক্রমণ হলো।



১৭ই ফেব্রুয়ারী সারা রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট ডাকা হলো। বিধানসভার অধিবেশন চলছে। বিধানবাবু, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ জারী করলেন তিনজন বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। তিনজন বিধায়ক ঃ একজনের নাম জ্যোতি বসু, দ্বিতীয় জনের নাম রণেন সেন এবং তৃতীয় জনের নাম হেমন্ত ঘোষাল। এই তিনজন বিধায়ককে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরবার জন্যে বিধানবাবুর সরকার, রাজ্যের কংগ্রেস সরকার আদেশ জারী করলেন। এই তিনজন বিধায়ক বললেন, আমরা বিধানসভা থেকে বাইরে যাবোনা। যেহেতু বিধানসভার মধ্যে পুলিশ ঢুকে কোন বিধায়ককে গ্রেপ্তার করতে পারেনা সেজন্যে জ্যোতি বসু, রণেন সেন এবং হেমন্ত ঘোষাল বিধানসভার মধ্যেই তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। তারা বাইরে বের হোননি গ্রেপ্তারকে এড়ানোর জন্য। বাংলার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের, শিক্ষাপ্রিয় মানুষের দাবীকে সমর্থন করবার জন্যে তিনদিন তারা বিধানসভায় অবস্থান করেছিলেন। সারা ভারতের ইতিহাসে এই কলঙ্কিত ঘটনার আর কোনো নজির নেই। আমি আপনাদের স্মরণ করতে বলবো। ১৯৫৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকায় প্রকাশিত

হলো স্বাধীন ভারতবর্ষের বাংলায় দাঙ্গাবাজদের দমন করবার জন্যে সরকার গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মিছিল, তার ওপর পুলিশের গুলি চললো আর ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ সাল নিউইয়র্ক টাইম্স তাদের কাগজে হেডিং করলো পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গাবাজদের রোখবার জন্য পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ তার পরের দিন বিখ্যাত ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ রাজ্যসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এখানকার সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর জন্য, বাংলার শিক্ষার অঙ্গনকে প্রসারিত করবার জন্যে, শিক্ষার সুযোগকে সম্প্রসারিত করবার জন্যে ৭টি দাবী আর শিক্ষকদের দাবীকে তুলে ধরবার জন্যে। সমস্ত প্রতিনিধিই এক সাথে দাবীকে সমর্থন করেন এবং সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন এবং ভোটাভুটি হয়। কংগ্রেসের ২৫৯টি ভোট বিপক্ষে যায়, ৬৬টি ভোট এই প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে। রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে ১৮ই ফেব্রুয়ারী একটি বিশেষ দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকলো। শিক্ষার সুযোগের দাবীতে, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বাঁচার দাবীতে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাব ভারতের সংসদের উচ্চতর কক্ষসভা, রাজ্যসভায় ২৫৯টি ভোট পড়ার ফলে তারা পরাজিত হলো। এই কথাও আপনাদের স্মরণ করবার জন্য বলবো। আজকে সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সন্তুষ্ট নই। যা বাংলার বুকে করবার ইচ্ছা আমাদের ছিল, তা সবটা না করার বেদনা আমাদের দুঃখ দেয়।

এটা ঠিক, অনেক সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি। ২০ শতাংশ বিদ্যালয় তখন সরকারী সাহায্য পেত। এখন বলা যেতে পারে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৭ শতাংশ বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পায়। আর্থিক সাহায্য পায়। ২০০ টাকা মাসিক বেতনের দাবীতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে আন্দোলন করতে হয়েছিল। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই, ১৯৮১ থেকে ১৯৯৮ সাল—মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন গড়ে ২৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ২৪ শতাংশ নয়। তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে আমি দাবী করতে পারি সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক দেশে হোক, গণতান্ত্রিক দেশে হোক—এই সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের বেতন ২৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে একমাত্র এই ভাঙা বাংলায়। একমাত্র দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের বাংলা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা এই পশ্চিমবাংলা। বেতন ভাতার এই আর্থিক সুবিধা সারা পৃথিবীতে আর কোনো দেশে হয়নি যা পশ্চিমবঙ্গে আমরা করেছি। এতেও আমরা সন্তুষ্ট নই। যারা মানুষ গড়ার কারিগর তারা যদি সমাজ থেকে মর্যাদা না পায়, সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে মানুষ গড়বার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এই তত্ত্বকে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।

আজকের কেন্দ্রীয় সমাবেশে অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় কিছু কথা উল্লেখ করেছেন। যে আর্থিক বছরে আমরা আছি এই আর্থিক বছরে মাধ্যমিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন ও ভাতা বাবদ আমাকে মাসে ১৮২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। হ্যাঁ শুধু মাধ্যমিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য ১৮২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। শিক্ষা যেখানে সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করে সারা বছর ২৭৪ কোটি টাকা। অবিশ্বাস্য মনে হবে কিন্তু একথা নিষ্ঠুর সত্য, কেন্দ্রীয় সরকার গোটা ভারতবর্ষের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সারা বছরে বরাদ্দ করেছে ২৭৪ কোটি টাকা, আর পশ্চিমবাংলায় শুধু মাধ্যমিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন বাবদ আমাদের মাসে ব্যয় করতে হয় ১৮২ থেকে ১৮৬ কোটি টাকা। কিন্তু আমরা তো জানি আমাদের আরো অধিক অর্থ বরাদ্দ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর্থিক সংকটের কথা আমাদের অর্থমন্ত্রী এখানে উল্লেখ করেছেন তাই সে আলোচনায় যেতে চাইছি না। দাবী আমাদের আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব পূরণ করবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এ আমাদের অঙ্গীকার। এখানে পেনশনের কথা বলেছেন—মাধ্যমিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী আর প্রাথমিক শিক্ষক সব মিলিয়ে বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সরকারী তহবিল থেকে পেনশন পাচ্ছেন। সারা পৃথিবীতে নজীর নেই। আমাদের রাজ্যের জনসংখ্যা ৯ কোটির কম। ৯ কোটির কম মানুষ যেখানে বসবাস করেন সেখানে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য সরকারী তহবিল থেকে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার মানুষকে পেনশন দেওয়া হয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের। এ নজীর কোথাও নেই। এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজারের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা ৬৩ হাজার। ৬৩ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীকে নিয়মিতভাবে আমরা পেনশন দিচ্ছি। কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির কোনো জায়গা নেই। আমি ব্যথিত, দুঃখিত এখনো মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী যারা ২০০০ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে অবসর নিয়েছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আর কাউকে কমিউটেশনের টাকা, গ্র্যাচুয়িটির টাকা

দেওয়া যায়নি। পেনশনের টাকা দেওয়া গেছে বটে কিন্তু এই টাকা দেওয়া যায়নি। আমরা বাংলার শিক্ষক সমাজের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, এই টাকা আমরা দেবো, আর্থিক সংকটের জন্য কিছুটা হয়তো দেরী হচ্ছে, অর্থমন্ত্রী সেটা বুঝিয়ে বলেছেন। আমাদের চেষ্টা করতে হবে কত দ্রুত এই অসুবিধাগুলোকে আমরা দূরীভূত করতে পারি।

আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর দায়িত্ব অভিন্ন। শিক্ষাকর্মীদের দায়িত্ব কম নয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করবার জন্যে, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে শিক্ষক সমাজের যেমন ভূমিকা আছে, একই ভাবে ভূমিকা আছে শিক্ষাকর্মীদেরও। এইজন্য শিক্ষাকর্মীদের প্রতি আমাদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া উচিৎ। এ প্রসঙ্গে দ্বিমত নেই। অনিবার্য কারণে গত দুই বছর বা আড়াই বছর শিক্ষাকর্মীর পদ পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। অসীমবাবু যে কথা বললেন—অর্থদপ্তর থেকে সম্মতি জানিয়েছেন। প্রায় ৮ হাজার শিক্ষাকর্মীর পদ শূন্য। তার ৬০ শতাংশ শিক্ষাকর্মীর পদ পূরণ করবার জন্যে অর্থদপ্তর থেকে সম্মতি জানিয়েছেন। আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আমাদের মন্ত্রীসভার অধীন যে ছোট কমিটি আছে, সেখান থেকে পাশ হয়ে যাবার পরে এই শিক্ষাকর্মীদের শূন্য পদগুলি পূরণ করবার জন্যে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করবো। ইতোমধ্যে শিক্ষাকর্মীর অভাবের জন্যে বহু বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ব্যাহত হয়েছে। অনেক শিক্ষক অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন, অনেক শিক্ষাকর্মীর কাজের বোঝা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীব দুঃখের বিষয়, কিছু অনিবার্য কারণে এই কাজ করতে হয়েছে। সেজন্যে আমরা অবশ্যই শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করবো।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করার নিশ্চয় আমাদের প্রয়োজন আছে—বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ বা স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হয়। এই ব্যবস্থা গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবাংলাতেই হয়। আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে, আমারও কিঞ্চিত অভিজ্ঞতা আছে—বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অনেক শিক্ষক পদপ্রার্থীদের যে অসম্মানজনক অবস্থার মধ্যে পড়তে হতো, অমর্যাদাকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হতো সে কথা আপনারা সকলেই জানেন। তার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে, যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করবার জন্যে ১৯৯৮ সালে আমরাই চালু করি বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ। ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। এমন কোন রাজ্য নেই যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে



চিঠি পাঠায়নি। তাদের বক্তব্য—আমরা আমাদের রাজ্য চালু করতে পারিনি, আপনারা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে চালূ করতে পেরেছেন, অভিনন্দনযোগ্য। আমরা এখন পর্যন্ত পারিনি, চেষ্টা করছি পশ্চিমবাংলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে। আজকে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক পশ্চিমবাংলায় কাজ করেন। এর মধ্যে ৪০ হাজারের বেশী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগের মাধ্যমে।

কোনো প্রকার অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় না দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে এই পদে তারা নিযুক্ত হয়েছেন। মর্যাদা নিয়ে শিক্ষকতা করতে পারছেন এটা আমাদের কাছে গৌরবের বিষয়। আপনাদের স্মরণে থাকতে পারে, আমাদের সরকারের আমলে একবার নিয়ম হয়েছিল পুলিশের রিপোর্টে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও চাকরী যাবে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির এক সময়কার সাধারণ সম্পাদক অরুণ চৌধুরী, এস টি ই এ-র সভাপতি বীণা চৌধুরী তাদের চাকরী গিয়েছিল পুলিশের রিপোর্টে। যদি কোন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ

গোপন রিপোর্ট দেয় তাহলে তাদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে। এই ছিল বাংলার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের চাকরীর নিরাপত্তার অবস্থা। আজকে তার কোন সুযোগ নেই। মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে, চাকরীর নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করবার যে সুযোগ সেই সুযোগ আমরা এখানে সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

এখানে শ্রীমতী মিত্রা ভট্টাচার্য্য ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, কেন প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজী প্রবর্তন করা হলো। জনতার সুপারিশ, বারেবারে একথা বলেছি, পশ্চিমবাংলার শিক্ষা সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত সরকারী আমলাতান্ত্রিক কায়দায় গ্রহণ করেনি। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ, তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক সমাজের আলোচনার ভিত্তিতে মতামতকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় কমিটির সুপারিশ এটা করেনি কিন্তু পবিত্র সরকার কমিটির সুপারিশে এটা ছিল। তার ওপর ভিত্তি করে সরকার যে সমীক্ষা চালায়, তাতে জানা গেছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য যথেষ্ট পরিমাণে সফল। ইংরাজীর ভীতি থেকে যাতে পশ্চাদ্‌পদ অংশের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসবার ক্ষেত্রে ভীতি আর না পায়, তাদের সামনে বাধা সৃষ্টি না হয়, সেজন্যেই শিক্ষাকে সার্বজনীন করার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী তুলে দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ করেছিলাম, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো হয়না। সারা বিশ্বের অঙ্গন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সুপারিশের উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আজকে বিনম্রভাবে বলতে পারি পশ্চিমবাংলায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষক, সর্বোদয়ের প্রাথমিক শিক্ষক বলা যেতে পারে পুরোপুরি প্রায় কার্যকরী। সারা পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সের মাত্র চার লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে, আর সকলকে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এই জন্যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজীকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যে আমরা মোটামুটি সফল। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের কথা যতটা এর বিরুদ্ধে যতই নিন্দা করা হোক না কেন, উষ্মা প্রকাশ করি না কেন, বিশ্বায়নের দাপটের কথা আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। আজকে দেশের সীমারেখা প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে সে কথাকে আমাদের মনে রাখতে হয়। তাই বলি ইংরাজীর প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা অনুভব করেছি। কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে কখনো কোন বিতর্ক থাকবেনা তা কখনো হতে পারে না। যারা এখনো মনে করেন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী পড়ানো ঠিক নয়, তাদের বক্তব্যকে আমরা নস্যাৎ করি না।

আমরা বলি মতপার্থক্য যখন আছে একটা মত অনুসারে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামীদিনে পর্যালোচনা হবে, পরীক্ষা হবে, আলোচনা হবে, আলোচনাকালে যদি প্রয়োজন হয় তবে সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন হবে। শিক্ষা সম্পর্কে কেউ বলতে পারেনা, এটাই আমার শেষ কথা। আজকে যেটা বিধিসম্মত, আগামীকাল তাকে পরিবর্তন করতে হতে পারে, পরিমার্জন করতে হতে পারে। সে জন্যেই সে কথা আমি সরকারের পক্ষ থেকে আমরা নিবেদন করতে পারি।

আমলাতান্ত্রিকতার কথা, হ্যাঁ, আমলাতন্ত্র আছে। আমরা বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারি সোভিয়েতে ১৯১৭ সালে বিপ্লব হয়েছিল, স্তালিন তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে স্তালিন বলেছিলেন, আমলাতান্ত্রিক বাধা বিভিন্ন কাজে আমাদের বাধা দেয়। আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা সেই সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিকতা একটা বাধা। কিন্তু আমলাতন্ত্র ব্যতীত কোন প্রশাসন যন্ত্র হতে পারেনা। ভয়ঙ্কর অসুবিধা আছে। ট্রান্স-ইন্টারন্যাশনাল কয়েকদিন আগে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সারা পৃথিবীতে সমীক্ষা চালিয়ে। ১৩৩টি দেশে। কোন্ দেশে। কতখানি দুর্নীতি, প্রশাসনিক ঢিলেমী, সে সবকে অনুভব করবার জন্য, চিহ্নিত করবার জন্য। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাওয়া গেছে যে সব থেকে খারাপ অবস্থা হচ্ছে ১৩৩ নম্বর দেশ, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ। সবথেকে ভালো অবস্থায় আছে সুইডেন, এক নম্বরে আছে। আমাদের ভারতবর্ষের স্থান ৭৮তম। ১৩৩টি দেশের মধ্যে ৭৭টি দেশ আমাদের উপরে। বাকি দেশগুলো আমাদের নিচে। এইজন্য এখানে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, দীর্ঘসূত্রতা এবং আমলাতান্ত্রিকতা এইসব থেকে আমরা মুক্ত নই। পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের বাইরে নয়। পশ্চিমবাংলা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ নয়, সীমাবদ্ধ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে, অভিন্ন একটি পরিকল্পনার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষ যে দায়িত্ব এই সরকারের ওপর অর্পণ করেছে সেই দায়িত্ব আমরা নিপুণতার সাথে পরিচালনা করতে চাই।

আপনাদের দাবীর মধ্যে একটি কথা আছে—অনেক প্রবীণ শিক্ষক পরবর্তী সময়ে নিয়োগ হওয়া শিক্ষকের থেকে অনেক কম পান। আমি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক হিসাবে মনে করি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। বিদ্যালয় পরিমণ্ডল ক্ষুণ্ণ হয়। আমি

অর্থদপ্তরের কাছে বলেছি, এই ব্যবস্থার ফলে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটাকে যে কোনো ভাবে পরিবর্তন করতে হবে। আপনারা যথার্থ ভাবেই বলেছেন।

একই ভাবে মাদ্রাসার জন্য কিদোয়াই কমিটির সুপারিশকে কার্যকরী করার কথাও বলেছেন। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাসাকে সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই আছে। সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। সারা ভারতবর্ষের কোথাও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মিগণ পশ্চিমবাংলার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মত বেতন পায় না। ভারতবর্ষের কোথাও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মিগণ পেনশন পান না। একমাত্র পশ্চিমবাংলাতেই পান। আমাদের সরকার হওয়ার পরে মাদ্রাসার শিক্ষকদের এই সম্মানজনক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৭ সালের আগে পশ্চিমবাংলার মাদ্রাসার শিক্ষকও এই সুযোগ পেতেন না। কখনো কখনো কেউ কেউ মাদ্রাসার সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতেন। আমরা বিনয়ের সাথে বলতে চাই, মাদ্রাসার শিক্ষাকেও আধুনিকীকরণ করবার জন্য, বিজ্ঞানভিত্তিক করবার জন্য, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পরিচালিত করবার জন্য কিদোয়াই কমিটির যে সুপারিশ তাকে আমরা পালন করবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং পালন করে চলেছি। সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট কোনো কোনো পক্ষ সেই কমিটির সুপারিশকে বাতিল করবার দাবী করেছেন। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই কিদোয়াই একজন শিক্ষাবিদ্, নামকরা শিক্ষাবিদ্, পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল, রাজ্যসভার সদস্য। তার সাথে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, তারা সর্বসম্মতভাবে কমিটির সুপারিশ আমাদের কাছে পেশ করেছেন। সমস্ত প্রকার সাম্প্রদায়িক উস্কানীকে উপেক্ষা করে সেই প্রতিবেদনকে আমরা যথোচিতভাবে কার্যকরী করবো।

আপনারা যথাযথভাবে বলেছেন, বাংলাভাষার দাবীতে সরকারী কাজকর্ম কেন পরিচালিত হবে না। আমি তো ১৯৭৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘদিন মন্ত্রীসভায় আছি। সবথেকে বেশীদিন। এতোদিনেও মন্ত্রীসভায় থেকে আমি আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ২৫-২৬ বছর একটি কথাও ইংরাজীতে লিখিনি। সেটা বড় কথা নয়। আমি কোন কথা ইংরাজীতে লিখিনা। কিন্তু আমাদের সরকারী বিভাগের, শিক্ষা বিভাগের কাজকর্ম কেন বাংলায় হবে না, আমি অর্থদপ্তরের কাছে প্রস্তাব রেখেছি। যদি যাবতীয় কাজকর্ম বাংলায় করতে হয়— কত টাইপ রাইটার লাগবে, বাংলায় টাইপ করতে পারে এমন কতজন আমাদের কর্মচারী লাগবে, এই তথ্যও সেখানে পাঠিয়েছি। বারে বারে একই কথা বলছি, আর্থিক সংকটের জন্য সম্ভব হচ্ছে না, যখনই সুযোগ আমাদের কাছে আসবে তা পালন করবার চেষ্টা করবো। এখন কিছু কিছু আদেশনামা আমরা বাংলায় প্রকাশ করি। কিন্তু যেগুলো বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না, আমরা বিশ্বাস করি কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলি বাংলায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করবো।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যথোচিতভাবে অনুপ্রাণিত করা গ্রন্থাগারিকদের একটা পবিত্র কর্তব্য। আর বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন, যার সাথে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম যুক্ত আছে, যিনি আমাদের বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত বাংলার দুর্বার আন্দোলনে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা থেকে শিক্ষা নেওয়া অনস্বীকার্য। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু কিছু বিষয়ে দাবী আছে আমরা সমিতির সাথে আলোচনা করে সেগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা হতে পারে সে চেষ্টা আমরা অতি অবশ্যই করবো।

শিক্ষার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছুটির বিধিতে কিছু ত্রুটি আছে, আপনাদের যে ছুটির বিধি আছে তার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে, কিছু শূন্যতা আছে, কিছু বিভ্রান্তি আছে। ১৯৯৮ সালে বেতন সংশোধনীয় আইন প্রকাশ হওয়ার পরে যখন ছুটির আইন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু বিভ্রান্তি থেকে গেছে। যে ছোটোখাটো বিভ্রান্তি আছে সেগুলোও মীমাংসা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিশ্চয়ই নেওয়া হবে।

ট্রেজারীতে আপনাদের ভবিষ্যনিধির টাকা গচ্ছিত রাখার কথা আছে। এই অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা রাখবেন। বিদ্যালয় ভিত্তিক আইন বিদ্যালয় ভিত্তিতেই হিসাব হবে। এবং সেখান থেকে যাতে নিয়মিত সুদ পেতে পারেন তার দিকেও সরকারের ভূমিকা মোটামুটি ভালো। আমরা সামান্য হলেও যে অসুবিধাগুলো আছে তা দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা করবো।

মহার্ঘভাতার বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলে গেলেন, এই বিষয়ে নথি কয়েকদিন আগে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। আমরা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করবো। আমরা আদেশ জারী করবো যাতে ফেব্রুয়ারী মাসের বেতনের সাথে সাথেই এই মহার্ঘভাতা আপনারা হাতে পান। চেষ্টা করা হবে যাতে জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী এই দুই মাসের মহার্ঘভাতাই একসঙ্গে দেওয়া যায়। আমরা আপনাদের কাছে বিনীতভাবে

বলতে পারি, একটু আগেই আপনাদের প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের সচিব কুমুদ বংশাল আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে বিশ্বায়নের সাথে ভারতবর্ষের শিক্ষা বিষয়ে তারা চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ইতিমধ্যে রাজস্থানে ১০টি বিদ্যালয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাথে এফিলিয়েটেড হয়েছে। এই রকম দুর্দিন যদি আসে পশ্চিমবাংলায় যদি ১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেম্‌ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় বা আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমোদন নেয়, অবাক হবার কিছু নেই। কুমুদ বংশাল আমাকে জানিয়েছেন, আপনারা যতই এগুতে থাকুন না কেন কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—এখানে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও ডব্লিউ টি ও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীন যে চুক্তি হয়েছে, সে চুক্তির সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ। এবং বিভিন্ন রাজ্যে অগনিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তারা সবাই বিদেশী বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। আর আমাদের এখানে সবকটি বিদ্যালয় যদি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে তাহলে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ওখানে চলে যাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র পাওয়ার জন্য ছাত্ররা চলে গেলে আমাদের বিদ্যালয়গুলো এমনিতেই দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে এই সব বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক মশাইরা চাকরী করেন, তাদের চাকরীও শর্তসাপেক্ষে করতে হবে। আপনি বেতন কম পেতে পারেন, মহার্ঘভাতা পেতে বিলম্ব হতে পারে, গ্র্যাচুয়িটির টাকা পেতে অসুবিধা হতে পারে, পেনশন পেতে অসুবিধা হতে পারে কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে শুধু কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখী হয়ে যাবে। ফলে যে সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সচেতন থাকতেই হবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে আজকে আন্তরিকভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বারে বারে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি যোগ্যতার সাথে সে ভূমিকা পালন করেছে। আজকে ভারতবর্ষের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা যখন বিপর্যস্ত হতে বসেছে তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই সমিতিকেই পালন করতে হবে।

আপনাদের প্রস্তাবের মধ্যে যথার্থভাবে উল্লেখ করেছেন সাম্প্রদায়িকতার কথা। বলুন আমরা শিক্ষক। একটা ছাত্র হিন্দু না মুসলমান তার পরিচয় আমাদের কাছে থাকতে পারেনা। আমাদের কাছে একমাত্র পরিচয় সে আমার ছাত্র, এটাই একমাত্র তার সাথে আমার সম্পর্ক হতে পারে। আজকে বিভিন্ন রাজ্যের কথা আমি জানি, আমি এমন একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই বুঝতে পারবেন। একজন শিক্ষক ইতিহাসের, তিনি শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করেছেন এমন কিছু ছাত্রকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহিত করে যে শিক্ষক মহাশয় যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ছাত্র এবং মুসলমান ছাত্র পরস্পর মারতে উদ্যত, ফলে মারামারি শুরু হয়ে যায়। এমন উস্কানীমূলক উক্তি দিয়েই তারা ইতিহাস বই পাঠ্যসূচীর মধ্যে এনে পুরো সমাজটাকেই বিষাক্ত করে দিচ্ছে।

আজকের বাংলার শিক্ষক সমাজ, বাংলার আচার্য শক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বংশধর, ডিরোজিওর বংশধর আপনারা। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ মাত্র কয়েক বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। তাতেই শিক্ষার প্রতি তাদের অনুরাগ প্রমাণ করে গেছেন। আজকে ভারতবর্ষের রাজনীতি, ভারতবর্ষের সমাজনীতি, ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের শিল্পনীতি, কৃষিনীতি আজকে বিদেশের দ্বারা প্রভাবিত। এবার মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে দেশের জনগণকে, আর সেই জনগণের মুখে ভাষা দিতে পারে, সেই জনগণকে প্রেরণা দিতে পারে, সেই জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে ভারতের শিক্ষক সমাজ, ভারতের আচার্য শক্তি, রাধাকৃষ্ণণের যারা বংশধর তারা সে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বাংলার শিক্ষকদের দায়িত্ব একটু বেশী। আমি যে কথা বলে শেষ করবো, নিয়মিতভাবে আমাদের অন্য রাজ্যে যেতে হয়, যখন আমরা যাই শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার সমাচার যখন আমরা বলি অন্য রাজ্যের মানুষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, তোমরা বাংলার মর্যাদা মনে রাখবে। এই বাংলার মাটি থেকে ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহন রায় প্রথম আধুনিক শিক্ষার দাবী তুলেছিলেন। তার আগে কেউ তখনো আধুনিক শিক্ষার দাবী তোলেন নি। এই বাংলার মাটি থেকে সংস্কৃতের পণ্ডিত বেঁটেখাটো মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে দীর্ঘ ১০ পৃষ্ঠা চিঠি লিখে আধুনিক শিক্ষার দাবী তুলেছিলেন। এই বাংলার প্রান্ত থেকে আধুনিক শিক্ষার দাবী, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার দাবী গোটা ভারতবর্ষকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। আজ শিক্ষা যখন আক্রান্ত, শিক্ষা যখন বিপন্ন, শিক্ষা যখন বেসরকারীকরণের আখড়ায় পৌঁছে গিয়ে আক্রান্ত, শিক্ষা যখন বিশ্বায়নের কাছে নীতিস্বীকার করতে বাধ্য হতে পারে, বিপদ যখন দেখা দিয়েছে—অন্য রাজ্যে তাদের ভাষায় তর্জমা করে দিয়ে বলতেই হবে বিপদের কথাটা শিক্ষায় এই আক্রমণকে সজোরে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক

সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে কখনো কখনো চীনের দালাল বলে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে কখনো কখনো দেশদ্রোহী বলা হয়েছে, বারে বারে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবু নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য থেকে কখনো পথভ্রষ্ট হয়নি। কখনো তাকে সরানো যায় নি, কখনো তাকে বিভ্রান্ত করা যায় নি। এই গৌরবজনক ইতিহাস, এই স্বর্ণখোচিত অতীত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আছে। আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, এই সমিতির একজন দীর্ঘদিনের সদস্য হিসাবে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, ভারতের মানুষ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাছে, বাংলার কাছে শিক্ষার ক্ষেত্রে যা প্রত্যাশা করে, গণতন্ত্রের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যা কামনা করে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের কাছে গিয়ে সকল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করতে পারবে। এই কথা বলে আজকের সমাবেশকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অনুলেখক ঃ বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪-এ কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ডেপুটেশনে গৃহীত প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশন সমূহের যৌথ আহ্বানে ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন

শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রাম ও আত্মদানের ফলে অর্জিত ধর্মঘটের অধিকার রক্ষায় এবং বি জে পি-জোট সরকারের জনবিরোধী ও শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন সমূহ ও এস টি এফ আই আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে। সারা ভারত কিষাণ সভাও দেশের কৃষক সমাজকে সংগ্রামের এই কর্মসূচীতে সামিল হবার ডাক দিয়েছেন।

বাজপেয়ী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত পথে আর্থিক সংস্কার, উদারীকরণ ও বে-সরকারীকরণ নীতি নির্মমভাবে প্রয়োগ করছে। তারফলে দেশের অর্থনীতি ও আর্থিক পরিস্থিতি আজ চরম সংকটগ্রস্ত। বিদেশী বহুজাতিক পুঁজির প্রবেশ অবাধ করে দেওয়া এবং উদার আমদানী নীতির ফলে দেশীয় শিল্প ও কৃষি গভীর সংকটে। কৃষি-পণ্যের অবাধ আমদানী ও আমদানী শুল্ক হ্রাস, ভরতুকী ছাঁটাই ও ন্যায্য মূল্যের অভাবে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, উপরন্তু ভূমিসংস্কারের পথে না গিয়ে কৃষিকে কর্পোরেট সেক্টরেটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মুনাফা অর্জনের জন্য। ক্ষেতমজুরদের জন্য ন্যূনতম মজুরী আইন আজও প্রণীত হল না। ফলে দেনার দায়ে আত্মহননের পথ নিতে বাধ্য হচ্ছেন অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যাসহ অনেক রাজ্যের কৃষকেরা। কেন্দ্রীয় সরকার লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে নির্বিচারে জলের দামে বে-সরকারী মালিকদের হাতে বিক্রি করে রাজস্ব সংগ্রহের পথ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়েছেন। বে-সরকারী ক্ষেত্রে বহু শিল্প কারখানা রুগ্ন ও বন্ধ হওয়ায় আরো কয়েক লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন। গত পাঁচ বছরে সংগঠিত ক্ষেত্রেই ৯ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন। সরকারী ও বে-সরকারী উভয়ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হচ্ছে। নূতন কোনো কর্মসংস্থান হচ্ছে না বললেই চলে। ফলে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরীসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কম বেতনের ঠিকা প্রথায় শ্রমিক নিয়োগ বাড়ছে।

একইসঙ্গে অপ্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি ও দফায় দফায় পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ দুই লক্ষাধিক কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এরই পাশাপাশি বহুজাতিক ও দেশীয় মালিকদের স্বার্থে যেমন খুশি ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ করা, অবাধে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা এবং ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করার জন্য শ্রম আইনগুলি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে দেশের বিচার ব্যবস্থাও শাসক শ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার হরণের পক্ষে রায় দিচ্ছে।

শিক্ষার উপর জঘন্য হামলা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর এস এস ও সঙ্ঘ পরিবারের নির্দেশ কার্যকরী করতে

শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রদায়িকীকরণ করছে। শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের আইনগত অধিকার কেড়ে নেবার প্রতিবাদে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের সর্বাত্মক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত ৬ই আগস্ট এক রায়ে বিচারপতি এম বি শাহ এবং এ আর লক্ষ্মণ বলেছেন যে 'রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোন অবস্থাতেই ধর্মঘটের মৌলিক, আইনগত, নৈতিক অধিকার নেই।' রায়ে আরো বলা হয়েছে যে, 'এমনকি ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ দর কষাকষির স্বীকৃত অধিকার থাকলেও ধর্মঘটের অধিকার নেই।' বিচারপতি শাহ এই বেঞ্চের রায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের দেশের বা জাতির অর্থনৈতিক এবং শিল্পগত কাজকর্ম পণ্ড করা বা নাগরিকদের অসুবিধায় নিক্ষেপ করার কোন অধিকার দাবি করতে পারবে না।' ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ন্যায় আদালতের এই রায় খুবই বেদনাদায়ক, অপ্রত্যাশিত এবং ভয়ঙ্কর। অতি সম্প্রতি শিক্ষকদের গ্র্যাচুয়িটি পাওয়ার অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছে সুপ্রীম কোর্ট।

শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সরকার যখন নিজ স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে শ্রম আইন সংশোধন করতে উদ্যত তখন দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়গুলি ইঙ্গিতবহ।

এই সমাবেশ মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, তীব্র লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে, অসংখ্যা শহীদদের জীবনের বিনিময়ে ধর্মঘটের অধিকার অর্জিত হয়েছে। এভাবেই ধর্মঘটের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারীসহ শ্রমজীবী মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের গণতন্ত্র বিরোধী চরিত্রকে তুলে ধরতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই জামানা কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রভাবিত করেছে তাও নগ্ন হয়ে পড়েছে এই রায়ে।

দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটকে আড়াল করার জন্য কেন্দ্রের বি জে পি-জোট সরকার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মুখে নানা মিথ্যা প্রচার শুরু করে দিয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করার জন্য অত্যন্ত নীতিহীনভাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ এই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে এই সংগ্রাম সফল করে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে এই সমাবেশ। ঐদিন ১২ই জুলাই কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে সব জোনে মিছিল সংগঠিত করতে হবে।

রাজ্যের সর্বস্তরের শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী ও মেহনতী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন এই সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন।

প্রস্তাবক ঃ অশোক ভট্টাচার্য
সমর্থক ঃ রীতা সেন

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি ও তার জোটসঙ্গীদের পরাস্ত করতে হবে

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজনার বিকট শব্দের আড়ালে ও 'ভারত উদয়' নামক চোখধাঁধানো বিজ্ঞাপনের আলোয় লুকিয়ে রাখা হচ্ছে দেশের প্রকৃত চিত্রকে। ওরা বলছেন দেশে নাকি 'ফিলগুড' অর্থাৎ 'আমরা ভাল আছি' এই মনোভাব বিরাজ করছে।

ওদের দাবী অভ্যন্তরীণ বিকাশের হার ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এই হার দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে চিহ্নিত করা যায় না। এরা আগে ১৯৬৭-৬৮তে এই হার ছিল ৮.১ শতাংশ, ১৯৭৫-৭৬-এ ৯ শতাংশ, ১৯৮৮-৮৯ সালে ১০.৫ শতাংশ। তারপর সেটা নেমে হয়েছিল ৪.৫ শতাংশ।

গত পাঁচ বছরে দেশের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি নিয়ে ভিত্তিহীন দাবী তুলছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডারে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এটা যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি এটাও সত্য যে এখনও দেশের ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ অনাহারে দিন কাটান। Food and Agricultural Organisation (F A O) 'The State of Food Insecurity in the World, 2003' নামক প্রতিবেদনে বলেছে ঃ "Over a fifth of India's population still suffers from chronic hunger". উদারনীতি শুরু হবার থেকে শুধু মহারাষ্ট্রেই ৮০০০-এর বেশী শিশু অপুষ্টিতে মারা গেছে। গত তিন বছরে রাজস্থানে প্রায় ২ হাজার কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে দেনার দায়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের তিন গ্রাম বেন্তাছিনতালা, খাভামপাড়ু এবং মাছেরলায় ১০০ জনের বেশী কৃষক নিজেদের কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৯৭-২০০০ এই চার বছরে অন্ধ্রপ্রদেশের কেবল অনন্তপুর জেলাতেই ১৮২৬ জন প্রান্তিক চাষী দেনার দায়ে আত্মহত্যা

করেছেন। কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতেও।

১৯৯৩-৯৪ সালে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ছিল ১৭৭ গ্রাম, এখন তা কমে ১৫৩ গ্রাম হয়েছে। অপরদিকে গোরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবে এদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিতে খুব কম দামে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হচ্ছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা 'অন্নপূর্ণা যোজনা' মুখ থুবড়ে পড়েছে। দারিদ্র্য বাড়ছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০০১-২০০২ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে ২৭.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০০-২০০১ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ২৪.৪ শতাংশ। ভূমিসংস্কারের কথা এই সরকারের মুখে শোনা যায় না। বরঞ্চ কর্পোরেট ক্ষেত্রের হাতে ভূমির মালিকানা তুলে দিতে নানা রকম আইন চালু করা হচ্ছে। দলে দলে গরিব-প্রান্তিক কৃষক ও আদিবাসীরা জমি হারাচ্ছেন।

প্রতি বছর এককোটি বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের কথা বললেও কর্মসংস্থান ভীষণভাবে কমছে। ১৯৮৩-১৯৯৪ সালে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল ২.৭ শতাংশ। ১৯৯৩-২০০০ সালে তা হয়েছে মাত্র ১.০৭ শতাংশ। সাম্রাজ্যবাদ-নিয়ন্ত্রিত ফাণ্ড-ব্যাংক নির্দেশিত কর্মহীন উন্নয়নের পথ অনুসরণ করে চলেছে এন ডি এ সরকার। তাই 'কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা' কমছে। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের অনুপাত কমছে। যে হারে উৎপাদন বাড়ছে তার চেয়ে অনেক কম হারে কর্মসংস্থান হচ্ছে। জমি-জমা খুইয়ে ৪ কোটির বেশী প্রান্তিক চাষী বেকার হয়েছেন। ১৫ কোটি বেকার এখন দেশে। কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেছে ১০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কমানো হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে হাজার হাজার পদ শূন্য। রেলে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার পদ শূন্য। রেলের ২২ লক্ষ কর্মীসংখ্যা কমে ১৪ লক্ষতে নেমেছে।

শিল্পক্ষেত্রে শুধু কর্পোরেট মুনাফা বাড়ছে। শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না। কাগজে কাগজে, দূরদর্শনে ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির জয়গান গাওয়া হলেও পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। ২০০২ সালে শিল্পে বিকাশের হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৮ শতাংশে। পরিষেবা ক্ষেত্রে যেখানে ২০০২ সালে বিকাশের হার ছিল ৭.১ শতাংশ, তা কমে এখন হয়েছে ৬.৭ শতাংশ। অথচ ১৯৯১-২০০২ সালে এক্ষেত্রে বিকাশের হার ছিল ১০ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত 'ইকনমিক সার্ভে' ২০০২-২০০৩ অনুযায়ী বিদেশ থেকে ভারতের নেওয়া মাথাপিছু বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৭৯১ টাকা। দেশী-বিদেশী ঋণ মিলিয়ে ভারতে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ১৪,৭১১ টাকা।

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যকিছু হতে পারে না। সংবিধান প্রণেতারাও এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতির দেশ ভারতে তাই একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মদতপুষ্ট গৈরিক বাহিনী ভারতে 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী মুসলিম ও খ্রীস্টান হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে—রাজ্যে রাজ্যে দাঙ্গা বাধাচ্ছে রাষ্ট্রীয় মদতে। ফলে বিপন্ন হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। গুজরাটে ব্যাপক মুসলিম নিধন ভারতের লজ্জা।

বি জে পি শাসনে রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতে চলছে ব্যাপক সাম্প্রদায়িকীকরণ। সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ ঘটেছে গৈরিক বাহিনীর। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার মানুষদের বিতাড়িত করে সেখানে বসানো হয়েছে সংঘ পরিবারের লোকজনদের। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সীমান্ত পেরিয়ে আসা উগ্রপন্থীদের চেয়েও বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিহাসের ব্যাপক বিকৃতিকরণ করা হয়েছে। এমনভাবে বিদ্যালয় স্তর থেকে ইতিহাস পড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে যাতে সমৃদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে তার বদলে ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ এক সংকীর্ণ চিন্তা নিয়ে বেড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ছাত্র-ছাত্রীদের হিন্দু রাষ্ট্রের মতাদর্শে শিক্ষিত করার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের চরম লক্ষ্য সমগ্র জাতির হিন্দুত্বকরণ ও সামরিকীকরণ।

লোকসভায় একক গরিষ্ঠতা পেলে বি জে পি তার নিজের কর্মসূচীই প্রয়োগ করবে তাতে সন্দেহ নেই। এন ডি এ'র নির্বাচনী ইস্তেহার ছাড়াও বি জে পি রামমন্দির প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলাদা নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করবে বলে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। এই পরিবেশ সংখ্যালঘু মৌলবাদকেও উৎসাহিত করবে। এই সুযোগ নিতে পারে সন্ত্রাসবাদীরা। এরফলে বিপন্ন হবে জাতীয় ঐক্য নিরাপত্তা ও উন্নয়ন।

আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিও মাথাচাড়া দিচ্ছে। সম্প্রতি আসামে আক্রান্ত হয়েছেন বিহারের মানুষ, বিহারে আক্রান্ত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের রেল যাত্রীরা। জোটের শরিক শিবসেনা প্রকাশ্যেই হুমকি দিচ্ছে মহারাষ্ট্রে অন্য কেউ কাজ পাবে না।

বি জে পি-জোট সরকারের আমলে ২০০২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ৪ লক্ষ ২২ হাজার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের ভি আর এস দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৮-২০০২ সালে নথিভুক্ত কলকারখানা বন্ধের ফলে কাজ হারিয়েছেন ৫৯,১০৪ জন। লে-অফের ফলে কাজ হারিয়েছেন একই সময়ে ১,৬৫,৪৮৭ জন।

মালিক শ্রেণীর হাত শক্ত রাখতে দ্বিতীয় শ্রম কমিশন বলেছে ঃ মালিকপক্ষ ইচ্ছামতো ছাঁটাই বা লে-অফ করতে পারবে। মোট শ্রমিক-কর্মচারীর ৬৬ শতাংশ সদস্য থাকলে তবেই স্বীকৃতি মিলবে ইউনিয়নের। গোপন ব্যালটে ভোট নিয়ে ধর্মঘট ডাকতে হবে। ৫১ শতাংশের সমর্থন পেলে তবে ধর্মঘট বৈধ হবে।

পি এফ-এর সুদ ১২ শতাংশ থেকে নামিয়ে ৮ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে সংগঠিত শিল্পের আড়াই কোটি শ্রমিক-কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত। পেনশনের দায় কেন্দ্রীয় সরকার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পেনশন তহবিল বে-সরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেছে। সেই তহবিলের টাকা খাটানো হবে শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজীর জন্য।

বিদেশী বহুজাতিকদের স্বার্থরক্ষা করতে সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছে 'সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের কোনো মৌলিক নৈতিক অধিকার নেই।' অথচ ১৯৮৯ সালে সুপ্রীম কোর্টই জানিয়েছিল ধর্মঘটের অধিকার শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।

তাই দেশরক্ষার মৌলিক কর্তব্য পালন করতে আগামী চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে জয়যুক্ত করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে এই সমাবেশ। এই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার উদ্যোগ সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবক ঃ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক ঃ প্রশান্ত ধর

প্রতিবেদন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও লেখক প্রশান্ত ধর-এর শঙ্খচিলের ঠিকানা প্রকাশিত হলো

স্থান ঃ সত্যপ্রিয় ভবন, রবিকক্ষ

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪
আয়োজনে ঃ কলস্বনা, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা সংস্থা

গত ফেব্রুয়ারীর ১৪ তারিখ বিকালে সত্যপ্রিয় ভবনের রবিকক্ষে 'কলস্বনা' সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা সংস্থার আয়োজনে বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ্ প্রশান্ত ধরের 'শঙ্খচিলের ঠিকানা' গ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পেল। গ্রন্থটি প্রকাশ করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের সভাধ্যক্ষ রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ 'সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এ অনুষ্ঠান। শিক্ষাপ্রশাসনে থাকা ও শিক্ষা কমিটিতে বিভিন্ন সময়ে কাজ করার সুবাদে লেখকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। আহ্বান পাওয়ার পর ভেবেছিলাম কোনো শিক্ষা বিষয়ে হবে। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এ অনুষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে আমার সম্পূর্ণ অজানা। তবু আলোচনান্তে লেখকের চিন্তার গভীরতা, স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতা আমাকে মুগ্ধ



বলেন — লেখক প্রশান্ত ধর প্রথম লেখা শুরু করেন দক্ষিণ কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে'র মুখপত্র 'সংস্কৃতি' পত্রিকায়। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নামে লিখেছেন বহুদিন। ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ ও মাখনলাল চৌধুরী এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। বিমল ঘোষ (মৌমাছি) সম্পাদিত 'আনন্দমেলা'তেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। লিখেছেন 'গণশক্তি' পত্রিকাতেও। কর্মজীবনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির একনিষ্ঠ সেবক-কর্মী। শিক্ষা ও সাহিত্যে তাঁর উড়ানপর্বের লেখাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, তবে নিয়মিতভাবে নয়। নির্মল হাস্যরসের ফল্গুধারা তাঁর লেখাগুলিতে প্রবাহমান। মানবদরদী লেখক প্রশান্ত ধর মানুষের পক্ষে লিখেছেন। অ-মানুষদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী তরবারি হয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রীধর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আগামী পৃথিবী নবজাতকদের বাসযোগ্য করে তোলার সংগ্রাম চলছে, চলবে।" তিনি বলেন, কবি প্রশান্ত ধরের অনবদ্য কবিতাগুলি ছড়িয়ে আছে শিক্ষা ও সাহিত্য সহ নানা পত্রিকায়। সেগুলিরও একটি সংকলন আগামীদিনে প্রকাশিত হবে এই আশা রাখছি। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট নেতা অমল ব্যানার্জী বলেন, শঙ্খচিল যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন ব্যথিত হই। লেখককে চালিয়ে যেতে বলি। পরে তিনি আবার শুরু করেন। সেই বই

করেছে। এ গ্রন্থের উড়ান আমার কাছে রহস্যাবৃত। যে সব মানুষের স্মৃতিচারণা লেখক করেছেন তা আপাত রোমান্টিকতা আর অন্বেষণে সমৃদ্ধ। 'শঙ্খচিলের ঠিকানা' লেখক পেয়েছেন না সন্ধান করছেন বুঝতে পারছি না। সামাজিক বিশ্লেষণ এ বইতে আছে বলে মনে করি। কিছু গভীর সমাজবোধ, সমাজবীক্ষা নিশ্চয়ই আছে। শুরু করলে শেষ না করে বোঝা যাবে না। আনন্দের সঙ্গে এই সাহিত্যকর্মকে আমি উদ্বোধন করছি। বহুল প্রচার, বহুল জনপ্রিয়তা পাবে কিনা জানিনা। তবে মস্তিষ্ককে নাড়া দেবার, ভাবার ও ভাববার বিষয় এতে আছে। শুভবার্তা সকলের কাছে পৌঁছে যাক। সমাজবীক্ষা প্রতিকূল হয়ে উঠছে। প্রতিবন্ধকতা বাড়ছে। সামাজিক অবক্ষয় কাটানোর জন্য এ ধরনের প্রকাশ জরুরী। লেখক বেশি বেশি করে শঙ্খচিলের ঠিকানা আমাদের দিন।

লেখক প্রশান্ত ধর'কে সঙ্গে নিয়ে রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও জননেতা অরুণ চৌধুরীর হাতে 'শঙ্খচিলের ঠিকানা'র প্রথম কপি তুলে দেন।

শিক্ষা ও সাহিত্যের যুগ্ম সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর মুখবন্ধে



আজ গ্রন্থাকারে আমাদের সবার হাতে। লেখককে খোলা আকাশে খোলা মন নিয়ে কলম সোজা করে চালিয়ে যেতে বলি। অরুণ চৌধুরী বলেন, এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়। লেখক এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখাই লিখেছিলেন 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র পাতায়। এই সংযোজন থাকলে ভালো হোত। প্রকাশকরা বিষয়টি নিশ্চয়ই দেখবেন। লেখকের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ, তাঁর রসানুভূতি আমাদের মুগ্ধ করে। পাঠকরা এ বই বিচার করবেন। আপাতদৃষ্টিতে হালকা সুরে অনেক মূল্যবান কথা তাঁর লেখায় বলেছেন। সে আরো লিখুক। আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুক তার লেখা। পরে তিনি সাঁওতালি ভাষার স্বীকৃতি, তার সাংবিধানিক বৈধতা, দিল্লি প্রশাসনের সঙ্কীর্ণ ও অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করে একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রাক্কালে ভাষা চেতনা ও প্রসারের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সাঁওতালি ভাষার বিশিষ্ট কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর আলোচনা যথেষ্ট মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট জননেতা ও 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র প্রাক্তন সম্পাদক অজিত বাগ তাঁর রসসিক্ত আলোচনায় উল্লেখ করেন, শঙ্খচিলের ডানা কেমন ছিল জানি না। তবে লেখক প্রশান্ত ধরকে ধরে কে। স্বাভাবিক টানে এই প্রকাশ অনুষ্ঠানে অনেক দূর থেকে এই বয়সে এসে পৌঁছেছি। তাঁর লেখা আরো মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাক। গ্রন্থের লেখক প্রশান্ত ধর কোনো আলোচনায় না গিয়ে সুচতুরভাবে তাঁর গ্রন্থের ১১পাতার দ্বিতীয় উড়ান (১) সকলকে শুনিয়ে তাঁর গ্রন্থপাঠে সকলের আগ্রহ 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গতিতে বাড়িয়ে দেন। 'কলস্বনা'র সভাপতি বিশিষ্ট কবি রমেশ পুরকায়স্থ তাঁর আলোচনায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে এক অবশ্যম্ভাবী বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে তাকে রোধ করার সমবেত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। এবং অবশ্যই সেই সাহিত্য আমাদের চাই যা মানুষের কথা বলবে। প্রশান্ত ধরের সমগ্র বই পড়ে তিনি তাঁর অনুভূতির কথা জানাবেন বলে উল্লেখ করেন। পরে বক্তব্য রাখেন কলস্বনার কার্যকরী সভাপতি কবি রাণা চট্টোপাধ্যায়। সভার শেষে কবিতা পাঠের আসরে কবিতা পড়েন — অনির্বাণ রায়চৌধুরী, খগেশ্বর দাস, জীবন সরকার প্রমুখ।

সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন কলস্বনার সাধারণ সম্পাদক কবি অমল কর।

প্রতিবেদক ঃ অশোক অধিকারী

শিশুদের ভালবেসে

বেবী দাস

শিশুদের মুখে
চুম্বন এঁকে
পেয়ে যাই গোলাপের ঘ্রাণ।
শিশুরাই এসে
হেসে অবশেষে
দিয়ে যায় বাঁচার সন্ধান।
শোনা যায় আজ
বিশিষ্ট দিন
ভ্যালেন্টাইনস্ ডে
এইদিনে আমি
শিশুদের মুখ
ভুলতেই পারি নে।

সমস্ত মন
উর্বর হয়
শিশুদের ভালবেসে
শঙ্খচিলের
ডানায় চড়ে
চলো যাই শিশুদের দেশে।

(১৪ই ফেব্রুয়ারি কলস্বনা আয়োজিত 'শঙ্খচিলের ঠিকানা' প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পঠিত)

প্রতিবেদন

শিক্ষা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা সমিতির প্রবীণতম সদস্য শশিমোহন ভট্টাচার্যের স্মরণসভা

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সত্যপ্রিয় ভবনে শিক্ষা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা প্রয়াত শশিমোহন ভট্টাচার্যের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভানেত্রী ক্ষমা ভট্টাচার্য। সভার শুরুতে শশিদার প্রতিকৃতিতে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, জেলার নেতৃবৃন্দ, বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। শশিদার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় শশিদার স্মৃতিচারণা করেন শিক্ষা ও সাহিত্য-এর প্রাক্তন সম্পাদক অমিতাভ সেন, হাওড়া পৌরনিগমের বর্তমান চেয়ারম্যান, সমিতির প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ উমাশংকর গাঙ্গুলী, ৫৪-এর স্মরণীয় শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেত্রী মীরা চট্টোপাধ্যায়, হেডমাষ্টারস অ্যাসোসিয়েশন-এর নেতা সূর্যাংশু ভট্টাচার্য এবং বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস ও এবিপিটিএ'র প্রবীণ নেতা প্রশান্ত বসু। সভায় শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষা ও সাহিত্য-এর যুগ্ম সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কবি অশোক অধিকারী শশিদার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন স্বরচিত কবিতা পাঠ করে।

শিক্ষা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা শশিমোহন ভট্টাচার্যের জীবনাবসানে শোক প্রস্তাব

গত ৩০শে জানুয়ারী, ২০০৪, শুক্রবার মধ্যাহ্নে আমাদের সকলের প্রিয় নেতা শশিদার জীবনাবসান ঘটেছে দীর্ঘ রোগভোগের পর। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের গৌরবদীপ্ত আন্দোলনের একটি যুগাবসান ঘটে গেল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম জেলার কোয়েপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র শিক্ষক পরিবারে প্রয়াত শশিমোহনের জন্ম হয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তাঁকে বড় হতে হয়। তিনি কৈশোর ও যৌবনে 'চট্টগ্রাম মহা যুববিদ্রোহ'র নেতা মহাবিপ্লবী সূর্য্য সেনের (মাস্টারদার) সান্নিধ্যে আসেন। প্রথমে 'অনুশীলন সমিতি' ও পরে 'যুগান্তর দলে'র মাধ্যমে মাস্টারদার বিপ্লবী দলের মধ্যে প্রয়াত ভট্টাচার্য 'ক্যুরিয়ারে'র দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে মেধাবী ছাত্র শশিমোহন কলকাতায় স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। কিন্তু অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণে সে সাধ অপূর্ণ থেকে যায়। 'সমুদ্রমেখলা চট্টলা'য় ফিরে এসে শশিদা (প্রয়াত সত্যপ্রিয় রায় ও প্রয়াতা অনিলাদিও তাঁকে 'শশিদা' বলেই ডাকতেন) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ব্রতে নিযুক্ত হলেন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে। অচিরেই তিনি নিজের যোগ্যতায় কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ইতোমধ্যেই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবিভক্ত বাংলার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন ও ধীরে ধীরে নেতৃত্বের পদে সমাসীন হন। তারপর থেকে আমৃত্যু তিনি এবিটিএ'র সদস্য ছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে তিনি ছিলেন সারা বাংলার প্রবীণতম সদস্য।

দেশভাগের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এপার বাংলায় এসে হুগলী জেলার পুড়শুড়া থানার শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরের বছরেই তিনি মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে বৃত হন। অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শশিমোহন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির হুগলী জেলা শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'চুয়ান্নর স্মরণীয় বারোদিনে'র লড়াইয়ে তিনি জেলায় সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্বের যোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তারপর থেকে তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা ১৮ বছর ঐ দায়িত্ব অপরিসীম যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। তারপরে দীর্ঘকাল তিনি জেলা সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে জেলায় চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গে 'চুয়ান্নর স্মরণীয় বারোদিনে'র এবং 'ছেষট্টির ঝোড়ো মাসব্যাপী কর্মবিরতি ও আইন অমান্য করে হাজারে হাজারে কারাবরণের কর্মসূচী' পালিত হয়। ১৯৫৮ সালে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক অনশন সত্যাগ্রহ হয় তাতে হুগলী জেলার পক্ষ থেকে শশিদা অংশগ্রহণ করেন।

শশিদা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল সমিতির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

একযুগ ধরে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর স্পর্শে বিশেষ করে ইংরেজীতে লেখা সম্পাদকীয়গুলি হয়ে উঠতো এক একটি সংগ্রামী হাতিয়ার।

হুগলী জেলায় এসে শশিদা বাহান্ন-তিপ্পান্ন সালেই ভদ্রকালীর স্থায়ী অধিবাসী হন। সেখানেও তিনি তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের ভাস্বর স্বাক্ষর রেখে যা্ন। ওপার বাংলাতে থাকতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপশাসনের ফলে শাসকসৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরে আর্ত-পীড়িত বুভুক্ষু মানুষের সেবায় যোগ্য সহধর্মিণী প্রয়াতা হিরণ্ময়ী দেবীর সহায়তায় তাঁর নিজের বিদ্যালয়েই একটি বড় রিলিফ ক্যাম্প পরিচালনা করেন। সেই সময় থেকেই তিনি অবিভক্ত বাংলার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শশিদার সমগ্র পরিবারটিই বামপন্থী আন্দোলনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।

এপার বাংলায় এসে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির হুগলী জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য হন ও বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ ভদ্রকালী ওয়ার্ড থেকে ভদ্রকালী কোতরং গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির অন্যতম প্রার্থী হিসাবে তদানীন্তন কোতরং পুরসভা যেটি বর্তমানে উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার অঙ্গীভূত, সেখানে কমিশনার নির্বাচিত হন ১৯৫৭ সালে। তাঁদের আমলেই কোতরং পুরসভায় কংগ্রেসী অপশাসনের অবসান ঘটে এবং বামপন্থীরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্বে আসেন। চৌষট্টি সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-তে শশিমোহন যোগ দেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এর সদস্য ছিলেন। শশিদা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাঁদের বসবাসের এলাকার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও পরিচালনায় অনন্য গৌরবময় ভূমিকা পালন করে এসেছেন।



নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দের এই সভা গভীর বিনম্র শ্রদ্ধায় এই কিম্বদন্তী নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে শিক্ষা ও জাতির স্বার্থে নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অনুরাগী জনগণের প্রতি স্বজনের সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

প্রয়াত নেতা শশিমোহন ভট্টাচার্য অমর রহে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

সত্যপ্রিয় ভবন, পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩

শিক্ষা ও সাহিত্য-এর প্রাক্তন সম্পাদক, সমিতির প্রবীণ নেতা অমিতাভ সেনের ভাষণ

তিনি বলেন, আমার শিক্ষক আন্দোলনের একদম শুরুতে আমি দুজন শিক্ষাগুরু পেয়েছিলাম, প্রথম জন বর্ধমানের প্রয়াত নেতা শ্রদ্ধেয় আমোদবিহারী বসু এবং দ্বিতীয় জন শশিমোহন ভট্টাচার্য। প্রজ্ঞায় অনেক প্রবীণ এই দুই নেতা আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন কিভাবে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠন গড়ে নিতে হয়। আমার মনে আছে, তখন বিধান পরিষদে শিক্ষক প্রতিনিধিত্বে অপরাজেয় শক্তি ছিল এ বি টি এ। তারই একটি নির্বাচনের সময় হুগলী জেলায় আমি চাঁপাডাঙ্গা স্কুলে কাজ করি; শশিদা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন সেখান থেকে অন্তত পাঁচ মাইল দূরে একটি বিদ্যালয়ে। আমরা গেলাম, তখন বাস ছিল না, তিন চাকা ছিল না, দু চাকা ছিল না, আমাদের সাইকেলও ছিল না। গিয়েছিলাম হাঁটতে হাঁটতে। কাজ সেরে ফেরার পথে মুষলধারে বৃষ্টি। একেবারে আদ্যোপান্ত ভিজে গেলাম দু'জনে। শশিমোহন ভট্টাচার্য আমার স্কুলের হষ্টেলে এসে আমার একখানি ধুতি পরে, পাঞ্জাবী তিনি ছাড়লেন না, কারণ আমি তখন নিজে পাঞ্জাবী পরতাম না, শার্ট ছিল, তিনি বাড়ী গেলেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির, যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির হুগলী জেলার সম্মেলনে — পর পর দুটি সম্মেলনে শশিদার সঙ্গে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, আমার মতন বয়সের যাঁরা এখন আছেন এই মঞ্চে এবং এই সভাগৃহে, তাঁদেরও দুর্ভাগ্য যে আমাদের যাঁরা শিক্ষাগুরু ছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত যত্নের সাথে ধৈর্য্যের সাথে আমাদের হাতে ধরে আন্দোলনের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা কেউ আর আমাদের কাছে নেই। আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না জানি না, সে কথা

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলে দেবে।

আমরা অত্যন্ত বেদনাহত যে আজকে আমাদের মধ্যে সেই উজ্জ্বল তারকারা, শশিমোহন ভট্টাচার্য আমোদবিহারী বসু, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, অমূল্যদা, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁরা কলেজ স্ট্রীটের অফিসে বসে সংগঠন পরিচালনা করতেন। দূরে আর একটা টেবিল পাতা ছিল। আমরা সকলে ঐখানে টেবিলে বসে তাঁদের কথা শুনতাম, তাঁদের নির্দেশ পালন করতাম। তারপর সেখান থেকে দল বেঁধে আমি, গোলোকদা, মীরাদি, সমরেশ সেন, শৈলেন দাশশর্মা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরতাম। এটা আমাদের রোজকার প্রোগ্রাম ছিল। কাজ থাকুক, না থাকুক, প্রয়োজন থাকুক, না থাকুক — কোনো প্রয়োজনও থাকতে পারে এই জন্য আমরা সমিতির অফিসে যেতাম। অনেক দিন আমরা বসে তেলেভাজা মুড়ি খেয়ে গল্প করে চলে এসেছি। কিন্তু একটা গভীর আনন্দের মধ্যে এ কাজ আমরা করেছি। পরবর্তীকালে শশিদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিলো। অমূল্যদার জীবনাবসানের পর শশিদা শিক্ষা ও সাহিত্য মুখপত্রের সম্পাদক হয়ে এলেন। আমি যুগ্ম সম্পাদক। অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে আমাদের এই পত্রিকা প্রকাশনার কাজ করতে হয়েছে, যাঁরা প্রবীণ তাঁদের মনে আছে। ১৯৭১-৭২ গেলো। জরুরী অবস্থায় অন্য কোন শিক্ষক সংগঠনের কোন কাগজে সেন্সার বসে নি, আমি তাঁদের কোন দোষারোপ করছি না, কিন্তু আমাদের পত্রিকার ওপর, প্রশান্ত বসু এখানে বসে আছেন, তাঁর পত্রিকার ওপর, সেন্সারশিপ চালু হয়ে গেলো। পত্রিকার একটা বিভাগ ছিল। এখনো আছে, সমিতি সংবাদ। তখন আমরা পুরো সংবাদটাই ছাপাতাম। তাতে সম্পাদনার দুর্বলতা হয়তো থাকতো, কিন্তু সমস্ত মহকুমায় সমস্ত স্কুলে সবাই জানতেন যে কোন জেলায়, কোন্ মহকুমার কারা নেতৃত্বে আছেন, কবে সম্মেলন হচ্ছে, কী তাঁদের কর্মসূচী। প্রথম বন্ধ করে দিলাম আমরা নিজেরা ঐ সমিতি সংবাদ বিভাগটি। পরামর্শ দিয়েছিলেন শশিদা, পরামর্শ দিয়েছিলেন সত্যপ্রিয় রায়। — কেন ? কারণ ঐ পত্রিকা প্রকাশের আগে সেই পুরানো প্রথায় হতো হ্যাণ্ড কম্পোজ, সেই লম্বা লম্বা কাগজের ফালি নিয়ে, দুটো কপি করে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতে হতো, আমি স্কুলে যাবার পথে দিয়ে যেতাম, আবার ফেরার পথে সেখান থেকে ফেরৎ নিয়ে আসতাম। তাঁরা কেটে দিতেন, বাদ দিয়ে দিতেন (তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে)। একটা আমাদের কাছে থাকতো আর একটা তাদের কাছে থাকতো। আমাদের সেই কাটা অংশগুলো বাদ দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করতে হতো। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হতো যাতে কখনোই কাটা অংশের কোনো অংশ প্রকাশিত হয়ে না যায়। তাহলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবে। যতটুকু সুযোগ আমাদের হাতে আছে ততটুকুই খোয়া যাবে। এই ব্যবস্থা পুরো জরুরী সময়কালেই চালিয়ে যেতে হয়েছে। এই সঙ্কটকালে এবং এই সংগ্রামের কালে আমরা আমাদের নেতৃত্বে পেয়েছিলাম শশিদাকে।

শশিদা এবং যুগ্ম সম্পাদকের মধ্যে দায়িত্বের ভাগাভাগি করা ছিল, উনি ইংরাজী সম্পাদকীয় লিখতেন। সত্যপ্রিয় রায়ের মতোই ওঁনার ইংরাজী লেখাটা ছিলো পুরানো ধরনের এবং অত্যন্ত সুন্দর, বক্তব্য অত্যন্ত সরল ভাষায় সুন্দরভাবে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিটি বক্তব্য তিনি সম্পাদকীয়তে পেশ করতেন। আমার সঙ্গে এই কাজের সূত্রে শশিদার গভীর অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিল। যা আমার সমস্ত জীবনের একটা মূল্যবান পাথেয়। আমি তিন জন প্রবীণ মানুষকে দেখেছিলাম, কমরেড গণেশ ঘোষ, কমরেড রাজকুমার চক্রবর্তী এবং কমরেড শশিমোহন ভট্টাচার্য, যাঁরা বয়সে অত্যন্ত প্রবীণ হয়েও অত্যন্ত নবীনদের, তাঁর সন্তানতুল্যদের 'আপনি' করে বলতেন। 'বাবু' করে ডাকতেন। আমি বলা সত্ত্বেও শশিদা তাঁর এই 'আপনি' বলা অভ্যেসটা বন্ধ করেন নি। আমাকে বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব একটা দর্শন থাকে তো। আমি মনে করি প্রত্যেক নবীনের মধ্যে একটা প্রবীণ থাকে, সেই প্রবীণকে আমি 'আপনি' বলি। একথা আপনাকে বলি না।" — আমার কথাটা চিরদিন মনে থাকবে।

একবার শশিদা আমার বাড়ীতে এক রাতের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আমরা ত্রিপুরায় যাবো। ত্রিপুরার সম্মেলনে



সমিতির প্রতিনিধিত্ব করতে। সকাল বেলা প্লেন। আগের দিন রাত্রিবেলা বিকালের কাজ সেরে শশিদা এ বি টি এ অফিস থেকে আমার বাড়ীতে এলেন। পরদিন সকালে আমরা রওনা হবো। আমি বললাম শশিদা কি খাবেন? উনি বললেন "আপনি ব্যস্ত হবেন না, একটু দুধ আর খই হলেই চলবে।" আমি একটু কুণ্ঠিত হলাম। কিন্তু ঐ দুধ এবং খই-এর সঙ্গে দুটো সন্দেশ ছাড়া শশিদা অন্য আর কোনো খাবার গ্রহণ করলেন না ; স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই সংযম পালন করতেন।

আর একটা কথা বলে আমি আমার এই স্মৃতিচারণা শেষ করবো। শশিদা ছিলেন সমিতির প্রায় প্রথম যুগের। ১৯২১ সালে সমিতি গঠিত হয়েছে, শশিদা শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন ১৯৩৭ সালে। প্রথম যুগের একজন কর্মী। তিনি চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষক সমিতির সহ-সম্পাদক ছিলেন। তখন সমিতির যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন, আমি একটা লেখায় উল্লেখ করেছিলাম, তাঁরা একটা ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন। সমিতি প্রথম রণধ্বনি দিয়েছিল, যা সমিতির প্রতীকে আমরা পেয়েছি, — 'সংহতি কার্যসাধিকা'।

শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সমবেত করতে হবে। একটা পতাকার তলে সমবেত করতে হবে। সেই পতাকার তলে সমবেত করার যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেই কাজ অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিষহ যন্ত্রণা সমস্ত কিছু সহ্য করে পুলিশী অত্যাচার, আক্রমণ, সন্দেহ এই সমস্ত উপেক্ষা করে শশিদা এই কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু সেই নেতাদের একটা ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ তখনকার সমাজ শুধু শিক্ষকদের বুঝতেন, সমাজকে বুঝতেন না। শুধু ছাত্রদের বুঝতেন, সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের বুঝতেন না। সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন শশিদা, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, অমূল্য লাহিড়ী, সত্যপ্রিয় রায়। এই পরিবর্তনের মুহূর্তে শশিদা তাঁর নিজস্ব কর্তব্যকে বুঝে নিয়ে নিজেই নিজস্ব দায়িত্বটা পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে সমিতির আন্দোলনে প্রতিটি বাঁক এবং মোড়ে শশিদা তাঁর দায়িত্বটা পালন করেছেন এবং সমিতির উত্তরণে এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

আমি জরুরী অবস্থার কথা বলেছি। তার আগেও একটা অবস্থা ছিল ১৯৬২ সালে। যখন ভারত-চীনের সীমান্ত বিরোধের সুযোগ নিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরে চূড়ান্ত আক্রমণ হানা হয়েছিলো। আমাদের কলেজ ষ্ট্রীটের অফিসে আক্রমণ করা হয়েছিলো। আমাদের রবীন্দ্র সরোবরের শিক্ষক সমাবেশের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। আমাদের শোভাবাজার রাজবাড়ীর রাজ্য সম্মেলন ভেঙে দেওয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি ছিল। কী অসাধারণ সাহস এবং দক্ষতার সঙ্গে তদানীন্তন নেতারা সমস্ত শিক্ষকদের সমবেত করেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সমিতি ভাঙার এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে। শৈলেন সেদিন ছিল না। মীরাদি ছিলেন। নন্দদা ছিলেন। আমরা অনেকেও ছিলাম। সেই রবীন্দ্র সরোবরের মিটিং-এর দিনে যখন হাজার হাজার শিক্ষকের বলিষ্ঠ মুষ্ঠি, কলকাতার তখনকার চিহ্নিত সমাজ বিরোধীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলো, সভা হলো। সভাপতিকে বারবার হুমকি দিয়ে কাজ হলো না। সভা শেষ করে আমরা বাড়ী ফিরলাম, কেউ কেউ সমিতির অফিসে ফিরলেন, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী গেলেন বিধান পরিষদে। সেদিন বিধান পরিষদের সভা ছিল। সেখানে এক কংগ্রেসী নেতা তাঁকে বলেছিলেন, "আরে সত্যপ্রিয়বাবু আপনি এখানে? আমরা তো মনে করেছিলাম আপনি হাসপাতালে থাকবেন। সত্যপ্রিয় রায় বলেছিলেন, ওই কটা লোক পাঠাইয়া আমারে হাসপাতালে পাঠাইবেন?

অত্যন্ত প্রদীপ্ত উত্তর তিনি দিয়েছিলেন।

শশিদার কাছে আমি শুধু ব্যক্তিগতভাবে ঋণী নই, আমি সমিতির পূর্বতন প্রয়াত নেতাদের যাদের দেখেছি, আমি লক্ষ্য করেছি, তাঁদের সকলের অসম্ভব এক শক্তি ছিল। সেই শক্তি হল, অবস্থা বুঝে, পরিস্থিতি অনুধাবন করে, সাহসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা। ঐক্যবোধ, ঐক্যের চেতনা, সংগঠনের চেতনা তখন এতো গভীরভাবে ছিল যে তাঁরা যেকোনো ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভুলতে পারতেন। এই চেতনাকে আজকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি তবেই আমাদের এই স্মরণসভা, সমিতির কর্মসূচী, সমিতির ঐক্যবোধ সব কিছু সার্থক হবে।

কমরেড শশিমোহন ভট্টাচার্য লাল সেলাম।

হাওড়া পুরনিগমের চেয়ারম্যান কমরেড উমাশঙ্কর গাঙ্গুলীর ভাষণ

তিনি বলেন, আমি প্রথমেই প্রয়াত শশিদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। শশিদা পরিণত বয়সেই প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু শশিদার প্রয়াণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে সেই শূন্যতা পূরণ করার মত ব্যক্তি আমাদের সমিতিতে আর পাওয়া যাবে না। কারণ শশিদা এমন একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন। তিনি ওপার বাংলা এবং ওপার বাংলা এই দুই বাংলার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগঠন, আন্দোলন এবং সংগ্রাম সম্পর্কে যার সুস্পষ্ট ধারণা জ্ঞান এবং বোধ ছিল। আমি পাঁচের এবং ছয়ের দশকে শিক্ষকতা করতাম গ্রামে। পরবর্তীকালে ৭-এর দশকে শহরে আসি। সেই সময় এ বি টি এ'র কলেজ ষ্ট্রীটের বঙ্কিমচন্দ্র ষ্ট্রীটের যে অফিস, সেই অফিসে

আমরা আসতাম। আমি বিশেষ করে কয়েক জনকে বসে থাকতে দেখতাম, তারমধ্যে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলাদি এবং যখন শশিদার সঙ্গে তখন আমার বিশেষ পরিচয় হয়নি, তখনই আমি শশিদাকে দেখেছি।

হাওড়া জেলার সংগঠন এবং আন্দোলন সম্পর্কে আমি শশিদাকে বলতাম যে শশিদা আপনি তো হুগলী জেলার এবং রাজ্যের নেতৃত্ব। সুতরাং হাওড়া জেলার যে সংগঠন এবং হাওড়া জেলার আন্দোলনের প্রতি আমরা আপনার নেতৃত্ব চাই, আপনার পরামর্শ চাই এবং যখনই হাওড়া জেলায় বিশেষ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমরা শশিদাকে বলেছি—অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ তোমাদের জেলায় যখন প্রয়োজন হবে অবশ্যই যাবো। শশিদার যে বিশেষ বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে এই যে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পুংখানুপুংখ ধারণা, সাল, তারিখ এবং তাঁর স্মৃতিশক্তিও এতো প্রখর ছিল যে বলতে পারতেন সমিতির সংগ্রামী যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের ওপরে হাওড়া জেলায় যখনই আমরা কোন আলোচনার ব্যবস্থা করেছি শশিদা গেছেন। এবং উনি খুব স্পষ্ট করে প্রতিটি বিষয় সাল-তারিখসহ উল্লেখ করে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দিতে পারতেন। সমিতির আন্দোলন সংগ্রাম সব নিয়েও শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে শশিদা খুব সুস্পষ্ট এবং খুব জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত করতেন, যেটা আমাদের সাহায্য করেছে সমিতির আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে, সমিতির সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে। আর শশিদা খুব সরল এবং সহজ জীবন যাপন করতেন। অবশ্য তখনকার দিনে এই ধরণের যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই এই সহজ এবং সরল। কিন্তু মতের দিক থেকে তাঁরা খুব পরিষ্কার ছিলেন। মতের দৃঢ়তা তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেতো। শশিদার মধ্যে দিয়েও আমরা সেটা দেখেছি। ১৯৮০ সালে সমিতির কাঁথি সম্মেলনে সমিতির যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে যে ধারাগুলি ছিল তারমধ্যে একটি নতুন ধারা সংযোজন হয়। সে সংযোজন হচ্ছে যে, আমরা যে আন্দোলন করছি শিক্ষায় এবং শিক্ষকদের বিষয় নিয়ে, শিক্ষকদের পেশা নিয়ে, জীবন-জীবিকা নিয়ে শিক্ষার প্রসারের জন্যে। যে সমাজ ব্যবস্থায় আমরা আছি, এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সেটা পুরোপুরি সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এবং সেটা সম্ভব এই সমাজের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, সেটা অন্য সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের মধ্যে। সেইজন্য আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে যেটা না আসে যে শিক্ষক- শিক্ষাকর্মী এবং ব্যাপকভাবে সমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা আমাদের নিয়ে যেতে হবে। এই যে বিষয়টি আসে, এই বিষয়টি সমিতির লক্ষ্যের মধ্যে আনার ক্ষেত্রে আমি যাদের আলোচনা জানি শশিদা সেখানে একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে শশিদা মনে করতেন শুধুমাত্র এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার যে সমস্যাগুলি আছে সেই সমস্যাগুলির পুরোপুরি সাফল্য লাভের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। শশিদা দীর্ঘদিন হুগলী জেলার সম্পাদক ছিলেন, পরবর্তীকালে সভাপতি হয়েছিলেন। আর নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং ওয়ার্কিং ও ফাইনান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালে অমূল্যনাথ লাহিড়ীর জীবনাবসানের পর, বলে গেছে অমিতাভ, তিনি আমাদের যে মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। আমার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮৭ সালে আমি যখন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হই তখনও শশিদা মুখপত্রের সম্পাদক ছিলেন। আপনারা জানেন যে ১৯৭০ সালে চন্দননগর কনফারেন্সে যেখানে এখানে প্রচেষ্টা চলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে বা তার মধ্যে বিভেদ এনে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, সেই ইতিহাসে আমি যাচ্ছি না। চন্দননগরের সেই কনফারেন্সে যে সংখ্যক সদস্য ছিলেন, আপনারা জানেন যাঁরা একটু বেশী বয়সের, আগে প্রতি বছরই সম্মেলন হতো, সেখানে সকল সদস্যই ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন। সেখানে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে এই সম্মেলনকে সমস্ত প্ররোচনা, বিশৃংখলা সত্ত্বেও সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা ছিলেন শশিদা তার অন্যতম। শশিদার মধ্যে এমনি বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো একজন সাধারণ এবং সাদাসিধে লোক, কিন্তু তাঁর কাজের প্রতি যে নিষ্ঠা ও মতবাদের প্রতি তাঁর যে দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি আমরা যারা বয়োঃকনিষ্ঠ ছিলাম তাদের প্রতি যে আচরণ, ব্যবহার, এঁদের নেতৃত্বের পথে উন্নীত করেছিল। এঁরা বলতেন যে শিক্ষক হিসাবে তোমার প্রথম কাজ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যে ছেলেটি বিদ্যালাভের জন্য আসছে, তাদের তুমি যথাযথভাবে গড়ে তোলার দায়িত্বে লিপ্ত, সেই কাজটি তোমাকে করতে হবে প্রথমেই। আমি এই কথা বলছি এই জন্যে যে আজকের দিনে কিছু কিছু প্রশ্ন এসে দেখা দিচ্ছে। এঁরা বলতেন, সেই কাজটা প্রথম তোমাদের করতে হবে। একজন ভালো শিক্ষক, সমাজের ক্ষেত্রে যে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে সেটা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব না। এবং সেইসঙ্গে এটা করার সঙ্গে সঙ্গে শুধু এইটুকুই করলে হবে না, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের, আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতার পরবর্তী আমলে কী দুর্বিষহ জীবন-যাপন করতে হয়েছে দীর্ঘকাল। এর বিরুদ্ধে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে শশিদার যে ভূমিকা, সে ভূমিকা অবিস্মরণীয়। কোনোদিন ভোলা যাবে না।

এ বি পি টি এ'র প্রবীণ নেতা প্রশান্ত বসুর ভাষণ

তিনি বলেন, এ বি টি এ এবং এ বি পি টি এ অফিস খুব কাছাকাছি ছিল। শশিদা বসতেন কফি হাউসের বাড়িটায়। আমার দপ্তর কলেজ স্ট্রীটে—এখানে তিনি প্রায়ই আসতেন। আমি ছিলাম এ বি পি টি এ'র মুখপত্রের সম্পাদক। আর শশিদা ছিলেন শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পাদক। উভয়ে সম্পাদকীয় নিয়ে পরামর্শ করতাম। মন্মথনাথ অধিকারী পুরশুরায় থাকতেন। শশিদা পুরশুরায় শিক্ষকতা করতেন। ফলে দুজনের মধ্যে আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক ছিল। দু'জনের মধ্যে কে সেঞ্চুরী করবে। মন্মথদা, শশিদা উভয়েই চলে গেলেন। শশিদার ত্যাগ ও নিষ্ঠা আমরা অনুসরণ করতে পারছি কিনা দেখতে হবে। সেটাই আসল কাজ।

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেন, জার্মানীর নাৎসীরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে আক্রমণ করেছিল বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার আজ ভারতের বুকে সেই আক্রমণ নামিয়ে



আনছে। এর মোকাবিলায় শশিদার মতো নেতার দৃঢ়তা ও সংগ্রামী মনোভাব আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক।

জীবন্ত শবদেহ

(সমিতির প্রবাদপ্রতিম নেতা প্রয়াত শশিমোহন ভট্টাচার্যের ২৮শে ফেব্রুয়ারী স্মরণসভায় পঠিত)

অশোক অধিকারী, হাওড়া

এই নিথর সাড়ে তিন হাত শরীরের ওপর ফুলগুলি কথা বলে উঠল
সাদা কাপড়ের ভেতর থেকে কথাগুলি জীবন্ত শিশির হয়ে ঝরে পড়ল স্মৃতিসভায়
তখনও রোদ যায়নি সরে, শীতের আগুনে তখনও শরীর লুকানো উষ্ণতা
এ সময় সবচেয়ে জরুরী যারা, তারাই চলে যায় নাম কাটিয়ে উপস্থিত খাতায়
না। তোমাকে নিয়ে কোনো শব্দ, কবিতা এইসব বাক্যস্ফূরণ বড়ো বেমানান
তুমি তো নীরব ছিলে না কখনও ঃ তবু তোমার জন্যে এইসব নীরবতা পালন
তুমি তো লেখায় ছিলে প্লুতধ্বনি ঃ হেঁকে যাও সংগ্রামী জীবন শেষ প্রহরে
তোমার কোনো দ্বিতীয় ছায়া ছিল না, তুমি ছায়া দিতে ডালপালায়, স্বাবলম্বী
তোমার কোনো ভিন্নস্বর ছিল না, তুমি ছিলে সাহসী মৃত্যুর পক্ষে
প্রতিদিন চলে যায় অনেক জীবন। সেইসব জীবনের দায় নেই বাঁচামরায়
তারি ফাঁকে কথা বলে তোমার আর তোমাদের অস্তিত্ব উপমান
সেইসব শব্দ জুড়ে অস্তিত্ব ফসল, জল দেয়, ছায়া দেয়, আরো কত অবাধ বিচরণ
তুমি জেনে গেছ দীর্ঘ হত্যা দিয়ে লেখা হয় নিরপেক্ষ ধর্মাচরণ
তুমি দেখে গেছ মসজিদে লেখা হয় মন্দিরের রক্তস্বাক্ষর
আকাশের উর্ধ্বকুয়াশায় ঝুলে থাকে ক্ষুধার প্রকৃতিবিজ্ঞান
দেশ কার, কাদের স্পর্ধা দিয়ে লেখা হয় হতভাগ্য শিবিরের পাঠক্রম
বে-আইনী অস্ত্র নিয়ে যে পরাধীন স্বপ্নগুলোর চোখ ফুটিয়েছিলে একদিন
সেদিনও বর্গী ছিল। লুঠেরা লুঠে নিত জীবন যৌবন পরাক্রমে
আজও তারা অন্য নামে গাজনের ভণ্ড বহুরূপী। আমরা মানিনা তোমার
শুয়ে থাকা শবের পুতুল। আমরা বিশ্বাস করি না এই মৃত্যু
যার পাশে রুগ্ন শোকগাথা। এখনই দাঁড়াবে তুমি, স্পষ্ট কলমে লেখা চাই
সম্পাদকীয় নিবিড় শব্দে, কাঁপা কাঁপা হাতে উঠে আসবে যে অক্ষর
তাই দিয়ে শিক্ষা বাঁচে সহস্র বছর। সংগ্রাম টিকে থাকে
আরো এক আরম্ভের প্রতিজ্ঞায় ঃ জীবন সম্বল করে

প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ

ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

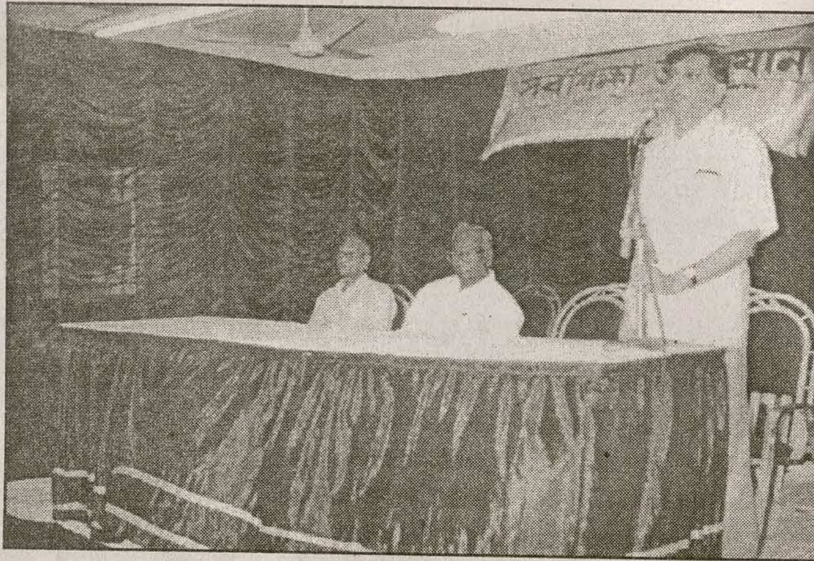
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অভিমুখীকরণ
রাজ্যস্তরে মুখ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মশালা (অংশগ্রহণমূলক)
২৭, ২৮ এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

গত ২৭, ২৮ এবং ২৯শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ ডিরোজিও ভবনে তিনদিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত করল। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অভিমুখীকরণ ছিল এর লক্ষ্য। উদ্দেশ্য রাজ্যস্তরে মুখ্যসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি। ১৯টি জেলার প্রায় ১৫০-এর অধিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা 'we shall over come' এই সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে কর্মশালার সূচনা করেন।



কর্মশালার উদ্বোধন করতে গিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, এই কর্মশালায় রাজ্যের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যদের, ডিপিওদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন। এই কর্মশালার মাধ্যমে পর্ষৎ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের গুরুত্বকে প্রচার করতে চায়। কি করলে গুণগত মানকে বাড়ানো যায় সেটা নিশ্চয় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে। শরীরশিক্ষা, কর্মশিক্ষা নিয়েও আলোচনা করুন। এই কর্মশালা থেকে পর্ষৎ যেন পথনির্দেশ পায়। অতিরিক্ত রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা, সর্বশিক্ষা অভিযান, শ্রীশান্তি বিশ্বাস বলেন, সর্বশিক্ষা মানে সবার শিক্ষা। যারা (৫-১৪ বছর বয়স) স্কুলে দারিদ্র্যের কারণে যেতে পায় না তাদের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্য চাই ভালবাসা — আর এই কাজকে সফল করার জন্য আবেগ। গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার তাগিদ ছিল, আছে। সর্বশিক্ষা অভিযানে স্কুলের ঘর তৈরি করার, বইপত্র কেনার টাকা যোগাবে। আমরা প্রস্তাব দিয়েছি এস সি/ এস টি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়-পিছু ১০ হাজার টাকা দিতে হবে। চাই দরদী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশিক্ষার জন্য ৭২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন, আমরা চেয়েছিলাম ১০৪৫ কোটি টাকা। মাত্র ১ মাস আগে ঐ ৭২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার ৩৭ শতাংশ



এসেছে। পেয়েছি ফেব্রুয়ারির শেষে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে চলছে কেন্দ্রীয় সরকার। সত্য কথাটা বলতেই হবে আপনাদের।

অনেকে মনে করেন, সর্বশিক্ষা অভিযানের কর্মশালা মানে খাওয়া-দাওয়া আর গাড়ীর খরচ। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ডাকবো কর্মশালায়, তাদের একটু খেতে দেব না, গাড়ী ভাড়া দেব না? এত অল্পসময়ে কাজটা উঠবে কি করে? এসব হলো ভুল বার্তা। শিশুর স্বপ্ন যাতে মরে না যায় সেই ব্যাপারে আমাদের সকলকে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হবে।

কর্মশালার ভিত্তিপত্রের উপস্থাপনা করেন কর্মশালার মুখ্য পরিচালক শিক্ষাবিদ্ প্রশান্ত ধর। তিনি বলেন, সর্বশিক্ষা অভিযান সফল করতে সংগঠিত গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি ভিত্তিপত্রের 'প্রাক্ কথন' অংশ থেকে যেটি পর্ষৎ সভাপতি মাননীয় দিব্যেন্দু হোতা লিখেছেন, নিম্নলিখিত অংশটি পড়ে শোনান : "প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিক শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী ছাড়া শিক্ষার ভবিষ্যৎ আদৌ উজ্জ্বল নয়। সেই জন্য সকলের জন্য শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার কাজে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী অভিমুখীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাস্তব পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে বৃহদায়তন শ্রেণীকক্ষের শিখন প্রক্রিয়ার সফল রূপায়ণের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি প্রকরণ বিষয়ে নিবিড় অভিমুখীকরণ একান্ত জরুরী। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছে।" তিনি বলেন, বৃহদায়তন শ্রেণীকক্ষের জন্য ভয় করলে চলবে না — সংখ্যাটা সর্বশিক্ষার ফলে আরও বাড়বে, এই সংখ্যাটাকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। গড়বুদ্ধিকে মেনে নিয়ে শ্রেণীকক্ষে পঠনক্রিয়ায় ৩০ শতাংশ সময় পাঠের উপস্থাপনায় ব্যয় করে বাকি ৭০ শতাংশ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ব্যয় করতে হবে। নেতিবাচক অবস্থার মুখোমুখি হলেও আমাদের কাজ করতে হবে। শিক্ষক ছাড়া আর কেউ একাজ করতে পারবে না। ফ্রান্সের আন্দোলনরত ছাত্ররা তাই ধ্বনি দিয়েছিল 'No teacher, No future'। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আগে পরিকাঠামো তৈরি হোক তবে পড়াব — এটা ঠিক যুক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতাকাহিনী'তে শিক্ষকের অভাব ছিল তাই পাখিটা মরেছে সোনার খাঁচাতেই। আমাদের অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে হবে। আশা করব, শিখন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো দলগত আলোচনায় উঠে আসবে। প্রেষণার গুণগত অংকটা নির্দিষ্ট মানে নিয়ে যেতেই হবে। ১৬টি দল হবে। আলোচ্য বিষয় ৮টি। প্রতি দলের একজন সঞ্চালক থাকবেন। শেষদিনে ঐ ৮টি বিষয়ের পুনরালোচনা হবে। আর প্রতিদিন সঞ্চালক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন রাখবেন।

পর্ষদের বিশেষ আধিকারিক শ্রীপূর্ণানন্দ প্রধান বলেন, সমাজের পশ্চাদপদ অংশ, শিশু-শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রেষণা জাগাতে হবে। এই আলোচনাকে জেলা, মহকুমা স্তরে নিয়ে যেতে হবে। মানব সম্পদকে শক্তিশালী না করলে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ভেঙে পড়বে।

কলকাতা সর্বশিক্ষা অভিযানের সভাপতি রঘুনাথ মিত্র সর্বশিক্ষা অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে যে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দেন। কলকাতায় ১৯% নিরক্ষর। আর্থ-সামাজিক কারণে সবটা সাড়া জাগাতে পারিনি। এ কাজ করতে হবে। ফাঁকটা পূরণ করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ আর সর্বশিক্ষা অভিযান আলাদা নয়। যা কিছু

হচ্ছে সবটাই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আওতায়। DISE (District Information System of Education) form নিখুঁতভাবে পূরণ করে পাঠানো হচ্ছে না। এটা গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। মা-বাবার দেওয়া বার্থ সার্টিফিকেট যথেষ্ট। পর্ষৎ এটা মানে। ১৫-র বেশি বয়স হলে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। বিদ্যালয়-ছুটদের জন্য সেতু পাঠক্রম প্রত্যাখ্যান করলে চলবে না। এই অভিযানের ইতিবাচক দিকটায় গুরুত্ব দিতে হবে। অবহেলিতদের বিদ্যালয়ে জায়গা করে দিতেই হবে। এরপর ১৬টি দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা আলোচনা শুরু করেন।

দলগত কাজের জন্য নিম্নলিখিত আটটি বিষয় দেওয়া হয়ঃ

১। বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিখন প্রক্রিয়া সহ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অবহিত হওয়ার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি,



২। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের পটভূমি এবং সঙ্কটের স্বরূপঃ বর্তমান ব্যবস্থায় প্রতিকারের উপায়গুলি,

৩। শিক্ষায় সকল শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে,

৪। সামাজিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা,

৫। বৃহদায়তন শ্রেণীকক্ষে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়ার পদ্ধতি ও প্রকরণঃ সংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা যায় কিভাবে,

৬। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন, সংশোধনী পাঠ, মূল্যায়নের গ্রেড প্রথা ও পরিকাঠামোগতভাবে বিদ্যালয়গুচ্ছের ভূমিকা,

৭। পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক বর্ষপঞ্জী (ন্যূনতম ২০০ দিন শিখন দিবস),

৮। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বৃত্তিগত নৈতিকতা বোধ।

ভিত্তিপত্রে বলা হয়, শিক্ষণ প্রক্রিয়ার গুণগত মানোন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো গঠনমূলক পরামর্শ থাকলে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করে জমা দিতে হবে।

২৮ তারিখে কর্মশালা চলাকালীন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মাননীয় দিব্যেন্দু হোতা এসে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য রাখেন। শ্রীহোতা বলেন, সর্বশিক্ষা অভিযানের কথা বলা সহজ, করা কঠিন। দেখতে হবে মহকুমা ও বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এই চিন্তা-ভাবনাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে কিনা। আপনাদের সজাগ ও সতর্ক ভূমিকার ফলে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার আঙিনায় এসেছে। সবাই এই ভূমিকা পালন করেছেন, সেকথাটা বলা যাচ্ছে না। নিজেদের বিষয়টা বুঝতে হবে। পর্ষৎ এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত করাকে অর্থের অপব্যয় বলে মনে করে না। যে পরিশ্রম করছেন মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা অর্থ দিয়ে তার পরিমাপ হয় না। যে মডিউল আপনাদের দেওয়া হয়েছে তা বাইরেও প্রশংসিত। পর্ষৎ ও সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে চলেছি। শিক্ষার আলো যাঁরা পাবেন, তাঁরাই আপনাদের জয়গান গাইবেন। সেটাই আপনাদের পুরস্কার। এ জন্য কোনো বিজ্ঞাপনের দরকার নেই। এই কর্মশালার বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিনয় সরকার, অজিত সাহা, সমীর ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু প্রধান, মিত্রা ভট্টাচার্য (পর্ষৎ সদস্য), রীতা সেন (পর্ষৎ সদস্য), শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুময় রায় প্রমুখ।

২৯শে ফেব্রুয়ারি দলগত কাজের উপস্থাপন, আলোচনা ও খসড়া ভিত্তিপত্রের চূড়ান্তকরণ, গ্রহণ ও পুনঃপর্যালোচনা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অভিমুখীকরণ কর্মশালায় দলের সঞ্চালকবৃন্দের নামঃ রতনচন্দ্র বিশ্বাস, অচিন্ত্যকুমার পাত্র, রঞ্জিতকুমার মুখার্জী, স্বপনকুমার সাহা, রুদ্রদেব সাহা, বিজয়কুমার দে, দশানন শাসমল, চিন্ময়ী দে, প্রশান্তকুমার ঘোষ, অসীমকুমার অধিকারী, করুণাময় মুখার্জী, বিপুল চক্রবর্তী, অনুপকুমার দাস, জগৎপতি গড়াই, দীপ্তি সিন্‌হা ও দেবাশিস মুখার্জী।

— *নিজস্ব প্রতিনিধি*

প্রতিবেদন

আটটি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনসমূহের যৌথ আহ্বানে লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে কেন্দ্রীয় কনভেনশন

১৪ই মার্চ, ২০০৪, মৌলালী যুবকেন্দ্র সভাগৃহ, কলকাতা, বেলাঃ ৩টে

আগামী ১০ই মে, ২০০৪ পশ্চিমবঙ্গে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনেই রয়েছে বামফ্রন্ট মনোনীত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রার্থী। গত সাড়ে চার বছরে এন ডি এ সরকারের শাসনে দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক সঙ্কট ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং অর্থনৈতিক অনুগামী সরকার। দুই, এন ডি এ সরকার চরম দক্ষিণপন্থী অর্থনীতি গ্রহণ করেছে এবং তিন, সাম্প্রদায়িকতাকে সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণে, ইতিহাসের বিকৃতিকরণে এন ডি এ সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে। এক কথায়, দেশকে সার্বিকভাবে



সঙ্কটে জর্জরিত হয়েছেন দেশের ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষ তার থেকে পরিত্রাণ পেতে কেন্দ্রে চাই একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো দেশকে বাঁচানো। কারণ বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের কাজে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, অখণ্ডতা, সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন। এন ডি এ সরকারের মূল অপরাধ তিনটিঃ এক, এন ডি এ সরকার সবচেয়ে বেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিপন্ন করে তুলেছে। আর এখন এই অপরাধগুলি ঢাকা দেবার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডাহা মিথ্যা প্রচার করছে 'ফিলগুড' নাম দিয়ে। দেশের এমন বিপদে পশ্চিমবাংলার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ চুপ থাকতে পারেন না। তাই তাঁরা তাঁদের অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী জনগণের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা কি তা প্রচারের জন্য ১৪ই মার্চ, '০৪ পশ্চিমবাংলার আটটি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনসমূহের যৌথ আহ্বানে অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় কনভেনশনে শপথ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে উপ্‌চে-পড়া সভাগৃহে এই কনভেনশনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান জননেতা শ্রদ্ধেয় বিমান বসু। তিনি তাঁর ভাষণে কেন্দ্রের এন ডি এ সরকারের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ এবং ইতিহাস বিকৃতিকরণের অপরাধের কথা তথ্যসহ তুলে ধরেন। ৪২টি আসনেই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী হবার বাস্তবতা আছে বলে উল্লেখ করেন। কনভেনশন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়ঃ

ক্ষমা ভট্টাচার্য (সভানেত্রী, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি), সমর চক্রবর্তী (নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি), সোমেন ভট্টাচার্য (সারা বাংলা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতি), সুদীপনারায়ণ গোস্বামী (সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি), বাউল রায় (পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সঙ্ঘ), সুকুমার চক্রবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ), মানস চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি), নীপশ্রী মুখার্জী (বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি)।

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে ক্ষমা ভট্টাচার্য চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে কেন বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করতে হবে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে কনভেনশনের সূচনা করেন। এন ডি এ সরকারের শাসনে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি কিভাবে আক্রান্ত তার চিত্র তিনি তুলে ধরেন। কনভেনশনে শিক্ষক সংগঠনসমূহের যৌথ আবেদন পেশ করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য। যৌথ আবেদনের সমর্থনে নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেনঃ

- নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বিশ্বাস বলেন, ৪২টি আসনেই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য কর্মসূচী নিয়েছি আমরা। ৮টি সংগঠনকে যৌথভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।
- সারা বাংলা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তড়িৎ ব্রহ্মচারী বলেন, শিক্ষক সংগঠনসমূহের যৌথ আবেদনে বিস্তারিতভাবেই বলা হয়েছে দেশের বিপদের কথা। এন ডি এ সরকারের হাতে শিশুদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। এন সি ই আর টি'র পাঠক্রমে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। জনগণের কাছে খুলে এ কথা আমাদের প্রচার করতে হবে।
- বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন অপূর্ব কর। তিনি বলেন, সাড়ে চার বছরে মুখোশের আড়ালে থেকে দেশের সর্বনাশ ঘটিয়েছে বাজপেয়ী সরকার, আসল রূপ এখনও দেখিনি আমরা। তোগাড়িয়া, সিংঘল, আর এস এস, দুর্গাবাহিনী, বজরঙ দল বলছে বি জে পি ৩০০ আসন পাবে লোকসভায়। এ স্বপ্ন ওদের সফল হতে দেব না। তিনি জার্মানির ১৯৩৩ সালের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, হিটলার ঐ সময় এক অর্ধপাগল লোককে শিক্ষামন্ত্রী করেছিল। ঐ শিক্ষামন্ত্রী ঠিক এইভাবে পাঠক্রম বিকৃত করেছিল, শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল। শিক্ষার গৈরিকীকরণের চেষ্টার পরিণতি ভয়ঙ্কর। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতী বিকৃত আর এস এস দর্শন পাঠ্যসূচীতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কখনো ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়নি। তিনি মহকুমা, ব্লক স্তরে এ ধরনের সেমিনার, কনভেনশন করার আহ্বান জানান।
- পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আব্দুর রহিম। যারা ধর্মের নামে দেশকে টুকরো করতে চায়, তাদের পরাজিত করতে হবে। উদয় ভারত, ফিলগুডের স্লোগান দিচ্ছে ওরা অথচ ক্ষুধার খাবার পাচ্ছে না কোটি কোটি ভারতবাসী। ওদের পরাজিত করতে হবে, জেতাতে হবে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের।
- সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পক্ষে বিমল ভট্টাচার্য বলেন, এন ডি এ সরকারের সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রচার সংগঠিত করতে হবে।
- বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ মিশ্র। তিনি বলেন, এন ডি এ সরকার উন্নয়নের জন্য যে সুস্থ পরিমণ্ডল চাই, তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই সুস্থ পরিমণ্ডলের জন্য কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার রাহা বক্তব্য রাখেন। তিনি এন ডি এ সরকারের মিডিয়ার অপপ্রচার সত্ত্বেও শিক্ষকদের মানুষ শ্রদ্ধার আসনে রেখেছেন ; তাই আমাদের কর্তব্য হলো দেশের সামনে যে ঘোর বিপদ হাজির হয়েছে তার স্বরূপটা মানুষের কাছে তুলে ধরা।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় কান্তি বিশ্বাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তথ্য-সম্পৃক্ত ভাষণে এন ডি এ সরকারের মুখোশ খুলে দেন এবং বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রচারে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। উত্থিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

যৌথ কেন্দ্রীয় কনভেনশনে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুর উদ্বোধনী ভাষণ

কনভেনশনকে সময় উপযোগী আখ্যা দিয়ে শ্রদ্ধেয় বিমান বসু বলেন, যে সরকার দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা করার ক্ষেত্রে, যে সরকার দেশের মানুষের ঐক্য-সংহতি-সম্প্রীতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে, যে সরকার দেশের সম্মান পৃথিবীর মানুষের কাছে উর্ধ্বে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এবং যে সরকার দেশের মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে, সেই ধরনের সরকার গঠন করার জন্য শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষাকর্মীরা মনোনিবেশ করবেন — এ চিন্তা-ভাবনা সঠিক। ইতিহাস নির্দিষ্ট সময়ে এই ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হলে, শিক্ষকসমাজ তার ইতিহাস নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হবেন। স্বাভাবিকভাবেই, ১৯৯৯ সালে যে সরকার আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল, বি জে পি নেতৃত্বে এন ডি এ-জোট সরকার, তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে যে প্রচার করা হচ্ছে, তার যাথার্থতা কোথায়, সত্য কোথায়, মিথ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে এবং ডাহা মিথ্যে কিভাবে প্রচার হচ্ছে তা উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর বক্তব্য উত্থাপন করার প্রশ্নে শিক্ষকসমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আজকে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে যে কনভেনশন আপনারা করছেন, এই কনভেনশনে বিভিন্ন সংগঠনের বক্তারা বক্তব্য রাখবেন, মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস উপস্থিত আছেন, তিনিও বলবেন। আমি শুরুতেই বলব, শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, আমাদের দেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে অবস্থান তাকে ধ্বংস করার যে ছলাকলা শুরু হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে আমি অনুরোধ করব আপনারা অসংখ্য সেমিনারের আয়োজন করুন। বিভিন্ন এলাকায় আপনারা সেমিনারের আয়োজন করুন। নির্দিষ্ট করে কি পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী — সিলেবাস অ্যাণ্ড কারিকুলাম পড়ানোর জন্য এন সি ই আর টি'র পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কি ধরনের বই তৈরি হচ্ছে, অনৈতিহাসিক বিষয়কে ঐতিহাসিক বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চক্রান্ত চলছে — চক্রান্ত চলছে বলাটা ভুল — চক্রান্ত কার্যকরী করছে — এসব মানুষের কাছে উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

বেশি উদাহরণ দেব না। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ আমাকে দিতেই হবে। এন সি ই আর টি'র পক্ষ থেকে টেক্সট বই তৈরি হয়েছে, তার নাম 'মডার্ণ ইণ্ডিয়া'। 'মডার্ণ ইণ্ডিয়া'র লেখক সতীশচন্দ্র মিত্তাল। তিনি কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। কিন্তু এই পাঠ্যবইটি ভুলে ভরা। চুরি করা বিদ্যা এবং অনৈতিহাসিক বিষয়কে ঐতিহাসিক বলে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা। সাধারণ মানুষ জানবে কি করে? সাধারণ মানুষের জানার তো কোনো সুযোগ নেই। এন সি ই আর টি'র ডাইরেক্টর মিত্তালের এই বই সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "The whole character of Hostory is appeesed by new technique, invention and outlook". ইতিহাসের নতুন techniqueগটা কি? নতুন inventionটা কি? ইতিহাসের তো নির্দিষ্ট গ্রামার আছে — Histography, Histronomy তাকে বাদ দিয়ে তো ইতিহাস হতে পারে না। কিন্তু তাকে বাদ দিয়েই ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'মডার্ণ ইণ্ডিয়া' আর তাতে মন্তব্য করেছেন ডাইরেক্টর যে এই ইতিহাসের সমস্ত বিষয়বস্তু নতুন টেকনিকে হয়েছে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে হয়েছে। আপনার তো ডিসটর্ট (বিকৃত) করার কোনো অধিকার নেই। অনেকে Histography মানেন না কিন্তু Histography না মানলেও Distort করার অধিকার কারও নেই। এই বইয়ের ২৪৬ পাতায় লেখা হয়েছে জেনারেল ডায়ারকে ১৯৪০ সালে গুলি করে মারা হয়েছে। অথচ ডায়ার মারা গেছেন ১৯২৭ সালে। কী করে হল? আসলে প্রকৃত তথ্য হলো ১৯৪০ সালে যাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে, তিনি লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর মাইকেল ও' ডায়ার। এই বক্তব্য কারা তুলে ধরবে সাধারণ মানুষের কাছে? শিক্ষার কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাঁরাই তো তুলে ধরবে। মাইকেল ও' ডায়ারের বানান হলো 'DWYER' আর ডায়ার সাহেবের বানান হলো DYER। তাহলে সবটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এর পাঁচ লাইন পরে ঐ পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন, সাভারকর সুভাষচন্দ্র বসুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর দাদা রাসবিহারী বসু'র মতো তিনিও দেশ ছেড়ে চলে যান। একই পাতার শেষ দিকটায় রয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি তৈরি করার জন্য গান্ধীবাদীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। এর ফলে সুভাষ বসুকে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। সবাই জানেন কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা। সুভাষ বসু কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পরেই ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এগুলো তো পড়বে স্কুলের ছাত্ররা। এন সি ই আর টি'র প্রকাশিত বই 'কনটেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র কয়েকটি অংশ নেওয়া হয়েছে

বহু বছর আগে মুদ্রিত, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বই 'ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন' থেকে। বলা যায়, 'ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন' থেকে ভুরি ভুরি পুরো টুকে দেওয়া হয়েছে। বইটির ১৪ ও ১৬ পাতায় যা লেখা আছে ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশনের ৬০০, ৬০৪ ও ৬০৫ পৃষ্ঠায় তাই রয়েছে। হুবহু টুকে দেওয়া হয়েছে। কি শেখানো হচ্ছে ছাত্রদের? এই ছাত্ররা যখন জানবে জেরক্স কপি, টুকে দেওয়া হয়েছে তাদের পাঠ্যবইয়ে অন্য বই থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে? আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি বি জে পি নেতৃত্বে এন ডি এ-জোট সরকার ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, পুরাতত্ব, সাহিত্য, নাটক বা সিনেমা সব জায়গায় বি জে পি'র লোক চায়। শিশুদের জন্য যে চিল্ড্রেন্স ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন রয়েছে তার সভাপতি পদে বি জে পি'র লোক ছাড়া অন্য কাউকে সভাপতি করা যায় না। সভাপতি কে জানেন? ফিল্ম অভিনেত্রী রবিনা ট্যাণ্ডন। আর ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, তার সভাপতি কে? হেমা মালিনী। বি জে পি সদস্য না হলে তাকে বসানো যায় না। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, তাতে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ব্যবসায়ী পুরাতত্ত্ববিদ নন এমন লোককে সদস্য করা হয়েছে, চেয়ারম্যান করা হয়েছে, যাঁরা সঠিক অর্থে পুরাতত্ত্ববিদ নন। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাই, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সব শাখার ক্ষেত্রেও তাই। আমরা সবাই জানি, এই ধরণের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র একটি শোষণের যন্ত্র, রাষ্ট্রকাঠামোটা একটি শোষণের যন্ত্র। রাষ্ট্রকাঠামোকে পুষ্ট করতে উপরিকাঠামো তদনুযায়ী গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি — এই ধরণের গবেষণামূলক কাজ উপরিকাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সুপারস্ট্রাকচার — সুপারস্ট্রাকচারকে তৈরি করা হয় স্ট্রাকচারকে আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য। আমরা দেখছি বি জে পি নেতৃত্বে এন ডি এ-জোট সরকার গড়ে ওঠার পর থেকে বিভিন্ন সংস্থা, প্রচারমাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থা এমন কি সামরিক বিভাগ-এ বেছে বেছে আর এস এস-মনোভাবাপন্ন মানুষকে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দর্শনকে বিশ্বাস করে এমন মানুষকে সব বিশেষ বিশেষ পদে বসানো হচ্ছে। অনুরূপভাবে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতেও একই মনোভাব নিয়ে চলা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ জানবে কি করে? তাঁদের জানার কোনো সুযোগ নেই। তাই আপনাদের অসংখ্য সেমিনার করে এই বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয় হিসাবে তুলে ধরতে হবে। আমাদের নির্বাচন ৫৪৩টা লোকসভার আসনে। আমাদের রাজ্যে ৪২টা লোকসভা আসনে নির্বাচন হবে। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। রাজ্যের বামফ্রন্ট কোনো নির্বাচনী বোঝাপড়ার মধ্যদিয়ে তৈরি হয়নি। অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। এ ইতিহাস আপনাদের সব জানা আছে। লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের রাজ্যে পুরাতন দিনে হিন্দু মহাসভা নামে যে পার্টি ছিল বা তারপর জনসঙ্ঘ নামে যে পার্টি ছিল বা জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা দু'টোই ছিল তখন মানুষের মধ্যে তাদের অবস্থান তেমনভাবে ছিল না। সেই জনসঙ্ঘ আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি বি জে পি হয়েছে। আর কংগ্রেস থেকে একটা অংশ বেরিয়ে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নাম নিয়ে বি জে পি-কে হাতে ধরে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে নিয়ে এসেছে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, জনগণ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, নির্বাচনে বামফ্রন্টের ৪২টি আসনে বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য আপনাদের শিক্ষাগত কাজ, পরীক্ষার কাজ সমাপন করে প্রচার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন।

আমি একটা কথা অকপটে বলতে চাই, পশ্চিমবাংলার ৪২টি আসনে বামফ্রন্ট বিরোধীদের জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ৪২টি আসনেই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার মতো বাস্তব পরিস্থিতি আছে। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে কার্যকরীভাবে রূপায়িত করার জন্য শিক্ষার জগতে কাজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আবেদন রাখছি। আপনাদের আবেদন করব যে, আমাদের দেশটা অনেক বড়। আয়তনে ততো বড় না হলেও, জনসংখ্যায় একটা দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, কচ থেকে কোহিমা পর্যন্ত বামপন্থী আন্দোলন সমানভাবে বিকশিত হয়নি। বহু এলাকা আছে, যেখানে বামপন্থী আন্দোলন টিম টিম করে অবস্থান করে। একটা রাজ্য যদি ধরি, যে রাজ্যে নরমেধ যজ্ঞ হয়েছে, যে রাজ্যের নরমেধ যজ্ঞের নায়ক যিনি, তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন — গুজরাট। সেখানে বামপন্থী আন্দোলনের অবস্থানটা কি? আসন সেখানে খুব বেশি আছে তা না — বামপন্থী আন্দোলন খুব ক্ষীণ। এখন এরকম কিছু অবস্থা আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্য আছে যেখানে বামপন্থী আন্দোলন খুবই দুর্বল। উত্তরপ্রদেশ বিশাল রাজ্য, ভাগ হয়ে উত্তরাখণ্ড হয়েছে। সেখানে ৮০টা লোকসভার আসন। কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন সেখানে দুর্বল। কতকগুলো রাজ্য আছে — যেমন মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে বামপন্থীরা বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে একটা

ফ্রন্ট তৈরি করেছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের ৪৮টা লোকসভা আসনেই সর্বত্র প্রচার করার মতো শক্তি ঐ ছোট ফ্রন্টের নেই। কিছু অঞ্চলে তার অবস্থান আছে। আমাদের পাশের রাজ্য ওড়িশাকে যদি ধরি, তাহলে দেখব, সেখানে আসন সংখ্যা কম, ২১টা আসন আছে, কিন্তু সেখানে বামপন্থী আন্দোলন খুব দুর্বল। সীমিত। এই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধির মধ্যে রেখে পশ্চিমবাংলায় বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে ভিত্তি তাকে আরও মজবুত করতে হবে। পশ্চিমবাংলা, কেরালা বা ত্রিপুরায় এক ধরণের অবস্থানে রয়েছে — সব রাজ্য কেরালা, পশ্চিমবাংলা বা ত্রিপুরা নয়। তাই পশ্চিমবাংলায় অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক জীবনের বিনিময়ে, মানুষের লাঞ্ছনা, ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে যে আন্দোলন সংগ্রামের অবস্থান গড়ে উঠেছে তাকে মজবুত করার দায় এবং দায়িত্ব পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রপ্রিয়, দেশপ্রেমিক সব অংশের মানুষের মধ্যে যেমন আছে, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের।

আমি তাই আপনাদের আবেদন করব, আপনারা একটু পরিকল্পিতভাবে প্রচারের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করুন। আপনারা সেমিনার, আলোচনা চক্রের আয়োজন করে নির্দিষ্ট বিষয়গুলো বেছে নিয়ে মানুষকে অবহিত করুন। দেশের বিপদ আজকে কোন্ দিক থেকে এসেছে, কিভাবে এসেছে, কিভাবে আজকে দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জুনিয়র পার্টনার তৈরি করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে, কিভাবে ন্যাটো রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথভাবে ভারত সামরিক মহড়া করবে তা তুলে ধরুন।

এতো অকল্পনীয় বিষয়। কখনো ভাবা যায় না। ভারত ন্যাটোতে যাবে কেন? ভারত কোনো সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখনো অন্তত নয়। আর জোটের অন্তর্ভুক্ত হলে তো ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হতো না সিয়েটোর অন্তর্ভুক্ত হতো। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের চোখে পরিষ্কার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ক্রমাগত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা নীতি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মন তুষ্টি করে দেশের বাজারটা বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিয়ে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি করছে তা বিপজ্জনক। ৩০০০টা দ্রব্যসামগ্রী মানুষের প্রয়োজনে লাগে। এর থেকে ১৪২৯টি দ্রব্যসামগ্রী, পরিমাণগত বিধিনিষেধ না মান্য করে, একেবারে বিনাশুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে দেশের বাজারে বিক্রি করছে। তাই দেশের কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট, শিল্পক্ষেত্রে সঙ্কট, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্কট। আজকে দেশের লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেচে দেওয়া হচ্ছে। আবার লক্ষ্য করে দেখছি, শিল্প বেচে দেবার ক্ষেত্রে মালিক খোঁজার ব্যাপারেও একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে। ও এন জি সি এত বড় একটা সংস্থা তার শেয়ারের মূল্য কমানো হয়েছে, তাকে বিক্রি করার কথা চলছে, আলোচনা হয়ে গেছে এবং বিক্রি করতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানিকে, যে কোম্পানিটি হলো ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কোম্পানি। এইভাবে দেশের সম্পদ বেচে দেওয়ার নীতি নিয়ে যে সরকার চলছে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করছে যে সরকার, সেই সরকারের পক্ষ নিয়ে যারা দাঁড়ায় বা যাঁরা আমাদের দেশে উদারীকরণের অর্থনীতি চালু করেছে সেই কংগ্রেস পার্টি — ১৯৯১ সালে তারাই উদারীকরণের অর্থনীতি চালু করে, তাদের জনগণ থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে আজকের কনভেনশন থেকে আপনারা সবাই মিলে এই প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হন ১৯টি জেলায় — বুদ্ধিজীবী মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে, সাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য উত্থাপন করুন যে সরকার দেশের মানুষের সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য বিপন্ন করছে, যে সরকার দেশকে বেচে দেওয়ার নীতি নিয়েছে, যে সরকার আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অনৈতিহাসিক বিষয় শেখাবার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, সেই সরকারের প্রতিনিধিদের জনগণ থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে এবং কংগ্রেসকে জনগণ থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমবাংলায় ৪২টি লোকসভা আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের আমরা জয়যুক্ত করবই করবো — এই স্লোগানের ভিত্তিতে আপনারা অগ্রসর হবেন, এই প্রত্যাশা করে আপনাদের কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি।

যৌথ কেন্দ্রীয় কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের সমাপ্তি ভাষণ

মাননীয় কান্তি বিশ্বাস কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বলেন, "শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়, তারা চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসকশ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।" কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে এই কথার তাৎপর্য এখনো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কেন বিবেচনা করতে হবে? গত ৫ই নভেম্বর থেকে ১১ই নভেম্বর ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে দিল্লিতে আয়োজিত

একটি 'সকলের জন্য শিক্ষার' কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষামন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান সেই কনভেনশনে যোগদান করেছিলেন। এই কনভেনশনে ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে একটা দলিল প্রকাশ করা হয় — তার নাম 'এডুকেশন ফর অল ঃ আছে। উপরিউক্ত 'এডুকেশন ফর অল' দলিলের ২৮৯ পৃষ্ঠায় একটি তথ্য দেওয়া আছে ঃ বিশ্বের এখানে ৯৪টি বিকাশমান দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স বাদে) শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নসূচক দিয়েছে। এই ৯৪টি দেশের



গ্লোবাল মনিটরিং, ২০০৩-২০০৪।' সেই দলিলে বলা হয়েছে, যাদের বয়স ১৫ বছরের বেশি, এমন যত মানুষ বিশ্বে আছেন, তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানে না পৃথিবীতে এদের সংখ্যা ৮৬ কোটি। এই ৮৬ কোটি নিরক্ষর মানুষের মধ্যে ভারতবর্ষে বসবাস করে ২৯ কোটি। বিশ্বের ১৭ শতাংশ মানুষ বাস করে ভারতবর্ষে। আর বিশ্বের বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের ২৯ শতাংশ মানুষ বাস করে আমাদের এই ভারতবর্ষে। স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও এই বেদনাদায়ক চিত্র ঐ প্রতিবেদনের ৩০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। ভারতের যেকোনো মানুষ যেকোনো নাগরিক অত্যন্ত বেদনা অনুভব করবেন এই তথ্যে।

সারা পৃথিবীতে বিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা ৫ কোটি। ভারতে প্রাথমিক স্তরে আছেন ২০ লক্ষ শিক্ষক আর মাধ্যমিক স্তরে আছেন ৩০ লক্ষ শিক্ষক। মোট ৫০ লক্ষ। পৃথিবীতে যত শিক্ষক আছেন বিদ্যালয় স্তরে, তার ১০ শতাংশ আছে ভারতবর্ষে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো আমাদের পশ্চাদপদতাকে দূরীভূত করবার জন্য যারা পরিকল্পনা রচনা করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কত অস্বচ্ছতা

মধ্যে ভারত রয়েছে ৭৬তম স্থানে অর্থাৎ আমাদের নিচে রয়েছে মাত্র ২৮টি দেশ। এই সব তথ্য যখন বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়, পড়তে গিয়ে কষ্ট হয়, অসম্মানে মাথা নিচু হয়, লজ্জা হয়। স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও এই দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের।

এত পশ্চাদপদতা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার জন্য কি করা হয়েছে? প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যত অর্থ বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল তার ৭·২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল শিক্ষার জন্য। আর দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, যেটা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা, মোট বরাদ্দের মাত্র ২·৯ শতাংশ জুটেছে শিক্ষার ভাগ্যে। দশটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে কম অর্থ বরাদ্দ করেছে দশম পরিকল্পনায়। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কি।

বিশ্ব শিক্ষা প্রতিবেদন, ওয়ার্ল্ড এডুকেশন রিপোর্টে লেখা

হয়েছে গোটা পৃথিবীতে সমস্ত সরকার শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে, ভারতের অংশ তার মধ্যে ০·৯ শতাংশ মাত্র। আমি তাদের সদর দপ্তর সুইজারল্যাণ্ডে টেলিফোন করেছিলাম যে, 'তোমাদের তথ্য কি সঠিক?' উত্তরে তারা বলল, 'তোমার কাছে যত বেদনাদায়ক হোক না কেন, এটাই সত্য।'

সারা পৃথিবীর নিরক্ষর মানুষের ৩৪ ভাগ মানুষ এদেশে বসবাস করেন। অথচ সারা পৃথিবীতে যদি ১০০ টাকা খরচ হয় শিক্ষাখাতে, তবে এদেশে খরচ হয় মাত্র ৯০ পয়সা। সীমাহীন উপেক্ষা, অবহেলা — এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়।

'মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন' ২০০৩-এর উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করছি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন প্রতি বছর প্রকাশ করা হয়। নারীর মর্যাদা, মানুষের জীবনযাত্রার মান, শিক্ষার সুযোগ, অসুস্থ হলে পরে চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি বিবেচনা করে মানবিক উন্নয়নসূচক তৈরি করা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে এখন থেকে তিন বছর আগে ২০০১ সালে ১৭১টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১১৫ নম্বরে। ২০০৩ সালে ভারত নেমে এসেছে ১২৭ নম্বরে মাত্র দু'বছরের মধ্যে। এরপর শিক্ষকসমাজ কি শুধু শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই তার দায়িত্ব শেষ করবে? না, এই অবস্থার অবসানের জন্য শ্রেণীকক্ষের বাইরেও তারা দায়িত্ব পালন করবে?

সম্প্রতি একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন আমাদের হাতে এসেছে। বিশ্ববিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ জে পি নুয়েশা ভারতের ৭টি শহরে এক সমীক্ষা চালিয়েছেন। শহরগুলি হলোঃ দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ এবং আমেদাবাদ। এই সমীক্ষায় 'সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (useful) ব্যক্তি কে' — তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্ধারিত হয়েছেন শিক্ষক ১৫·৯% পেয়ে। ডাক্তার ১৪·২% পেয়েছেন। স্বাভাবিক কাজকর্ম যাঁরা করেন, পেয়েছেন ১২·৮%, কৃষক পেয়েছেন ১১·৮%, আমরা যারা রাজনীতি করি, তাঁরা পেয়েছেন ১৪ নম্বর স্থান আর শিক্ষকদের স্থান হয়েছে ১ নম্বরে। যে শিক্ষকদের সমাজে ১ নম্বরে স্থান, দেশে যখন সার্বিক সঙ্কট থাকে তখন তাঁরা কি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের মধ্যে তাদের দায়িত্ব শেষ করতে পারেন? আজকের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে শিক্ষকরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবেন — এ আশা করাই যেতে পারে। চতুর্দশ লোকসভাকে সামনে রেখে কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য আমি আপনাদের কাছে হাজির করতে চাই। ১৯৯৮ সালে ভারতবর্ষে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে বি জে পি মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ২৫·৬ শতাংশ পেয়েছিল। লোকসভায় ১৮২টি আসন পেয়েছিল বি জে পি। ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন হয় ১৯৯৯ সালে। এই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ২৩·৭৫ শতাংশ পেয়েছিল বি জে পি। ১৯৯৯ সালে ৫৪৫টি আসনের মধ্যে বি জে পি পেয়েছিল ১৮২টি আসন। কিন্তু ১১২টি আসনে বি জে পি দ্বিতীয় হয়েছিল। এবারে তাদের রণকৌশল হলো ১৮২টি আসন ধরে রাখা এবং আরও ১১২টি আসনে জয়লাভ করা। ২৯৪টি আসনে তারা জয়যুক্ত হতে চায়। ২৯৪টি আসন পেলে লোকসভায় তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে। তারা বলছে ২৯৪টি আসনে আমাদের জয়ী করুন, তাহলে যে কাজ আমরা একটু একটু করেছি তা পূর্ণাঙ্গভাবে করতে পারব। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজকে এই কথা বিবেচনা করতে হবে বি জে পি গত ৫ বছরে আংশিক কাজ যা করেছে, সে কাজ যদি পূর্ণোদ্যমে করতে চায় তাতে দেশের মঙ্গল হবে, না সর্বনাশ হবে।

রাজ্য সরকার প্রকাশিত মানবোন্নয়ন রিপোর্ট, ২০০৩ বলছেঃ ভারতের মোট উপার্জিত আয়ের ৮ শতাংশ যায় ২০ শতাংশ নীচের তলার মানুষের কাছে আর উপরতলার ১৯ শতাংশ মানুষ মোট আয়ের ৩২ শতাংশ ভোগ করে। ১৯১টি দেশের মধ্যে দারিদ্র্যের বিচারে ভারতের স্থান ১৬২ নম্বরে। যদি মহম্মদ ইকবাল বেঁচে থাকতেন, তাহলে বলতেন 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' গানটি লিখে ভুল কাজ করেছি।

কেন্দ্রীয় সরকারের ইকোনমিক সার্ভে বলছে, ১৯৯৮-এর ৩১শে মার্চ তারিখে সারা দেশে অনাদায়ী করের পরিমাণ ছিল ৪৭ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা। ২০০২ সালের ৩১শে মার্চ অনাদায়ী করের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৮৬ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের ইকনমিক সার্ভে রিপোর্ট, ২০০২-২০০৩ বলছে (এটা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের রিপোর্ট নয়), ১৯৯৮-৯৯ সালে বিদেশের কাছে ভারতের ঋণ ছিল ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা, যখন ওরা ক্ষমতায় আসে। আর এখন, গত বছর ২০০৩-এর জুন মাসে এই বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০ কোটি টাকা। ভারতে মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ ৪৬৬০ টাকা। ভারতের এত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের কাছে আমাদের পরিচয় সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ হিসাবে।

এটাই শেষ নয়। আন্তর্জাতিক স্বচ্ছতা নিরূপণ সংস্থা বা Transperency International একটা সমীক্ষা করেছে। সারা বিশ্বের স্বচ্ছতা সমীক্ষা করেছেন সুইডেন, নরওয়ে, জার্মান, ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবীরা Transperency International-এ। ২০০৩ সালে Transperency International Report : ১০২টি দেশের তথ্য তারা সংগ্রহ করেছে। স্বচ্ছতায় এক নম্বরে আছে সুইডেন, দুই নম্বরে আছে নরওয়ে, আর ভারতের স্থান ৭১ নম্বরে। আমাদের সান্ত্বনা এই যে, আমাদের তলায় ৩১টি দেশ আছে, যেখানে আমাদের থেকেও ঘুষ খায়, আমাদের মতো ৩২ হাজার কোটি টাকার শেয়ার কেলেঙ্কারী হয়, মৃত সৈনিকের কফিন কিনতে ঘুষ খায় প্রভৃতি।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২জন বামপন্থী প্রার্থীদের মধ্যে ৯জন একদা শিক্ষক। সারা দেশে আর কোথাও প্রার্থীদের মধ্যে এই অনুপাতে শিক্ষকদের অবস্থা নেই। এ রাজ্যে শিক্ষকদের মর্যাদা সবার ওপরে। এ রাজ্যের সচেতন মানুষের কাছে গোটা দেশের প্রত্যাশা আজ বিশাল। নির্বাচনী বৈতরণী পার হতেই নির্লজ্জ অপপ্রচারে নেমেছে বি জে পি সরকার। সারা দেশে ৪৫৫টি সংবাদপত্রে ৩৯২ রকমের বিজ্ঞাপন দেখানো হয়েছে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ১০০টি চ্যানেলে ৯ হাজার বার প্রদর্শিত হয়েছে বিজ্ঞাপন। নির্লজ্জভাবেই দেখানো হচ্ছে ভারত চকচক করছে, ভারত জেল্লা দিচ্ছে, ভারত উদয় হচ্ছে।

১৮৫৭ সালের ১০ই মে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে এ বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। আগামী ১০ই মে সেই ঐতিহাসিক দিনটির কথা স্মরণে রাখবেন বাংলার মানুষ।

প্রতিবেদক ঃ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অনিলা দেবী অমর রহে

সেবা চক্রবর্তী, হাওড়া

আগুন-রাঙা ফাগুন দিনে
তোমার প্রয়াণ শ্রাবণ আনে।
চোখের জল আর গভীর শ্বাসে ;
মনের কোণে তোমার আশে ;
তোমার চলার পথের ধ্বজা ;
বহন করে চলব সোজা।
দেবী তুমি অনিলা,
তোমার স্মরে পথ চলা,
এ বি টি এ'র সংগঠন,
তোমার যত্নে বর্দ্ধমান।
পর্ষদে আর কাউন্সিলে,
বজ্রকঠিন স্বর তুলে
উননব্বইটি বসন্ত করলে তুমি পার।
নব্বই-এর বসন্তে আজ করি হাহাকার।
তোমার ত্যাগে তোমার স্নেহে তোমার মমতায়,
নারীজাতির উন্নয়ন হয় আপন প্রতিষ্ঠায়।
চোখের জলে তর্পণ নয় দৃঢ় করি মুষ্টি,
শপথ করি বজায় রাখবো তোমার কর্মসৃষ্টি।
আপোষ নয় ; হার মানা নয় ; জয় আমাদের হবেই
মোদের স্মৃতি মোদের চিন্তায় তোমার স্মৃতি রবেই।
অশ্রুভরা চোখে শপথ নিয়ে বুকে স্মরি তোমার নীতি।
দিদি তুমি সাথী তুমি লহ মোদের রক্তরাঙা প্রণতি।

পাবলো নেরুদার প্রতি

সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায়
সহ-শিক্ষক, চেতলা বয়েজ হাই স্কুল, কলকাতা

সম্পর্কের পাড় ভাঙার
মাঝে আমরা খুঁজে চলেছি ডাঙা
কয়েকজন মূঢ়
গূঢ় উদ্দেশ্যে একাকার করে হাহাকার
বুকের অন্তর্গত রক্তস্রোত ;
দূর থেকে প্রেরণা, জ্বলন্ত ধৈর্য্যের প্রশ্রয়
শিল্পের অন্তর্মুখী ভূমি থেকে
সূর্যমুখী মন নিয়ে বেড়ে উঠেছিলে তুমি
নিঃশ্বাস নেবার, বিশ্বাসের আশ্রয়
উঠে দাঁড়াবার কিস্তৎ

অনিলা দেবীর প্রতি

দেবযানী চৌধুরী, সহ-শিক্ষিকা
বন্দীপুর আইডিয়াল একাডেমী, উত্তর ২৪পরগণা

হে নির্ভীক, হে শিক্ষাব্রতী প্রাণ,
এখনো বাজে তোমার দৃপ্ত সঞ্চার
আমার মর্মের মাঝে।

এখনো দেখি তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত আকাশ-পানে,
কোন এক নব দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞায়।

শুনি তোমার নিরলস সংগ্রামের কথা
জ্বালাতে শিক্ষার আলো, সাধারণের মাঝে।

শুনি তোমার উদাত্ত আহ্বান, নারীমুক্তির পথে, বিনিদ্র রাতে,
খুঁজে ফেরে মুক্তির অদৃশ্য গলিপথ,
অজস্র-অসংখ্য মেঠোপথ, রাজপথ ধরে।

তোমার অনশনে-বিধ্বস্ত দেহের নীরব সহিষ্ণুতা
আমাদের মনে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে।
ফিরে আসে লুপ্ত চেতনা,
সংকল্পের শিকড় বিদীর্ণ করে মাটি
প্রসারিত হয় কোন্ গভীরে!

কিন্তু আজ তুমি নিস্তব্ধ
ফাল্গুনী হাওয়া জানিয়েছে চির বিদায়।
দিকে দিকে আজ ঘৃণ্য পাশবিকতা,
বিশ্বায়নের হাটে যে আজ বিকোয় মানবতা।
তবু ক্ষয়িষ্ণু যেন আজ মানুষের প্রতিবাদ!

তাই তোমার প্রতিজ্ঞা
যেন হয় সকলের প্রতিজ্ঞা।
তোমার ছায়াখানি যেন
সেই পথে নিয়ে যায় টেনে।

সমবায়

ননীগোপাল জানা, প্রাক্তন শিক্ষক
বিষ্ণুপুর স্যার রমেশ ইনস্টিটিউশন, উত্তর ২৪ পরগণা

রক্ষা পেয়ে তুমি খর উত্তাপের হাত থেকে
অস্তিত্বের প্রশ্নে অটুট — আজ অম্লান সৌন্দর্য্য
শোষক পোকার উৎপাত অনাবৃষ্টির হাহাকার।
উন্মত্ত কালবোশেখির তাণ্ডব তবু উন্নত মগ্ডাল
বাজে ছন্দে আশাবরি নূপুর স্রষ্টার সাহচর্যে।

অতিবৃষ্টির ফোঁস ফোঁসানি — ভয়াবহ বন্যার ছোবলে
আলগা-আশাভরা মাটিহারা কিছু শিকড়
মাঘ শেষে অতিক্রমণ — একটানা বছর পঁচিশ।
সজ্জিত ফুলে ফলে যেন শুভ আগমন —
শুনি মধুময় কলতান রজত জয়ন্তী বর্ষে।

প্রদর্শক

(কল্পতরু সেনগুপ্ত স্মরণে)

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
প্রধান শিক্ষক, আনুলিয়া হাইস্কুল (এইচ এস), নদীয়া

বুকের ভিতর ছিল নজরুল মুখের ভিতর ভাষা
হাতের মুঠোয় ছিল সংগ্রাম মনের মধ্যে ব্রত ;
পরাধীনতার শৃঙ্খলভাঙা গানে ছিল উচ্চাশা
সুকঠিন শুচি সুতীব্র তবু ভঙ্গি অনুদ্ধত।

চোখে ছিল তাঁর সূর্যস্বপ্ন চিন্তায় গবেষণা,
চোখের তারায় দেশপ্রেম আর দৃষ্টিতে আরাধনা ;
আঙুলে কলম কলমে শক্তি রেখায় বর্ণমালা,
কর্মে কাব্য-সাহিত্য রস সুধা অমৃত ঢালা।

হাত পাতলেই পরম বস্তু ঝরায় যে গাছ তারি
এসো আজ সেই কল্পতরুর কল্পনা মনে আঁকি
হলুদ আলোর ঝর্ণা ধরায় যে পথিক দেয় পাড়ি
এসো আজ সেই প্রদর্শকের স্বপ্ন হৃদয়ে রাখি।

মুটে মজুরের কবিতা

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
শিক্ষক, হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, উত্তর ২৪পরগণা

বেচা কেনা
দু'বেলাই জল ঘাটি..... বাসন কোশনে
প্রহর জড়িয়ে হাতে এ বাড়ি, সে বাড়ি মাজাঘষা
তবুও যে কী অসুখী দেবী-মালকিন

না বাবা ! চটাই না আমি, ভয় পাই
..... কামাইয়ের জন্য যদি টাকা কাটে, তবে—
রুগ্ন শিশুটি নিয়ে উপোস, উপোস....

আমরা কোন সময়কে কিনতে পারি না (সত্যি ভাই)
আমাদের দু'বেলাই বেচতে হয় রোজ।

বেহিসেবি, কারো কিছু নই
দু'বেলাই কাজেকর্মে মাঠেঘাটে থাকি
শস্য, মাটি নাড়িচাড়ি বেলা থাকে পিঠে
মাঝে মাঝে ওর হাত পা ছোড়া, রক্তচক্ষু সই —

ভয় পাই ; এক গেঁয়ো চাষি তো বটেই
না মানলে তো দানাপানি-বন্ধ একটি দিন
তখনও মাঠটা ভরবে শস্যে কিংবা ফুলে
আমি ওর কেউ নই জেনে —
বেলা রেখে ধুলো পায়ে ফিরে আসবই।

মাটি মাখা পা দু'টিকে আশ্চর্য অভাব
তখনও আটকে রাখবে কেন ?
আমি তবে বেহিসেবি, কারো কিছু নই !

স্বদেশ

রঞ্জিতকুমার সরকার
বহুলা শশীস্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, বর্ধমান

দগ্ধ মধ্যদিনে কোন্ গূঢ় দ্রাঘিমায়
তোমার ধূসর শিলালিপি
নিঃসাড় বোধের মাঝে নীল প্রান্তদেশ ছুঁয়ে আছে।
এইখানে তুমি থাকো নশ্বর স্বপ্নের মতো
চেতনার হরিৎ প্রত্যুষে —
তোমার অজর উদ্যানে
ছুটে যাচ্ছে জীবনের অশ্বারোহী আলোকাভিসার !
হৃৎপিণ্ডে দীর্ঘছায়া..... ছবি প্রতিচ্ছবিময়
নদীর সজল আহ্বান
সর্পিল বিবেক জুড়ে মোহিনী বৃক্ষের নিচে কাঁদে।

মুখর অস্তিত্বে দেখো শস্যের শ্যামল অভিলাষ,
মানুষজনের নীল হৃৎপিণ্ড-ছোঁয়া ঘ্রাণগুলি
মুঠো আলগা ব্যস্ততাকে ঢেকে দিচ্ছে অমল উদ্ভাসে,
তোমার রূপসী স্মৃতি কৈশোরের নিথর রোদ্দুরে
জননীর কোলঘেরা স্নিগ্ধ মমতায় শুয়ে আছে, —
গার্হস্থ্যে জীবনবোধে মন্ত্রের উদাত্ত উচ্চারণে
তুমি অন্তহীন আছো অনির্বাণ আবহমণ্ডলে

কুমীর তোর জলকে নেমেছি

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সহ-শিক্ষক, কুঞ্জবিহারী ইনস্টিটিউশন, বর্ধমান

কুমীর তোর জলকে নেমেছি..... জলকে নেমেছি
বলতে বলতে একচুমুক জলে কপট পা দিয়েই
পা তুলেছি স্থায়ী স্থলকে।

শৈশবের কুমীরডাঙ্গা এখনও ছাড়েনি।

একবার জলে আছি একবার ডাঙ্গায়
দুল দুল দোলক নাচা অবিরত চেতনা আমার
উদ্‌বাস্তু ছুটেই মরে নিশ্চিত জল কিংবা ডাঙ্গার আশায়

বড় বড় চোখে আমি নিবিষ্ট তাকাই যখন
দেখি আমার পা ছুঁই ছুঁই জল
আমি আদিগন্ত ডাঙ্গা খুঁজি।

দিন যেমন করে অবিরত ছুটে চলে রাতের পিছনে
তেমনি, কুমীর তোর জলকে নেমেছি.......
কুমীর তোর জলকে নেমেছি.......
ডাঙ্গা থেকে প্রতারণার উচ্চারণ ভেসে আসে।

শেষমেষ বুঝে নিই আমার জলও চাই, ডাঙ্গাও চাই
বিবাদটা আসলে তো কুমীরের সাথে।

আবাহন

বংশীধর সাহু
সহ-শিক্ষক, কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়, বাঁকুড়া

বোধনিকেতন শুভচেতন কোথায় তুমি থাকো,
তোমার প্রিয় মানুষজনে ভুলে ?
সদয়মনে ধরার পানে নয়ন মেলে দ্যাখো
শয়তানেরা তোমার বেদীমূলে।
এই সমাজে সকল কাজে মূর্ত দুরাচার,
মূল্যমান হারিয়ে গেছে সত্য-সততার ;
অসজ্জনে সঙ্গোপনে লুটছে কোষাগার
জন্মভূমি যাচ্ছে রসাতলে।
মন্দ-ভালো মূল্যায়নের ব্যাপার গেছে চুকে,
কেউ ভাবে না, কেউ কাঁদেনা প্রতিবেশীর দুখে ;
সাধারণের সুখের কথা এনে শুধুই মুখে
ঝোলটি টানে নিজের কোলে কোলে।

শুভচেতন, শুভকেতন উড়িয়ে তুমি এসো,
থেকো না আর মানুষ হ'তে দূরে ;
সবার মনে, সবার প্রাণে আসন পেতে বসো
সব অশুভ দিয়ো বিদায় কোরে।
শুভবোধের অমল আলো ধরায় তুমি জ্বালো,
সেই আলোকে অন্ধলোকে দেখুক চোখে ভালো ;
ভেদের সীমা চূর্ণ কোরে এগিয়ে তুমি চলো
শুভনিশান হাতে তোমার ধরে।
শেষপ্রহরে যুক্ত করে এই মিনতি করি —
সবার মনে সেচন কর তোমার পূত বারি ;
সব অশুভ হৃদয় হ'তে দাও হে অপসারি
তুমি স্বয়ং থাকো হৃদয়পুরে।

ছড়া ঃ পুনরায়　　গান ঃ ভাসান গান

(আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত ছড়া ও গান)

সুরঞ্জন চক্রবর্তী, কলকাতা

পুনরায় বেনের বেশে
বর্বর বর্গী এসে
মারণের ফাঁদ পেতেছে
উর্বর সোনার দেশে!

ঠগীদের আপ্যায়নে
ফড়েরা সিংহাসনে
স্বদেশী তক্‌মা এঁটে
মেতেছে বিশ্বায়নে!

ছিনতাই মাঠের হাসি
ছিনতাই কলের বাঁশি
নিরাশায় মরছে মজুর
নিরাশায় মরছে চাষী!

হাটে যার মেধার ফলন
হাতে তার মৃত্যুসমন
হাইটেক পুঁজির ফাঁসে
অসহায় আত্মহনন!

গতিতে বাড়ছে বেকার
অতীতের রক্ত বেগার
আজাদীর ছিন্ন দলিল
পণনের বিলোল শিকার!

লগ্নির দরজা খোলা
বেসাতির দরাজ মেলা
পেপ্‌সির অবাধ হানায়
লস্যির পটোলতোলা!

দিল্লির বাজ-শকুনে
চেল্লায় উচ্চগ্রামে
কেল্লায় মুক্তনিশান
পতনের প্রহর গোনে!

এ গভীর দুর্বিপাকে
প্রতিঘাত খুব জরুরি
নইলে বন্দী হবেই
স্বপ্নের স্বর্ণপুরী!

ভারত থাকবে কতক্ষণ
ভারত যাবে বিসর্জন
নাচে নাচায় সঙ্ঘ-ঢাকি
মন্ত্রী মহাজন!

বাজে বিশ্বায়নের খোল
তোলে উদারপ্রেমের বোল
দেশব্যাপারী অটল-গলায়
শববাহী কীর্তন!

নিলাম বাসমতী ধান
নিলাম হর বরজের পান
সঙ্ঘদোষে ভ্রষ্ট স্বদেশ
নষ্ট জাতির মান!

নিলাম নিম-ডাঁটা-সিম-বড়ি
নিলাম সুর্মা-সিঁদুর-চুড়ি
জোটের খেলায় ভারতমেলা
অবাধ লুটের ধন!

নিলাম ব্যাংক-বিমা-পোর্ট-রেল
নিলাম ডক-খনি-গান্‌-শেল্‌
শিখর থেকে সঙ্গমে আজ
বিসার অরন্ধন!

শশিমোহন স্মরণে

শ্যামলকান্তি সুর
শিক্ষক, কেন্দুয়া মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুল

"I rather choose to be learned beggar."

চাকুরী চাই না, চাকর হব না,
মাথা উঁচু করে বাঁচব—
কঠোর এই মনোভাব শশিমোহনকে
নিয়ে এল শিক্ষকতার বৃত্তিতে
টেনে আনল স্বাধীনতা সংগ্রামে
টেনে নিল মানবমুক্তির সংগ্রামে।

পরাধীন মায়ের ডাকে
তাঁর মনে প্রোথিত হলো স্বাধীনতার বীজ
শোষণ আর নির্যাতন তাঁকে করল শ্রমিক-কৃষকের সাথী
আদর্শ শিক্ষাদানের তাগিদ তাঁকে
আদর্শ মানুষ গড়তে নিয়ে এল শিক্ষকতায়।
মানুষের সেবার টানে ঝাঁপ দিলেন
দুর্ভিক্ষ, বন্যায় ত্রাণের কাজে
সাহিত্যের সেবা, সমাজ সেবা, মানব সেবা—
ত্রিধারা মিশিয়ে এগিয়ে চলেন
সমাজতন্ত্রের পথে, বিপ্লবের পথে, মুক্তির পথে।

জয় হোক গণতন্ত্রের স্বপ্ন
জয় হোক স্বনির্ভরতার স্বপ্ন
জয় হোক মানবমুক্তির স্বপ্ন
অমর হোক তাঁর মহান প্রাণ।

ভালো আছি

অশোক অধিকারী, হাওড়া

তোমাকে দিলাম ঃ ধর্মঘট ভাঙার কৌশল, কৃষক হত্যার ফলিডল
বিষাক্ত শস্যবীজ, পণ্য আমদানির লিখিত যৌবন, গুজরাটের
ত্রিশূলবিদ্ধ সদ্যোজাত, 'ফিল গুড', ভাইফোঁটা দেওয়া দিদি, প্রচারের চোঙ
শিক্ষা বিক্রির 'মেরা স্বপ্ন', সন্তান বেসরকারীকরণের গুচ্ছপ্রণালী, স্তব্ধ যৌবনের ধর্মঘট

আমাকে ফিরিয়ে দিও ঃ আগামী পাঁচ বছরের 'ভারত উদয়', অস্ত্রসমৃদ্ধ দক্ষিণ হস্ত
হিটলারের ভারতীয় মুখোশ, কর্মসংস্থানের গোপন পরামর্শ, মিনি বাজেটের সবুজ বিপ্লব
ক্ষমতা দখলের সুখানুভূতি, ক্রমাগত সুদ কমানোর দরাজ হাত, একুশ শতকের বাবু বিলাস

আমাকে গাহিতে বোলোনা ঃ বাসস্থানহীন মানুষের কথা, পানীয় জলবিহীন কষ্টের কথা
নিরক্ষরের লজ্জাবসন, বৃহত্তর স্কুলছুট, অপুষ্টি, আমজনতার আলোচিত সমস্যার পদ্য
অষ্টতর শত নামে ধ্বনিত হোক — 'মাঙ্গে মোর', 'জেগে উঠলো এই ভারত' বিলিতি মদ, বিলাসী পণ্য
ভ্যালেন্‌টাইন নির্বাচনী টনিক, দুর্ভোগে 'অটল' থাকা মস্তিষ্ক, নির্বাচনী টিকিটের 'ফ্রেশ্ হওয়ার সাবান'

আমি ভালো আছি ঃ অশ্রু আর রক্তের মহড়ায়, ভারত-পাক ক্রিকেট খেলায়, 'পদ্মশ্রী' বিক্রি করে
আমি ভালো আছি ঃ পশ্চিমবাংলার টাকা কেটে, প্রকল্পের দীর্ঘহত্যা আর ভরতুকি তুলে
আমি ভালো আছি ঃ গান্ধীজিকে গুলি করে, সাম্প্রদায়িক ছাড় ঘোষণা করে, সংবিধানের কমিশন খেয়ে
আমি ভালো আছি ঃ সরস্বতী গেয়ে, ইতিহাস বিকৃত করে, জ্যোতিষ আর পুরোহিতের প্রণামী দিয়ে

'জেগে উঠলো এই ভারত/আমার স্বপ্নের এই ভারত' — সপ্তম চিৎকারে ভেসে যায় রঙিন টিভি
তখনও অভুক্ত সন্তানের মুখে ওঠেনি ভারতীয় খাবার, পথ্য, পানীয় জল ঃ সমবেত আওয়াজ
থেকে বেরিয়ে আসে যে কণ্ঠস্বর, আগামী নির্বাচনে তারাই হবে 'ক্লোজ আপ' হাসি
আমার শিক্ষা তুমি রাস্তায় নামো, আমার প্রতিবাদের ভাষা তুমি দলমা হাতি তাড়ানোর
'হল্লাবোল' হও, আমার ভাবনা তুমি খুলে রাখো চোখ, কান ঃ আরো অনেক
শতছিন্ন হবে 'লঙ্ ক্লথের' মানচিত্র ; জুড়তে জুড়তে শুরু হবে আর এক যুদ্ধ
সেখানে নয় কোনো বিলাসবহুল শব্দের আহামরি চমক, সেখানে নয় কোনো ক্ষমার কাব্য
জিজ্ঞাসা তরঙ্গিত ইথারে ইথারে, প্রস্তুত মানবতা, ইতিহাস সর্বদাই সত্য কথা বলে
আমরা ইতিহাসে বিশ্বাসী — ভুল ভুলাইয়া অটলের অবিশ্বাসী বৃন্দবাদনে নয়
আমরা মানবতায় বিশ্বাসী — শেষ কথা বলে জনগণ, জনগণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর

সমিতি সংবাদ

কোচবিহার

দিনহাটা মহকুমা শাখার নবনির্মিত কার্যালয় 'সত্যপ্রিয় ভবনের' দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান

অবশেষে মহকুমা শিক্ষকমণ্ডলীর সুদীর্ঘ প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হল। সর্বপ্রথম ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টার সময় দিনহাটায় নির্মিত নতুন ভবনের সামনে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। সমিতির প্রাণ-পুরুষ সত্যপ্রিয় রায় ও কিংবদন্তী নেত্রী অনিলা দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সমরেন্দ্রনাথ সাহা ও জেলা সম্পাদক বকুল দত্ত। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন জেলা ও মহকুমার নেতৃবৃন্দ। এরপর সমিতির মহকুমা শাখার কার্যালয় নবনির্মিত সত্যপ্রিয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। কাঙ্খিত নতুন ভবনকে কেন্দ্র করে দিনহাটার শিক্ষক মহলে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের পর্বে সভাপতিত্ব করেন ধর্মদাস ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মিশা ঘোষাল। ভবন নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি আলোচনা করেন মহকুমা সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি ভবন নির্মাণের সার্বিকভাবে সহযোগিতার জন্য মাতালহাট উচ্চ-বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সন্তোষকুমার দত্ত ও অজিত নন্দীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা ও জেলা সম্পাদক বকুল দত্ত সমিতির ভবন নির্মাণের জন্য মহকুমার সদস্যদের ও বর্তমান নেতৃত্বকে অভিনন্দিত করেন। এই অনুষ্ঠানে মহকুমার প্রায় ৪০০ জনের মত সদস্য ও অন্যান্য সংগঠনের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিনহাটা মহকুমা শাখার উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচী

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩টায় স্থানীয় দিনহাটা উচ্চ-বিদ্যালয়ে মহকুমা সমিতি সদস্যদের নিয়ে ১৭.০২.০৪ তারিখে D.I. Office, কোচবিহারে সারাদিন ধরে অবস্থান জমায়েত, Deputation ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী দেশজুড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা করেন সমরেন্দ্রনাথ সাহা, বকুল দত্ত, বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, অনুপম দত্ত। দিনহাটার তিনটি জোন নিয়ে এই সাধারণ সভায় প্রায় ৩০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দিনহাটা মহকুমা শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দিনহাটা মহকুমা শাখার উদ্যোগে ৯ই ফেব্রুয়ারী মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের মহকুমা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিগমনগর নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়ের মাঠে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন এবং সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র সুর। প্রধান অতিথি বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহ-প্রধান শিক্ষক দেবদাস মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুজন সাহা। প্রতিযোগীদের মধ্যে ১৫ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ- গ্রহণ করেছেন।

মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে বিশেষ সাধারণ সভা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে মহকুমার তিনটি আঞ্চলিক সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে গৃহীত নিম্নোক্ত কর্মসূচীগুলি আলোচনা করা হয় ঃ

(১) কেন্দ্রীয় সমিতির আহ্বানে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ কলকাতার কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা হয়।

(২) আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ জেলা সমিতির আহ্বানে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অফিসের সামনে জমায়েত ও অবস্থান কর্মসূচী সফল করার উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা হয়। পরিদর্শক অফিসের কাজকর্মের দীর্ঘসূত্রতা এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের হয়রানি বন্ধ করা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

(৩) আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ এস টি এফ আই-

এর আহ্বানে সারাভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে এবং জনগণের মধ্যে এই বন্ধের প্রচার নিয়ে যেতে পথসভা, হাটসভা, পদযাত্রা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। ১২ই জুলাই কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলগুলিতে ব্যাপক সংখ্যায় যোগ দেবার জন্য সদস্যবন্ধুদের কাছে অনুরোধ করা হয়।

মাথাভাঙা পূর্ব আঞ্চলিক শাখা

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ মাথাভাঙা পূর্ব জোনের সাধারণ সভা মাটিয়ারকুঠী পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জোনাল সম্পাদক শ্যামলচন্দ্র মালাকার, মহকুমা সম্পাদক রণজিৎ রায় ও জেলা সমিতির সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। ১৭টি ইউনিটের ৭০ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শীতলকুচি আঞ্চলিক শাখা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ গোসাইয়ের হাট হাইস্কুলে শীতলকুচি জোনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন জোন সম্পাদক সমরেশ বর্মন, জেলা সম্সপাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুপম দত্ত ও রণজিৎ রায়। ১২টি ইউনিটের ৪৯ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মাথাভাঙা আঞ্চলিক শাখা

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ মাথাভাঙা পশ্চিম জোনের সাধারণ সভা মাথাভাঙা বালিকা বিদ্যালয়ে (উচ্চমাধ্যমিক) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন জোন সম্পাদক ধীরেন প্রামাণিক, জেলা কাউন্সিল সদস্য সুজিত দাস, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুপম দত্ত ও রণজিৎ রায়। ১৫টি ইউনিটের ৫২ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে নতুন প্রজন্মের শিক্ষকদের নিয়ে কনভেনশন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মাথাভাঙা মহকুমা শাখার উদ্যোগে ও পরিচালনায় গত ৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি মহকুমা কনভেনশন মাথাভাঙা গার্লস হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের সভাপতি ছিলেন নুরুউদ্দিন মিঞা। স্বাগত ভাষণে তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠনে সমিতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। জেলা সমিতির সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা শিক্ষা আন্দোলনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা উপস্থাপন করেন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী সমিতির ইতিহাস এবং গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। মহকুমা সম্পাদক রণজিৎ রায় সাধারণের জন্য বিদ্যালয়গুলির রক্ষা এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের উপর আলোকপাত করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের আলোচনায় পাঁচজন শিক্ষক আলোচনা করেন। তারা হলেন রফিকুল ইসলাম, সন্তোষকুমার সামন্ত, মলয় শিকদার, রামকৃষ্ণ সিংহ ও পরিমল বর্মন। কনভেনশনে মোট ৪৫ জন নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

তুফানগঞ্জ মহকুমা শাখার উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তুফানগঞ্জ মহকুমা শাখার উদ্যোগে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তুফানগঞ্জ এন এন এম উচ্চ-বিদ্যালয়ের মাঠে প্রবল উৎসাহের মধ্যদিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন ক্রীড়ানুষ্ঠানের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মাননীয় শশধর সরকার। সভাপতি তাঁর ভাষণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন মহকুমা সম্পাদক অচিন্ত্যশংকর ভট্টাচার্য। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সমিতির জেলা শাখার সহ-সম্পাদক রমেশচন্দ্র দাস। বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক গৌতম কুণ্ডু। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় অজয়কুমার সৎপতি অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এই ক্রীড়ানুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে গভীর উদ্দীপনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। ক্রীড়ানুষ্ঠানের সুরু থেকে শেষ অবধি মাঠে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল প্রবল। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের জেলা পর্যায়ের ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পাঠানো হয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমা শাখার উদ্যোগে সাংগঠনিক শিক্ষাশিবির

গত ২৪শে আগস্ট, ২০০৩ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তুফানগঞ্জ মহকুমা শাখার উদ্যোগে সমিতির সাংগঠনিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ এবং তুফানগঞ্জ মহকুমা শাখার নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা শিক্ষানীতির উল্লেখ

করেন। তিনি তার ভাষণে প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। আজকের কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান।

শিক্ষাশিবিরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা রাখেন বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, বকুল দত্ত, অনুপম দত্ত এবং রণজিৎ রায়। এই শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব চণ্ডী পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষার এই সংকটময় অবস্থায় শিক্ষকদের আরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এই শিক্ষাশিবিরে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ৮৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সারাদিনব্যাপী গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে শিক্ষাশিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

যৌথ উদ্যোগে
এস টি এফ আই-এর প্রতিষ্ঠাদিবস পালন

গত ১২ই আগস্ট, ২০০৩ বেলা ২টায় এস টি এফ আই-এর প্রতিষ্ঠাদিবসে কোচবিহার জেলা কর্মচারীভবনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কনভেনশনে সভাপতিমণ্ডলীর আসন অলঙ্কৃত করেন সমরেন্দ্রনাথ সাহা, রমেশ দাস ও দীপক চক্রবর্তী।

কনভেনশনের শুরুতে পতাকা উত্তোলন করেন সমরেন্দ্রনাথ সাহা। এ বি টি এ'র পক্ষ থেকে সমরেন্দ্রনাথ সাহা প্রারম্ভিক ভাষণে বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং যৌথ আন্দোলন কর্মসূচীর তাৎপর্য ও বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটাবস্থায় শিক্ষক সমাজের জাতীয় কর্তব্য কি সে সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। অনুপম দত্ত তাঁর ভাষণে এস টি এফ আই গঠনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। নারায়ণ দে শিক্ষায় গৈরিকীকরণ ও বে-সরকারীকরণের বিরুদ্ধে বর্তমান শিক্ষক সমাজের ভূমিকা কি এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এস টি এফ আই-এর প্রতিষ্ঠাদিবসে শিক্ষক সমাজের দায়বদ্ধতা বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া এ বি পি টি এ'র পক্ষ থেকে নিখিল দাস ও দীপকরঞ্জন দত্ত বক্তব্য রাখেন। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত ১৫০ জন এ বি টি এ'র শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ও ৮০ জন এ বি পি টি এ'র সদস্য উপস্থিত থেকে কনভেনশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। সবশেষে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন জেলা এ বি টি এ'র সভাপতি মাননীয় সমরেন্দ্রনাথ সাহা।

মহকুমা স্তরে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচী

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলার অধীন মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মহকুমা স্তরে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচী গত ২৩শে জুলাই, ২০০৩ তারিখে পালন করা হয়। বিভিন্ন মহকুমায় সমিতির নেতৃত্ব এ আই দপ্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং শিক্ষকদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন। বিভিন্ন মহকুমায় সমিতির সদস্যদের উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়। এই অবস্থান বিক্ষোভ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তোলে।

মালদহ

জেলা শাখা আয়োজিত সাধারণ সভা

গত ২১শে ডিসেম্বর নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মালদহ জেলা কমিটির ডাকে মালদহ কলেজ অডিটোরিয়ামের সানাউল্লাহ্ মঞ্চে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঁচশ সমিতি সদস্য এই সভায় যোগদান করেন। শিক্ষিকাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সমিতির রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি রাসবিহারী চ্যাটার্জী মূল বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে অর্থমন্ত্রীর নিকট সমিতি-প্রদত্ত ডেপুটেশনের দাবী-দাওয়া সমূহ ব্যাখ্যা করেন। জুলাই '০৩ থেকে চার শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, প্রবীণ শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে সমিতির বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন। সভার শুরুতে জেলা সম্পাদক কাজল সরকার সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য্য।

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ আঞ্চলিক শাখার
বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হরিশ্চন্দ্রপুর-২ অঞ্চল শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সাদলীচক হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি লক্ষ্মণলাল গোপ অনুপস্থিত থাকায় অন্যতম সহ-সভাপতি কমল ঘোষ পতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদবেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্যদিয়ে সভার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রথমে শোক প্রস্তাব,

তারপর সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মশালদহ গণপৎ রায় হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক ফণীন্দ্রনাথ সাহা। সভায় ৮৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সাদলীচক হাইস্কুলের দুইজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব আলহাজ্ব মোহাঃ আব্দুস সামাদ এবং আব্দুল মজিদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আরো দুইজন প্রাক্তন সহ-শিক্ষক সাদলীচক এবং ধনাপাড়া আজিজিয়া জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার যথাক্রমে আব্দুস আওয়াল এবং মোহাঃ সেতাবুদ্দিন। এঁরা দুজনেই এক সময়ে সমিতির সক্রিয় সদস্য ও পদাধিকারী ছিলেন। সভায় মফিজুদ্দিন আহমেদ, মোহাঃ আতাউর রহমান এবং লুৎফল হক অনুলিখনের কাজ করেন। সম্পাদক মুহম্মদ ইয়াশিন আলী বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় পাঠ করেন। কোষাধ্যক্ষ মোহাঃ সামশুল আলাম আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় পেশ করেন।

অতঃপর মূল সভার কাজ আরম্ভ হয়। গণসংগঠনের পক্ষ থেকে আব্দুল লতিফ (কৃষকসভা) গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মোহাঃ মোস্তফা সভার সাফল্য কামনা করে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। জেলা পরিষদ সদস্যা এবং মহিলা নেত্রী বেগম হামিদা খাতুন অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। জেলা কাউন্সিল হতে অচিন্ত্য সরকার, মানব কুমার এবং স্বপন পাল উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বপন পাল এবং মানব কুমার সভার সাফল্য কামনা এবং অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সাদলীচক হাইস্কুলের এক সময়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ আলহাজ্ব মোহাঃ আব্দুস সামাদ সাহেব সভার সাফল্য কামনা করে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর আলোচনায় চুক্তিতে শিক্ষক নিয়োগ এবং তার পরিণতি কি হতে পারে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে তিনি তাঁর আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনমনীয় শিক্ষাবিরোধী নীতির জন্য এসব হচ্ছে বলে সেটাও আলোচনা করেন।

সবশেষে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য এবং জেলা সহ-সম্পাদক ভূবন কুমার আলোচনায় অংশ নেন। ভূবনবাবু তাঁর আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত রকমের সর্বনাশা নীতির সমালোচনা এবং নিন্দা করেন। সাথে সাথে শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকদেরকে আরো বেশী বেশী ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে আহ্বান জানান। এছাড়া অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এবং সাদলীচক হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সৈয়দ মেরাজুদ্দিন আলোচনা করেন।

পরিশেষে সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য মুহম্মদ ইয়াশিন আলী জবাবী ভাষণ দেন এবং সাথে সাথে শিক্ষকদেরকে সমিতির পতাকাতলে আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলে সভার কাজ শেষ হয়। ২১ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন কমল ঘোষ, মহঃ শামশুজ্জোহা এবং নুরেশ আহমেদ।

উত্তর দিনাজপুর

কালিয়াগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

চুয়ান্নর স্মরণীয় শিক্ষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি দিবস গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কালিয়াগঞ্জ আঞ্চলিক শাখা রক্তদান শিবির পরিচালনার মধ্যদিয়ে পালন করে। রক্তদান শিবির পরিচালনা করেন জোনাল সভাপতি বিমলকুমার সেন। এই কর্মসূচীতে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে দুইজন শিক্ষিকা, একজন মহিলা ও তিনজন শিক্ষাকর্মীসহ মোট ২৫ জন সমিতির সদস্য রক্তদান করেন। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জ মহকুমা সম্পাদক বিজনকুমার মৈত্র। তিনি তাৎপর্যবাহী ও সময়োপযোগী রক্তদান শিবির পরিচালনার জন্য জোনাল শাখাকে অভিনন্দন জানান। রায়গঞ্জ মহকুমার সহ-সম্পাদক দেবব্রত সরকার বলেন, শ্রমজীবী মানুষদের অর্জিত অধিকারে যখন নানাভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানুষদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে তখন অর্জিত অধিকার অটুট রাখতে এবং রক্তদিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতে এই রক্তদান শিবির পরিচালনার মাধ্যমে চুয়ান্নর স্মরণীয় শিক্ষা আন্দোলনের পবিত্র দিনে সমিতির জোনাল শাখা নতুনভাবে পথচলা শুরু করবে। সি পি আই (এম) জোনাল সম্পাদক, সমিতির জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপকুমার সরকার, অনুকূল ভৌমিক, জোনাল সম্পাদক পার্থ সরকার সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের রক্তদান শিবির কর্মসূচী এলাকার সাধারণ মানুষদের মধ্যেও সাড়া ফেলে।

রায়গঞ্জ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১১ই জানুয়ারী মহারাজা জগদীশ নাথ উচ্চ-বিদ্যালয়

প্রাঙ্গণে রায়গঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আন্তঃবিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জোনাল সভাপতি চণ্ডীদাস মোসান। জোনাল ক্রীড়া উপ-সমিতির আহ্বায়ক দুলাল মিশ্র ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন। জেলা সহ-সভাপতি নারায়ণ সরকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য জোনাল, মহকুমা ও জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতির ধন্যবাদ-জ্ঞাপক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

রায়গঞ্জ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা

৭ই ফেব্রুয়ারী সুভাষগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমরেশ চক্রবর্তী স্মৃতি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও রায়গঞ্জ জোনের রাণার্স কাপ আন্তঃবিদ্যালয় (শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী) একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা ধুমধাম ও উদ্দীপনার সাথে সমাপ্ত হয়। এই খেলা এলাকার জনগণকে আনন্দ জোগায় এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি করে। খেলায় মোট ৯টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছিল।

সেমিফাইনাল পর্যায়ে কাশিবাটী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ দেবীনগর কে সি আর বিদ্যাপীঠকে এবং মোহনবাটী হাই ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠকে পরাস্ত করে চরম পর্যায়ের খেলায় উন্নীত হয় এবং শেষ পর্যন্ত চরম উত্তেজনার মধ্যদিয়ে মোহনবাটী হাইস্কুল কাশিবাটী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। মোহনবাটীর অমলকুমার দাস অসাধারণ নৈপুণ্যতা দেখিয়ে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন। রায়গঞ্জ জোন আয়োজিত এই একদিনের ভলিবলের প্রসার 'মহকুমা, জেলা থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত প্রসারিত হোক' আওয়াজটি অনুষ্ঠানের সভাপতি থেকে আরম্ভ করে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, জেলা নেতৃত্ব, খেলোয়াড়সবৃন্দ সবার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

জলপাইগুড়ি

জেলা শাখা আয়োজিত সাংগঠনিক শিক্ষাশিবির ও শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মশালা

গত ৬-৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ দুইদিন ধরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে সাংগঠনিক শিক্ষাশিবির এবং শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গোটা জেলার প্রতিটি আঞ্চলিক শাখা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

দুটো সাংগঠনিক শিক্ষাশিবির যথাক্রমে ময়নাগুড়ি উচ্চতর বিদ্যালয় ও ফালাকাটা উচ্চতর বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মশালা সমিতির জেলা দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবনে সংগঠিত হয়। সাংগঠনিক শিক্ষাশিবিরে সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞ নেতৃত্ব মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ময়নাগুড়িতে সমিতির জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাখার অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক শাখাগুলো থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এবং ফালাকাটাতে সমিতির আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাখার বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখার প্রতিনিধিরা আসেন। জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মশালায় গোটা জেলার আঞ্চলিক শাখাগুলো থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মশালাতে কয়েকটি জোন অংশগ্রহণ করতে পারে নি। ময়নাগুড়ি সাংগঠনিক শিক্ষাশিবিরে ৬৭ জন প্রতিনিধি, ফালাকাটা সাংগঠনিক শিক্ষাশিবিরে ৪৩ জন প্রতিনিধি জলপাইগুড়ি কর্মশালায় ৩২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি শিবিরই ৬ই ডিসেম্বর বেলা ১টায় শুরু হয়, শেষ হয় ৭ই ডিসেম্বর ৫-৩০টা নাগাদ।

শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির জেলা শাখার অন্যতম প্রবীণ নেতা সুবোধ সেন। সমিতির জেলা শাখার পক্ষ থেকে কোষাধ্যক্ষ অপূর্ব গোস্বামী মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এরপর শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পাদক প্রশান্ত ধর তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শ্রীধর সমিতির মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সহ বর্তমান সময়ে কি ধরণের লেখা মুখপত্রে লেখা উচিৎ—এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। শিক্ষা ও সাহিত্যের ইংরেজী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক সমীর ভট্টাচার্য্য শিক্ষা ও সাহিত্যের ইংরেজী বিভাগ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এরপর শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কবিতা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অশোক অধিকারী বর্তমান সময়ে সংগঠনের মুখপত্রের গুরুত্বসহ শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশিত কবিতার একটি মূল্যায়নধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করেন। কর্মশালার প্রথমদিন এরপর উপস্থিত প্রত্যেক প্রতিনিধি তাদের পরিচিতি প্রদান করে জেলা থেকে দেওয়া শিক্ষা ও সাহিত্যের ভিত্তিপত্র এবং নেতৃত্বের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে নিজেদের বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি জেলার সংগঠনের

খবরাখবর যাতে মুখপত্রে বেশি করে প্রকাশিত হয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরেরদিন অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর বেলা ১০-৩০টায় শিক্ষা ও সাহিত্যের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রকাশের নানা দিক সহ কিভাবে জেলা থেকে আরো বেশি সময়োপযোগী লেখা আসে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এরপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের চারটি বিভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগঠন এই চারটি বিষয়ের উপর। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব আলোচনা শেষে বিভাগের নেতা নির্দিষ্ট বিষয়ে কি ধরণের লেখা শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশিত হতে পারে সেই ব্যাপারে তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য লিখিত আকারে পেশ করে ব্যাখ্যা করেন। জোনস্তরে যাতে সংগঠনের মুখপত্র পড়বার অভ্যাস সদস্যদের মধ্যে আরও গড়ে তোলা যায় তার জন্য আগামীতে শিক্ষা ও সাহিত্যের পাঠক সম্মেলন করা যেতে পারে। গোটা রাজ্যব্যাপী শিক্ষা ও সাহিত্যের লেখক সম্মেলন করা যেতে পারে বলে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন। এছাড়া জেলাগতভাবে ইস্যুভিত্তিক বুলেটিন প্রকাশ করার বিষয়েও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয় এবং এই ধরণের কর্মশালা জোনভিত্তিক করা হবে বলে জেলাশাখা থেকে জানানো হয় কর্মশালায়।

ময়নাগুড়িতে সাংগঠনিক শিক্ষাশিবিরের সূচনা হয় সমিতির পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৬ই ডিসেম্বর এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা লুৎফুল আলম 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পেশাগত সমস্যা' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ৭ই ডিসেম্বর বেলা ১১টায় 'সমিতির ধারাবাহিক আন্দোলনের ইতিহাস' বিষয়ে আলোচনা করেন অপরেশ ভট্টাচার্য্য। এরপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বর্ষীয়ান নেতা মানিক সান্যাল 'আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রাঞ্জল ভাষায় মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন।

ফালাকাটা সাংগঠনিক শিবিরে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী উপাসনা নন্দী। সমিতির ধারাবাহিক ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতিতে পেশাগত সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে অপরেশ ভট্টাচার্য্য ও লুৎফুল আলম। ৭ই ডিসেম্বর সি পি আই (এম) জেলা কমিটির সদস্য কল্যাণ দে 'আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিটি শিক্ষাশিবিরে সদস্য/সদস্যাদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

আলিপুরদুয়ার সেন্ট্রাল জোনের উদ্যোগে কনভেনশন

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী আলিপুরদুয়ার সেন্ট্রাল জোনের পরিচালনায় স্থানীয় ম্যাক উইলিয়ম স্কুল প্রাঙ্গণে মনোজ্ঞ এবং সময়োপযোগী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্ট্রাল জোনের প্রায় সকল ইউনিট থেকে সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন পূর্ণ চ্যাটার্জী। জোনের সম্পাদক অনিন্দ্য ভৌমিক ও অশোক কুণ্ডু এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

কনভেনশনের মূল আলোচ্য বিষয় 'জাতীয় পরিস্থিতি, বিশ্বায়ন ও চা-বাগানের সংকট'।

মূলত এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা ও জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কৃষ্ণপদ ব্যানার্জী। বিশ্বায়নে ভারী ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রভাব, নয়া সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রাসীনীতি কিভাবে রাজ্যকে দেউলিয়া করছে এবং চা-বাগানের এই সংকট তারই ফল। ভবিষ্যতে বিশ্বায়নের প্রভাবে ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে আরও অনেক চা-বাগানগুলি বন্ধের মুখে থুবড়ে পড়বে। কেন্দ্রীয় নীতি সংশোধন না করলে রাজ্য নিরুপায়, তবুও রাজ্য সরকার বিভিন্ন চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে কিছু নতুন নিয়মাবলীর কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করেছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন।

মেটেলী-নাগরাকাটা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মেটেলী-নাগরাকাটা আঞ্চলিক কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২১শে সেপ্টেম্বর '০৩ লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মারক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে সকাল ১১টায় পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান করা হয়। দুপুর ১২টায় সভার কাজ শুরু হয়।

সভার উদ্বোধনী ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন ভদ্র। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমিতির দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন। গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অবাধ আমদানী নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার দেশীয় শিল্পকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে তার উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রের লাভজনক সংস্থাকে জলের দরে বিক্রি করে বে-সরকারীকরণের বিরুদ্ধেও কথা বলেন। প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনা করছে তার উল্লেখ করেন।

বর্তমানে আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি সর্বস্তরের মানুষকে যদি যুক্ত করা না যায় তবে আমরা আমাদের অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে পারব না। এই ভাবনা ইউনিট স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

এরপরে সম্পাদক পঙ্কজকুমার মণ্ডল বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। এর উপর আলোচনায় ৮ জন শিক্ষকবন্ধু অংশগ্রহণ করেন। তারা প্রতিবেদনকে সমর্থন করে কিছু বক্তব্য রাখেন। পি এফের সুদ কমানো, মাস পয়লা বেতন, পেনশন ব্যবস্থা সরলীকরণ ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে এমবার্গোর কথা উল্লেখ করেন। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোয় সুষ্ঠু শিক্ষাদানের অসুবিধার কথাও তুলে ধরেন। এছাড়াও নবীন প্রজন্মকে আন্দোলনে সক্রিয় যোগদানের কথা উল্লেখ করেন। এরপর সম্পাদক তার জবাবী ভাষণ দেন। সভার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন সদর মহকুমা কমিটির সম্পাদিকা স্বপ্না খান।

এই সভায় বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবীতে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন পঙ্কজকুমার মণ্ডল এবং সমর্থন করেন কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উল্লিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভার শেষে সাধারণ সভার সভাপতি হরেন্দ্রনাথ সিং সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বর্ধমান

পূর্বস্থলী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে অবসরপ্রাপ্তদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

গত ৮-ই ফেব্রুয়ারী পারুলডাঙ্গা নসরৎপুর হাইস্কুলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্বস্থলী আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে পূর্বস্থলী থানা এলাকার বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০৩ সালে অবসরপ্রাপ্ত ১৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও স্মারক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে পারুলডাঙ্গা নসরৎপুর হাইস্কুলের ছাত্রীবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন তপন পোদ্দার। প্রধান অতিথি ছিলেন পারুলডাঙ্গা নসরৎপুর হাইস্কুলের শিক্ষক বিশ্বনাথ দেবনাথ।

অবসরপ্রাপ্তদের সম্বর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক আনন্দগোপাল মণ্ডল। তিনি বলেন, অবসরপ্রাপ্তগণ যখন কাজে যোগদান করেন তখন বেতন ছিল অতি নগণ্য। তাও অত্যন্ত অনিয়মিত। চাকুরীর কোন নিরাপত্তা ছিল না। অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বর্তমানে একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ পেশাগত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষার মানোন্নয়নের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে যে অবদান রেখেছেন তা উল্লেখ করেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণকে তাদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস জানিয়ে নবাগতদের উৎসাহিত করার আবেদন জানান।

সভাপতির ভাষণে তপন পোদ্দার বলেন, এ বি টি এ আমাদের দিয়েছে অনেক। চাকুরীর নিরাপত্তা, পূর্ণ বেতন, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার।

তিনি বলেন, শিক্ষকদের আদর্শ শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। তিনি তামিলনাড়ু ও উড়িষ্যার শিক্ষকদের উপর অমানবিক আক্রমণ ও অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য, সমাজের বুকে স্থায়ী দাগ রাখার কাজে শিক্ষকদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে। এ বি টি এ-কে শক্তিশালী করতে হবে। সম্বর্ধনা সভায় অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে সাতজন তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা এ বি টি এ'র প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন।

বর্ধমান দক্ষিণ-পশ্চিম বিদ্যালয় সংহতিগুচ্ছের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী খাজা আনোয়ার শহীদ বেড় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বর্ধমান দক্ষিণ-পশ্চিম বিদ্যালয় সংহতিগুচ্ছের ২০০৪ সালের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত আটটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শিক্ষাবিদ্ অধিক্রম সান্যাল বিদ্যালয় সংহতিগুচ্ছের পতাকা উত্তোলন করার পর প্রধান অতিথি বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি উদয় সরকার প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নিশীথ দত্ত। গুচ্ছের সম্পাদক তরুণ চক্রবর্তী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিদ্যালয়গুচ্ছের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি রথতলা-কাঞ্চননগর এলাকার একটি বিদ্যালয়কে উচ্চ-মাধ্যমিক করার আবেদন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উদয় সরকার তাঁর ভাষণ শুরু করেন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী আমেরিকার ছাত্র পিটারের গল্প দিয়ে, যে পিটারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে



বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের রক্তদানে বহু রোগী তাদের জীবন ফিরে পেল। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে ছাত্রদের তথা বিদ্যালয়ের সাফল্যের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষকদের আন্তরিকতা যথেষ্ট নয়, তারজন্য ছাত্রদেরও আন্তরিক ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। এঁরা ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান পৌরসভার উপপৌরপতি আইনুল হক, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য মহঃ ইউনুস, শিক্ষাবিদ্ অধিক্রম সান্যাল ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বীরেন শূর। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কারগুলি তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। ছাত্রীদের পরিবেশিত সমবেত নৃত্য বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। ছাত্রদের জন্য মধ্যহ্নভোজের ব্যবস্থা ছিল।

বর্ধমান শহরে বিদ্যালয়গুচ্ছের মধ্যদিয়ে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মেলবন্ধনের এই প্রচেষ্টা ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে।

বীরভূম

জেলা শাখার আহ্বানে ডেপুটেশন সংঘটিত

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বীরভূম জেলা শাখার পক্ষ থেকে গত ৮ই জানুয়ারী মাননীয় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), বীরভূম মহাশয়-এর কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বেলা সাড়ে বারোটায় তিনশতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের একটি সুশৃঙ্খল মিছিল জেলা দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবন থেকে বেরিয়ে সিউড়ী শহরের প্রধান সড়ক ধরে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের অফিসে পৌঁছায়। সেখানে সমাবেশে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের সামনে শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, পেশাগত দাবী-দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন বীরভূম জেলা শাখার সম্পাদক রবিউল হক। জেলা শাখার সহ-সম্পাদক বেনজির রহমান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত দাবী-দাওয়া, যৌথ আন্দোলনের যৌক্তিকতা, শিক্ষায় বে-সরকারীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণের বিপদ প্রভৃতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন। এই সমাবেশ মঞ্চ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বারো দফা পেশাগত দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ফ্যাক্স মারফত পাঠানো হয়।

পরে জেলা শাখার সম্পাদকমণ্ডলী, সিউড়ী, বোলপুর ও রামপুরহাট মহকুমার সম্পাদকগণ জেলা সম্পাদকের নেতৃত্বে মাননীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের নিকট ডেপুটেশন দেন।

১২ই জুলাই কমিটির জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আলোক চ্যাটার্জী বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিপদ সম্পর্কে সদস্যবন্ধুদের অবহিত করে সমাবেশকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এদিনের সমাবেশে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও উদ্দীপনা ছিল লক্ষ্যণীয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী।

কলকাতা

কলকাতা দক্ষিণ শহরতলী (পশ্চিম) মহকুমা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০৩ ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কলকাতা দক্ষিণ শহরতলী (পশ্চিম)

মহকুমা শাখার ২০০৩-এর বার্ষিক সাধারণ সভা উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি সন্তোষ দত্ত। শহীদবেদীতে মাল্যদান করার পর বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত সভাগৃহে সভার কাজ শুরু হয়। সভা পরিচালনার জন্য মহকুমা সভাপতি বিজয়গোপাল পাল, কোষাধ্যক্ষ মানিককৃষ্ণ রায় এবং বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা নিখিলেন্দু ভট্টাচার্য-কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন মানিক রায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দৃষ্টিহীন শিক্ষক রমেন্দ্রনাথ হালদার। উদ্বোধনী ভাষণে সন্তোষ দত্ত সমিতির অতীত দিনের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস তুলে ধরেন। বিদ্যালয়ের পাঠকক্ষ থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের অঙ্গনের বাইরে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে সমিতির সুচিন্তিত ভাবনার রূপরেখা হাজির করেন। বর্তমান সময়ে শিক্ষকদের প্রত্যাশামত ৪% মহার্ঘভাতা প্রদান বিষয়টি কি কারণে রাজ্য সরকার কার্যকরী করতে পারছে না তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, শিক্ষকদের এই প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। তিনি আশা করেন যে শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন মহকুমা সম্পাদক সুশীল চ্যাটার্জী। প্রতিবেদনে তীব্র ভাষায় শিক্ষাকে বে-সরকারীকরণের চক্রান্তের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এগিয়ে এসে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া প্রতিবেদনে তামিলনাড়ুতে ধর্মঘটী রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপর জয়ললিতা সরকারের নগ্ন আক্রমণের এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের রায়ে জনগণের ধর্মঘট ও মিছিল করার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজকে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন বেহালা পশ্চিম জোনের সুখরঞ্জন চক্রবর্তী, বেহালা দক্ষিণ জোনের বরুণ ব্যানার্জী, বেহালা পূর্ব জোনের শেখ কামালউদ্দিন। সভায় শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় জেলার সহ-সম্পাদক অনিরুদ্ধ বোস বলেন যে মহকুমা সংগঠনে ১৫০০ জন সদস্যদের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় অল্পসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি আমাদের মহকুমা সংগঠনের দুর্বলতার পরিচায়ক। তিনি সভ্যদের সংগঠনের মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্য নিয়মিত পাঠ করতে বলেন। তিনি পত্রিকাটির ব্যক্তিগত গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান। পরিশেষে নিখিলেন্দু ভট্টাচার্য সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মেটিয়াব্রুজ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ মেটিয়াব্রুজ আঞ্চলিক শাখার ২০০৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা বড়তলা মাধ্যমিক (উচ্চ) বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন বড়তলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রেখা সেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষিকা অলকা দাস এবং রেখা সেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন দক্ষিণ শহরতলী (পশ্চিম) মহকুমা সম্পাদক সুশীল চ্যাটার্জী। তিনি তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাকে বে-সরকারীকরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অঞ্চল সম্পাদক সত্য সাউ। প্রতিবেদনে শিক্ষাকে বে-সরকারীকরণ, তামিলনাড়ুতে ধর্মঘটী শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের উপর নগ্ন আক্রমণ এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের রায়ে জনগণের ধর্মঘট ও মিছিলের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয় যে আজকের ভয়াবহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত সুলভ আত্মসর্বস্বতার কারণে সংগ্রাম ও সংগঠন-বিমুখতা যেন বিশ্বায়ন-উদারীকরণ ও বে-সরকারীকরণ বিরোধী সংগ্রামের মূলস্রোত থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন নাদিয়াল জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক শচীন কামিলা, বদরতলা উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতন সরকার, বড়তলা মাধ্যমিকের শিক্ষক জনাব ইস্রাফিল, মেটিয়াব্রুজ হাইস্কুলের শিক্ষক জনাব আসফাক হোসেন, কে সি মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রবীন্দ্র ঝা। আলোচনান্তে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক নির্মলেন্দু গুহ। উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তরের ব্যাখ্যা করেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায়। ৪% মহার্ঘভাতা বকেয়া সহ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যাতে অবিলম্বে পান তার জন্য সংগঠন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে বলে জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম রসুল।

পূর্ব মেদিনীপুর

তমলুক-২ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৩রা জানুয়ারী ডিমারী গার্লস হাইস্কুলে তমলুক-২ আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১৫টি বিদ্যালয়ের ৯৮ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে সফল হোল। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও আঞ্চলিক



শাখার সভাপতি বিমল ভক্তা সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদবেদীতে মাল্যদান, কুচকাওয়াজ সহযোগে সম্মিলিত অভিবাদন জ্ঞাপন ও সংগীত-নৃত্যসহযোগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় ৯০ জন দর্শক, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ ৫০০ দর্শকের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণীসভায় ৫৪ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রধান অতিথি মহকুমা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পবিত্র ঘোষ সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় সম্প্রীতির বাতাবরণে সংগঠনের প্রাসঙ্গিক কর্মসূচীর আবেদনময় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ডিমারী গার্লস স্কুলের প্রায় ৬০ জন ছাত্রী পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে আকর্ষণীয় নৃত্য পরিবেশন করে। প্রতিযোগিতা সফল হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক বিকাশ মণ্ডল।

নদীয়া

রাণাঘাট মহকুমা শাখা আয়োজিত কর্মশালা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাণাঘাট মহকুমা শাখার পরিচালনায় পেনশন, সার্ভিস বুক ও বিদ্যালয় পরিচালন বিষয়ে প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে গত ৪ঠা জানুয়ারী, ২০০৪ রাণাঘাট ভারতী হাইস্কুলে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বাগ্রে সমিতির মহকুমা সম্পাদক অলোককুমার ভদ্র কর্মশালার গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। কর্মশালা উদ্বোধন করেন সমিতির জেলা সম্পাদক বীরেন মণ্ডল। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বিষয়ে ও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ে আরও আন্তরিক হতে বলেন। এই ধরণের কর্মশালা নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাদের বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে তিনি ব্যাখ্যা করেন। বিদ্যালয় পরিচালন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন শ্রীমতী বন্যা শীল (চক্রবর্তী), প্রধান শিক্ষিকা, রাণাঘাট ব্রজবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। নদীয়া জেলা শাখার পেনশন উপসমিতির আহ্বায়ক উমাপদ সাহা সার্ভিস বুক সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। পেনশন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলেন কলকাতা জেলা শাখার পক্ষ থেকে চিত্ত মণ্ডল। সবথেকে শীতলদিন থাকা সত্ত্বেও মোট ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। ভারতী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রমাপ্রসাদ রায় এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় কর্মশালার কাজ শেষ হয়। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন মহকুমা সমিতির সভাপতি সুকুমার কর।

হুগলী

হুগলী সদর মহকুমা শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হুগলী সদর মহকুমা শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৩ চুঁচুড়ায় জেলা ক্রীড়া সমিতির ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা ১১টায়। মহকুমা শাখার অন্তর্ভুক্ত ধনিয়াখালি, দাদপুর, পোলবা, হুগলী-চুঁচুড়া, মগরা, বলাগড় ও পাণ্ডুয়া—এই সাতটি আঞ্চলিক শাখার প্রতিযোগীগণ, সংগঠকবৃন্দ, চুঁচুড়ার ক্রীড়া পরিচালক সমিতির সদস্যবৃন্দ, হুগলী গৌরহরি হরিজন বিদ্যামন্দির স্কুলের এন সি সি দল, স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের নর্থ হুগলী রিজিওন্যাল ক্লিনিক ইউনিট এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হুগলী জেলার ব্যাণ্ড বাদক দল তাদের ব্যাণ্ডসহ

মার্চপাস্টে অংশগ্রহণ করেন। অভিবাদন গ্রহণ করেন জেলা শাখার সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য মানস দাশগুপ্ত।

সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদিকা মিত্রা ভট্টাচার্য্য। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার মাননীয় সাংসদ রূপচাঁদ পাল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় ও ক্রেতা বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্রনাথ দে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে চুঁচুড়া বালিকা শিক্ষামন্দির এবং ভদ্রেশ্বর সারদামণি বিদ্যাপীঠের ছাত্রীবৃন্দ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মানস দাশগুপ্ত। বেলা ১১.৩০টায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সাতটি আঞ্চলিক শাখার প্রায় দুইশতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মোট ২০টি ইভেন্টের মধ্যে ১৯টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়। একটি ইভেন্টে একজন মাত্র প্রতিযোগী থাকায় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত করা যায় নি। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মিগণ প্রতিযোগীসুলভ মানসিকতা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।

বিজয়ী প্রতিযোগীদের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের) সার্টিফিকেট ও সমিতির স্মারক উপহার দেওয়া হয়। উপহার প্রদান করেন মাননীয় সাংসদ রূপচাঁদ পাল, সমিতির কেন্দ্রীয় নেত্রী মিত্রা ভট্টাচার্য্য, সমিতির প্রবীণ সদস্য ও সমাজসেবী সত্যনারায়ণ ব্যানার্জী, ব্যাণ্ডেল বিদ্যামন্দির গার্লস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা ও সমাজসেবী আরতি মুখার্জী, মহকুমা শাখার সভাপতি শিবরাম ঘোষ, সম্পাদকের পক্ষে অশোককুমার চন্দ্র, সহ-সভাপতি বিমল পাল, সহ-সম্পাদক অরুণ ব্যানার্জী, সহ-সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ সুদীপ তরফদার, জেলা শাখা সদস্য উদয় চক্রবর্তী, দাদপুর আঞ্চলিক শাখা সম্পাদক মাধব চক্রবর্তী, মহকুমা শাখা সদস্য তিমির সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, এছাড়াও উপহার প্রদান করেন বিশিষ্ট ক্রীড়াশিক্ষক আশিষ ঘোষ, কিশোর চ্যাটার্জী, সনৎ চ্যাটার্জী প্রমুখ।

সমিতির অন্যতমা সদস্যা আরতি মুখার্জী এবং মল্লিকবাটী পাঠশালা ইউনিটের আর্থিক সহায়তায় উপস্থিত সংগঠক, পরিচালক এবং প্রতিযোগীদের একটি করে কলম উপহার দেওয়া হয়। ক্রীড়া অনুষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্য আঞ্চলিক শাখাগুলি মিলিতভাবে ছয় হাজারের বেশী টাকা সংগ্রহ করে দেন। ক্রীড়া পরিচালক সমিতির ২২ জন সদস্যকে সমিতির পক্ষ থেকে একটি করে হাতব্যাগ উপহার দেওয়া হয়। বিভিন্ন ক্রীড়াসামগ্রী, তাবু প্রভৃতি সরবরাহ করে সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির, হুগলী মাদ্রাসা, হুগলী মহসীন মহাবিদ্যালয়, জেলা ক্রীড়া সমিতি এবং জেলার পুলিশ বিভাগ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয় হুগলী-চুঁচুড়া আঞ্চলিক শাখাকে।

সমিতির কেন্দ্রীয় নেত্রী মিত্রা ভট্টাচার্য্য পরিশেষে ক্রীড়া অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাঁকুড়া

জেলা শাখা আয়োজিত

অনিলা দেবী ভবনের উদ্বোধন

গত ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ আটশতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে এ বি টি এ বাঁকুড়া জেলা শাখার সম্প্রসারিত ভবন-এর উদ্বোধন হ'ল। ভবনটির নামকরণ করা হয়েছে সংগঠনের প্রবাদপ্রতিম নেত্রী অনিলা দেবীর নামে 'অনিলা দেবী ভবন'। জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের দেয় অর্থের সাথে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির আর্থিক আনুকূল্যে ভবনটি সম্পসারিত হয়েছে। ভবনটির উদ্বোধন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানের শুরুতে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সমিতির সভাপতি তরণী পাত্র। এরপর রাজ্য ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ, ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্ব, কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতৃত্ব এবং জেলা গণ-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন। ভবনের ফলক উন্মোচনের পর সমিতির সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী রক্তগোলাপে গাঁথা মালা কেটে দ্বারোদ্ঘাটন করেন। হলে প্রবেশ করে নেতৃবৃন্দ অনিলা দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

জেলার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উদ্বোধনী সমাবেশ হয় জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্য্যালয় শিক্ষাভবন প্রাঙ্গণে। সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক মুক্তিপ্রসন্ন দুবে। সাধারণ সম্পাদক অমল ব্যানার্জী সমাবেশের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমানে শিক্ষক সমাজের নিকট সবচেয়ে বড় সংকট সাধারণের শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করে শিক্ষা

অঙ্গনকে অটুট রাখা। আর তার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শ্রেণীশিক্ষণকে মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলা। এ ছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহ-সম্পাদক মিত্রা ভট্টাচার্য্য, সহ-সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য্য, শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা শৈলেন দাশশর্মা, শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক প্রশান্ত ধর এবং ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক পার্থ ঘোষ। সভাতে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটকে সর্বাত্মক ফলপ্রসূ করার আহ্বান জানানো হয়। জেলা সভাপতি তরণী পাত্র সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নোদাখালি আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে স্মরণসভা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নোদাখালি আঞ্চলিক শাখা গত ৩রা মার্চ বেলা ৩টায় মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ে সমিতির প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম নেত্রী অনিলা দেবী, সমিতির অন্যতম প্রাণ-পুরুষ আজীবন সদস্য, শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী যুব-আন্দোলনের সফল নায়ক মাষ্টারদার (বিপ্লবী সূর্য্য সেনের) সুযোগ্য অনুগামী শিষ্য শশিমোহন ভট্টাচার্য এবং সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য, অবিভক্ত ২৪-পরগণা জেলা তথা বর্তমান দক্ষিণ ২৪- পরগণা জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, অখণ্ড আলিপুর মহকুমা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক ও সংগঠক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক আব্দুস ছোব্‌হান গাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত হয়ে প্রয়াত নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। আলিপুর মহকুমা শাখা গঠনের অন্যতম রূপকার এবং প্রথম সংগঠন সভাপতি অশীতিপর বৃদ্ধ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাধানাথ পণ্ডিতের উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শম্ভু সেন, জেলা শাখার পক্ষে তুলসী মাজী, আলিপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক ডঃ নুরুল ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি প্রশান্ত চন্দ্র।

প্রয়াত নেতৃত্রয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালন ও শোক সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে স্মরণসভার কাজ শুরু হয়। প্রথমে আলিপুর মহকুমার সম্পাদক ডঃ নুরুল ইসলাম প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনাদর্শ এবং সমিতি গঠনে তাঁদের অমূল্য অবদান ও প্রেরণার কথা বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর আজকের সভার মূল বক্তা শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে অনিলাদি, শশিমোহন ভট্টাচার্য ও আব্দুস ছোব্‌হান গাজীর জীবনাদর্শ, কর্তব্যনিষ্ঠা, সমিতির নেতৃত্বদানে এবং বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলেন। তিনি বলেন, এঁদের মূল ভাবাদর্শ ছিল Duties know no holiday. তাঁদের কর্তব্যচেতনা, সমাজচেতনা, এবং সেবামূলক দায়িত্ববোধের পরিচয় এবং আদর্শ মানুষ রূপায়ণে যে অবদান রেখেছেন তার উল্লেখ করেন।

বর্তমান কেন্দ্রের শাসকবৃন্দ যেভাবে দেশকে পরিচালনা করছেন, তাতে শিশুমন থেকেই বিবেক বলে বস্তুকে হরণ করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত চালাচ্ছে, ইতিহাসকে ক্রমাগত বিকৃত করে চলেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী সূর্য্য সেনের সহযোগী যোদ্ধা শশিমোহন ভট্টাচার্য, সাধারণ মানুষের সংগ্রামের সাথী অনিলাদি ও আদর্শ শিক্ষক আব্দুস ছোব্‌হান গাজীর জীবনাদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সফল করতে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষক শ্রেণীর উপর যে জঘণ্য আক্রমণ করছে তার বিরুদ্ধে তীব্র শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুললেই তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হবে।

উত্তর ২৪ পরগণা

বনগ্রাম মহকুমা শাখার উদ্যোগে সমাবেশ

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বনগ্রাম মহকুমা শাখার ডাকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সমাবেশ বনগাঁ উচ্চ-বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী কমরেড সুব্রত বসুর সমর্থনে এই সমাবেশে মহকুমার প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় ছিল।

প্রার্থী সুব্রত বসুকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দিত করেন কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য অশ্বিনী পাণিগ্রাহী এবং সারাভারত কৃষকসভার সর্বভারতীয় নেতা রণজিৎ মিত্রকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক বারীন বিশ্বাস।

সভার শুরুতে আগামী লোকসভা নির্বাচনের গুরুত্ব ও

তাৎপর্য সম্পর্কে সমিতির সদস্যদের অবহিত করার সাথে সাথে নির্বাচনে এন ডি এ জোটকে পরাস্ত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অশ্বিনী পাণিগ্রাহী।

বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থীর সংগ্রামী জীবন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর পরিবারের অবদান সম্পর্কে সভায় অংশগ্রহণকারীদের যথাযথভাবে অবহিত করার মধ্যদিয়ে তাঁর পরিচয় বিনিময় করিয়ে দেন রণজিৎ মিত্র। তিনি বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গনে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিপদের বিরুদ্ধে



দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। সেই সাথে গোটা দেশজুড়ে কৃষক-ক্ষেতমজুরদের অবস্থার কথা তুলে ধরেন।

প্রার্থী সুব্রত বসু আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিদেশের কাছে বন্ধক দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য আবেদন করেন। সেই সাথে গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করে বাম-গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সমন্বয়ে বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগকে বাস্তবায়িত করার ও কার্যকর করার আহ্বান জানান। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক বারীন বিশ্বাস।

সভার কাজ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সভাপতি রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে নির্বাচনী কনভেনশন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে ২১শে মার্চ পুরুলিয়াতে জেলা সমিতিভবনে (সত্যপ্রিয় ভবনে) এক নির্বাচনী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই (এম) প্রার্থী আমাদের প্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং এণ্ড ফিনান্স কমিটির সদস্য শ্রদ্ধেয় কমরেড বাসুদেব আচারিয়া ও পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় কমরেড বীর সিং মাহাত'র সমর্থনে ঐ নির্বাচনী কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে প্রচারপত্র ছাপিয়ে প্রতিটি সদস্য-সদস্যাদের কাছে নির্বাচনী কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

কনভেনশন উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা সি পি আই (এম) পার্টির জেলা সম্পাদক নকুল মাহাত। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন কমরেড বাসুদেব আচারিয়া, কমরেড বীর সিং মাহাত, সারাভারত কৃষকসভার রাজ্য নেতৃত্ব মণীন্দ্র গোপ, সমিতির জেলা সম্পাদক অনাথ ব্যানার্জী, মহকুমা সভাপতি অবিনাশ মাহাত। প্রত্যেক বক্তার পক্ষ থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অতীতের ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয় ও বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের কাছে এন ডি এ-জোট সরকারের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য প্রচারক ও সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্যও অনুরোধ করা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য হিসেবে প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে কমপক্ষে একদিনের বেতন (মোট বেতনের) নির্বাচনী তহবিলে দেওয়ার জন্য জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত কনভেনশনে জানানো হয়। অবিনাশ মাহাত ও সৌরীন মিশ্রকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর সুষ্ঠু পরিচালনায় কনভেনশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রায় চারশতাধিক সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন প্রায় চারঘন্টা ধরে চলে।

দার্জিলিঙ

মাটিগাড়া-বাগডোগরা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে তৃণমূলী হামলার প্রতিবাদে সভা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত কিছু সমাজবিরোধী বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে হামলা ও

ভাঙচুর করে। ওদের ডাকা অযৌক্তিক বন্‌ধের আহ্বানে সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও জনগণ সাড়া না দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। এর ফলেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ঘরে হামলা চালায়। তারা জোর করে প্রধান শিক্ষক জহর সোমকে ঘর থেকে বাইরে এনে বিদ্যালয় বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে, উপস্থিত একজন শিক্ষিকা বাধা দিতে এলে তাকেও লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করে। বেশ কিছু স্কুটার, সাইকেলও ভাঙচুর করে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে মাস্টারমশাইরা এসে পড়ায় তারা পালিয়ে যায়।

এর প্রতিবাদে ৫ই ফেব্রুয়ারী মাটিগাড়া-বাগডোগরা জোনাল কমিটির ডাকে ঐ বিদ্যালয়ে সভা করা হয়। এই ধরনের হামলার উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক ভবেশ রায়, জোন সভাপতি অরুণ সূত্রধর, ফাঁসীদেওয়া জোনাল কমিটির সম্পাদক রণজিৎ দে প্রমুখ।

এরপরে প্রায় শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর এক দৃপ্ত প্রতিবাদ মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। শহরের তিনটি স্থানে পথসভা করা হয়। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়ে এবং তৃণমূলীদের বেশি বেশি করে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাখার অন্যতম সহ-সম্পাদক সুরেন্দ্র সিং, ভবেশ রায়, অরুণ সূত্রধর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার আহ্বানে কর্মীসভা

গত ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৪ শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার আহ্বানে স্থানীয় বয়েজ হাইস্কুলে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, মহকুমা ও জোন কমিটির সদস্যগণ ও প্রতিটি বিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং সম্পাদকেরা উক্ত সভাতে উপস্থিত ছিলেন। সভাতে আগামী সাংগঠনিক কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন মহকুমা সম্পাদক ভবেশ রায়। আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারীর অযৌক্তিক বন্‌ধের বিরোধিতা করে প্রতিটি বিদ্যালয় খোলা রাখবার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলার সভানেত্রী নন্দিতা ঘোষ।

গত ১১ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে আয়োজিত সমিতির ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রস্তাব সম্পর্কে উপস্থিত কর্মীদের অবহিত করেন জেলা শাখার সম্পাদক তমাল চন্দ। তিনি বিভিন্ন পেশাগত দাবী সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারীর জেলা জমায়েত ও ১৬ই ফেব্রুয়ারীর কেন্দ্রীয় জমায়েতকে সফল করে তোলবার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। ২৪শে ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটকে সফল করবার জন্য ও ঐদিন জেলার দপ্তর থেকে আয়োজিত মিছিলে সকলের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে আবেদন করেন।

সভাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, উপরোক্ত কর্মসূচীগুলি সফল করবার জন্য প্রতিটি কমিটির সভা আগামী সাতদিনের মধ্যে করা হবে এবং প্রতিটি বিদ্যালয় শাখার সভা করে দাবীসমূহের সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। এছাড়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী টিফিনের সময় গোটা জেলা জুড়ে একই সাথে সমস্ত বিদ্যালয় শাখার সদস্যরা ধর্মঘটের সমর্থনে সভা করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধর্মঘটের নোটিস দেবেন। উপরোক্ত সভাতে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাখার সভাপতি প্রবীর সরকার।

সভার শুরুতে সদ্য প্রয়াত সমিতির দীর্ঘদিনের নেতৃত্ব ও 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শশিমোহন ভট্টাচার্যের জীবনাবসানে গভীর শোক ব্যক্ত করে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহকুমা শাখার অন্যতম সহ-সম্পাদক নবারুণ চৌধুরী। উপস্থিত সকলে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পরিচালন সমিতির সদস্যদের অভিমুখীকরণ কর্মশালা

সম্প্রতি শিলিগুড়ি জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্যদের নিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান সম্পর্কে অভিমুখীকরণ কর্মশালা হয়ে গেল।

সর্বশিক্ষা অভিযান, শিলিগুড়ি মহকুমা ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপনায় এবং এ বি টি এ'র সহযোগিতায় মহকুমার তিনটি স্থানে ২৮-২৯শে জানুয়ারী এবং ১-২রা ফেব্রুয়ারী কর্মশালাগুলি করা হয়। ২৫টি করে বিদ্যালয়গুচ্ছ তৈরি করে তিনটি স্থানের কর্মশালাতে পরিচালন সমিতিগুলি থেকে ৫ জন করে প্রতিনিধি এতে অংশ নেন।

উপস্থিত প্রতিনিধিরা ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে দলগত আলোচনাতে অংশ নেন। প্রতিটি দলের পক্ষ থেকে লিখিত মতামত পেশ করা হয় এবং সম্মিলিত আলোচনার ভিত্তিতে ঐগুলি গৃহীত হয়।

কর্মশালাগুলি উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক গোপাল লামা। বক্তব্য রাখেন জেলা প্রকল্প আধিকারিক নিতাই পাল, ওয়ার্কিং গ্রুপের আহ্বায়ক মৃণাল দাস, পশ্চিমবঙ্গ

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য অমর সাহা এবং মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তি তমাল চন্দ প্রমুখ।

শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, মাটিগাড়া হরসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয় এবং বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মশালাগুলির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কর্মশালাকে সফল করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

বিভিন্ন দিনে কর্মশালাগুলি পরিচালনা করেন মুখ্যসম্পন্ন প্রশিক্ষক তমাল চন্দ, প্রবীর সরকার, অমর সাহা, সুরেন্দ্র সিং, ত্রিদিব বিশ্বাস, অনিমেষ মুখার্জী, হরিদাস গুণ, নন্দিতা ঘোষ, ভবেশ রায় এবং বিশ্বনাথ দত্ত।

উপস্থিত প্রত্যেক প্রতিনিধিই এই ধরনের কর্মশালার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন এবং সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করবার অঙ্গীকার করেন।

জেলা শাখার উদ্যোগে
শিক্ষা ও সাহিত্য-এর গ্রাহক-পাঠক সভা

গত ৭ই ডিসেম্বর নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিঙ জেলা শাখার উদ্যোগে শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র গ্রাহক ও পাঠকগণের একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক প্রশান্ত ধর, পত্রিকা উপ-সমিতির সদস্য সমীর ভট্টাচার্য এবং অশোক অধিকারী।

কর্মশালায় জেলা শাখার সহ-সভাপতি হরিদাস গুণ, অমর সাহা এবং সত্যব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে একটি সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। কর্মশালায় মোট ৬১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন হরিদাস গুণ এবং একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কর্মশালায় স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক তমাল চন্দ। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্য নিয়মিত পঠন-পাঠন এবং গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষা ও সাহিত্যের নিয়মিত পঠন-পাঠন সমিতির সদস্যদের মনন ও চিন্তনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে।

কর্মশালায় আলোচনার সূত্রপাত করেন সঞ্চালক প্রবীর কুমার সরকার ভিত্তিপত্র পেশ করে।

পত্রিকা সম্পাদক প্রশান্ত ধর পত্রিকার ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করেন। কঠিন লড়াই-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পত্রিকা তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। তার পিছনে সমিতির সদস্যদের অবদান রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বর্তমানে শিক্ষা ও শিক্ষকসমাজ যে নিত্যনতুন সমস্যা, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে চলেছে তার মোকাবিলায় সমিতির মুখপত্রটির সার্বিক উন্নয়ন এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব সমিতির প্রতিটি সদস্যের প্রাথমিক কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন। কর্মশালা পত্রিকা উপ-সমিতির সদস্যগণ তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান।

কর্মশালায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে পাঁচটি দলে বিভক্ত করে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। প্রতিটি দল মোট দুই ঘন্টা আলোচনা করেন এবং আলোচনান্তে প্রতিটি দলের নেতৃত্ব শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং নিম্নলিখিত সুপারিশ দেন ঃ

(১) পত্রিকার প্রচ্ছদটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

(২) শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়, সেগুলির মান যথেষ্ট উন্নত বলে প্রতিটি দল একমত হন। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আগামী দিনে এ বিষয়ে সমিতির সকল সদস্যকে এই দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রতিটি দল অঙ্গীকার করেন।

(৩) পত্রিকায় প্রকাশিত দুই/একজন কবির কবিতা ছাড়া অন্যান্য প্রকাশিত কবিতাগুলির মান যথেষ্ট উন্নত নয়। মনোগ্রাহী কবিতা লেখার ক্ষেত্রে এবং পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশনার জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা জেলা কমিটিগুলির পক্ষ থেকে নিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে বলে কর্মশালায় প্রতিটি দল উল্লেখ করেন।

(৪) পত্রিকায় ছোটগল্পের প্রকাশনা খুবই কম এবং এর মান ভাল নয়। ছোটগল্প লেখকগণের এ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

(৫) দলগত আলোচনায় গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশনায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, ক্রীড়া, শব্দজব্দ ও কার্টুন বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হোক।

(৭) সমিতির মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্য হিন্দী ও নেপালী ভাষাভাষী সদস্যদের নিকট খুব একটা প্রিয় পত্রিকা

বলে বিবেচিত হয় না। কেবলমাত্র কিছু সার্কুলার দেখার জন্য তারা এই পত্রিকাটিকে ব্যবহার করেন। পত্রিকাটির বহু ভাষায় প্রকাশনা সম্ভবপর না হওয়ায় কর্মশালায় হিন্দী ও নেপালী ভাষাভাষী প্রতিনিধিদলটি জেলাভিত্তিক প্রকাশনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া বিশেষ বুলেটিন বা বিশেষ পাতা সংযোজন করে মাঝে মাঝে হিন্দী ও নেপালী ভাষায় প্রকাশনার প্রতি দল আবেদন করেন।

পরিশেষে প্রতিনিধিগণ এ ধরনের কর্মশালা নিয়মিত করার আবেদন রাখেন। জোন স্তরে এ ধরনের কর্মশালা ব্যাপক ফলপ্রসূ হবে বলেও তারা আশা ব্যক্ত করেন। পত্রিকার ব্যক্তিগত গ্রাহক সংগ্রহে এবং পত্রিকার নিয়মিত পঠন-পাঠনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ অঙ্গীকারবদ্ধ হন। পাশাপাশি সমিতির সর্বস্তরের নেতৃত্বকেও এ বিষয়ে আরো বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান।

ভ্রম সংশোধন

শিক্ষা ও সাহিত্য-এর ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সংখ্যায় অপরেশ ভট্টাচার্যের 'চুয়ান্নর ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা' প্রবন্ধে অনবধানতাবশত একটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে ১৫৯ পাতার প্রথম স্তম্ভের শেষ দিকের একটি বাক্যে।

বাক্যটি এইভাবে আছে ঃ

"সেজন্যই ৫০-এর দশকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব ডাক দিয়েছিলেন Oust this Congress Govt."

বাক্যটি পড়তে হবে এইভাবে ঃ

"সেজন্যই ১৯৬৬ সালে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব ডাক দিয়েছিলেন Oust this anti-education, anti-people Govt."

এই ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় দুঃখিত।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

শোক

বিশিষ্ট মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ্ পল সুইজির জীবনাবসান



অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় জুড়ে সারা বিশ্বে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে যিনি শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, মার্কসীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রচার করেছেন সেই মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ্ পল সুইজি গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মহামূল্য অবদান অবিস্মরণীয়।

তিনি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস ও হার্ভার্ড বিশ্ব- বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। লণ্ডনেই তিনি মার্কসবাদ শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

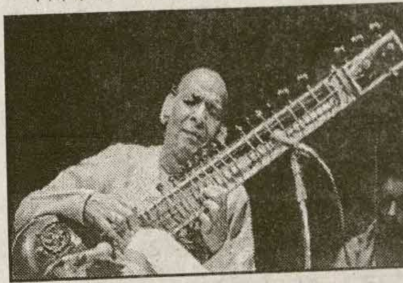
সুইজি নিজেই বলেছিলেন, "যে অর্থনীতি আমি পড়েছি তা বিংশ শতাব্দীর প্রধান কোনো ঘটনারই যথাযোগ্য বিশ্লেষণে অক্ষম।" ১৯৪৮ সালে 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সুইজি ও পল বারানের নেতৃত্বে এই পত্রিকা সমকালীন চিন্তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য মঞ্চ হয়ে ওঠে।

হার্ভার্ডে শিক্ষকতা করলেও সুইজি সেই সময় প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার সীমাবদ্ধতার বেড়া অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। 'মান্থলি রিভিউ'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল আলবার্ট আইনস্টাইনের লেখা। পরে চে গুয়েভারা, জোয়ান রবিনসন, জাঁ পল সাঁত্রে, ফিদেল কাস্ত্রো থেকে রবার্ট ম্যাকবেসনি এই পত্রিকায় তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। কুড়িরও বেশি গ্রন্থ লিখেছেন পল সুইজি। তাঁর পরিচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "মনোপলি ক্যাপিটাল ঃ অ্যান এসে অব দ্য আমেরিকান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল অর্ডার"। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে ধনতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ আছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'থিওরি অব ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্ট' মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। গত শতাব্দীর পাঁচ-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট বিরোধী ডাইনী খোঁজার ম্যাকার্থি অভিযানের তিনি শিকার হন। অবশ্য মামলায় তিনিই জয়ী হন।

সাম্রাজ্যবাদের আপোসহীন সমালোচক, সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক পল সুইজির মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর কন্যা ও অন্যান্য স্বজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

সেতারের যাদুকর উস্তাদ বিলায়েৎ খান প্রয়াত

বিশ্ববন্দিত সেতারবাদক উস্তাদ বিলায়েৎ হুসেন খান গত



১৩ই মার্চ মুম্বাইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২। ১৯২২ সালে পূর্বতন পূর্ববঙ্গের গৌরীপুরে বিলায়েৎ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার কাছেই পড়াশোনা করেন বিলায়েৎ। ১৯৩৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর মা, দিদিমা এবং মামার কাছে শিক্ষা নেন। উস্তাদ বিলায়েৎ খান ছিলেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় সেতারবাদক। তিনি ছিলেন সবচেয়ে উন্নত হস্তকৌশলের অধিকারী। তিনি ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ পিতামহ ইমদাদ খান ও পিতা এনায়েত খানের সুযোগ্য উত্তরসূরী। বাম হাতের মিড় দ্রুত ওঠানামা করা একহারা তান ও দুরূহ মিড় যুক্ত খেয়াল অঙ্গের তানের উৎকর্ষের দিকেই তিনি মনোনিবেশ করেন এবং অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। 'বিলায়েত খানি' সেতার বাদনশৈলী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের কাছে। তাঁর আবিষ্কৃত সেতার আজ গান্ধার-পঞ্চম সেতার নামে পরিচিত। তিনি সেতার যন্ত্রে দরবারি কানাড়া, ইমন, পুরিয়া, শঙ্করা, ঝিঁঝোটি দেশ, তিলক কামোদ-এর মতো রাগগুলি বাজিয়ে সারা দেশের শ্রোতাদের অভিভূত করেছেন। বিলায়েতের মধ্যে ছিল তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ এবং নিজের শিল্পচর্চা সম্পর্কে প্রবল আত্মবিশ্বাস। কখনো সরকারি খেতাবের জন্য লালায়িত হন নি। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ খেতাব তিনি হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সমিতি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কমলা বসুর জীবনাবসান



বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কমলা বসু ১৩ই মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৯। কমলা বসু ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। ১৯৪৬-এ ম্যাট্রিক পাশ করে সঙ্গীত ভবনে ভর্তি হন। তিনি দীর্ঘকাল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি দক্ষিণী, গীতবিতান এবং সুরঙ্গমায় গান শিখিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সমবেদনা জানাচ্ছে।

হাওড়ার প্রবীণ জননেতা বিনয় রায়ের জীবনাবসান

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা কমরেড বিনয় রায় গত ১০ই মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। কমরেড বিনয় রায় এ আই এস এফ-এর হাওড়া জেলা কমিটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন যার প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সমর মুখার্জী। ১৯৩৮ সালে হাওড়া টাউন হলে বিনয় রায় এ আই এস এফ-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমরেড বিনয় রায় তিনবার হাওড়া পৌরনিগমের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তিনি মেয়র-ইন-কাউন্সিলও হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হাওড়ার সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছের মানুষ ও কাজের মানুষ। মিষ্টভাষী সদ্ব্যবহারী 'বিনয় দা'-র মৃত্যুতে এলাকার মানুষ শোকস্তব্ধ। সমিতি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

●

হাওড়া জেলার অন্তর্গত সমিতির আমতা পূর্ব আঞ্চলিক শাখার কোষাধ্যক্ষ গোপাল সাধুখাঁ মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে গত ২৮শে জানুয়ারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

●

হাওড়া জেলার অধীন শাঁকরাইল আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত দক্ষিণ শাঁকরাইল হাইস্কুলের দীর্ঘদিনের সমিতি সদস্য শান্তিরঞ্জন গোস্বামী গত ২০শে ডিসেম্বর '০৩ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

●

কোচবিহার জেলার অধীন কোচবিহার সদর মধ্য আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত কলাবাগান হাইস্কুলের শিক্ষাকর্মী সুরেন্দ্র প্রসাদ রায় গত ১৪ই ডিসেম্বর '০৩ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঐ শাখার অন্তর্গত খাপাইডাঙ্গা জয়কান্ত উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী, সমিতির আজীবন সদস্য অর্দ্ধেন্দু বর্মণ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে প্রয়াত হন।

●

কোচবিহার জেলার অধীন মাথাভাঙা মহকুমার অন্তর্গত আটপুকুরী উচ্চবিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক এবং বিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি, সমিতির আজীবন সদস্য নির্মলেন্দু নন্দী গত ২৭শে অক্টোবর '০৩ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

●

কোচবিহার জেলার অধীন শীতলকুচি আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত মহিষমুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী সুরেন্দ্রনাথ বর্মণ গত ৩রা ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

●

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত বাগমারা বি এম বিদ্যানিকেতনের সহ-শিক্ষক ও সমিতির দীর্ঘদিনের সদস্য আব্দুস সালাম সাহেব গত ২৮শে সেপ্টেম্বর '০৩ কর্মরত অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বৎসর।

এদের মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং প্রয়াতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমিতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

গ্রন্থাবলোকন

শঙ্খচিলের ঠিকানা

প্রশান্ত ধর

কলস্বনা

প্রকাশক ঃ অমল কর
কলস্বনা
৩/৮৫, চিত্তরঞ্জন
যাদবপুর, কলকাতা-৩২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ২০০৪
মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

লেখক প্রশান্ত ধর-এর 'শঙ্খচিলের ঠিকানা' শিবরাম-উত্তর সাহিত্য চর্চায় এক অনবদ্য সংযোজন। তাঁর নিঃশব্দ নীরব সাহিত্য-সাধনার উজ্জ্বল নিদর্শন এই গ্রন্থ। লেখকের জন্ম ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। জন্মস্থান ছোট শালগড়িয়া, পাবনা জেলা, বাংলাদেশ। বাবা প্রমথনাথ ধর, মা নির্মল কুমারী। কলকাতা আর দার্জিলিং-এ তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষার সময়কাল অতিবাহিত হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাম্মানিক স্নাতক ও এম এ।

প্রথমে কিছুদিন কলকাতার গঙ্গাপুরী শিক্ষাসদন, পরবর্তীকালে কালনা মহারাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। অবসর নিয়েছেন ২০০০ সালে।

একেবারে নীচের স্তর থেকে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সেবক হিসাবে কাজ করে তিনি মহকুমা, জেলা নেতৃত্বের পথ ধরে উঠে এসে এখন সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। শিক্ষা ও সাহিত্য-এর সম্পাদক হিসাবে এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন তিনি। ৮৩ বছরের শিক্ষা ও সাহিত্য-এর যুগ্ম সম্পাদক থাকাকালীন তাঁর উড়ান পর্বের লেখাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। পাঠক মহলে সাড়া পড়ে যায়। শিক্ষা ও সাহিত্য-এর কোনো সংখ্যায় 'উড়ান' প্রকাশিত না হলে পাঠকরা খোঁজ নিতেন পত্রিকা দপ্তরে, কবে আবার 'উড়ান পর্ব' প্রকাশিত হবে। এই সাংস্কৃতিক আকালের যুগে 'শঙ্খচিলের ঠিকানা'-য় পাঠক খুঁজে পাবেন 'গরম ভাত'-এর স্বাদ। জীবনপুরের পথিক প্রশান্ত ধর জগত ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিয়েছেন এই গ্রন্থে মানুষের প্রতি অসীম মমতায়।

'ক্রন্দসী' ছদ্মনামে 'রবিবার' পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তিনি প্রথম লেখা শুরু করেন দক্ষিণ কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর মুখপত্র 'সংস্কৃতি' পত্রিকায়। তিনি ধারাবাহিকভাবে স্বনামে এই পত্রিকায় লিখেছেন বহু দিন। ভাষাতত্ত্বে তাঁর গভীর জ্ঞান আমাদের বিস্মিত করে। প্রতিদিনের মেলামেশায় ছন্দবদ্ধ হাস্যরসপূর্ণ ছড়া ও কবিতা, যা গভীর তাৎপর্যবাহীও বটে, রচনা করে, তার মাধ্যমে কথা বলার অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাঁর। আমরা অভিভূত হই তাঁর এই দক্ষতায়। এই দক্ষতার প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে।

'শঙ্খচিলের ঠিকানা' গ্রন্থটি লেখার উদ্দেশ্য লেখক নিজেই ব্যক্ত করেছেন গ্রন্থের প্রথম পর্বে এইভাবে ঃ

"আমি যে বিদ্যালয়ে পড়েছি তারই এক বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র সাহিত্যিক বিমল মিত্রের ভাষায় — এক একটা মানুষকে আবিষ্কার করার মধ্যে একটা মহাদেশ আবিষ্কার করার স্বাদ পাওয়া যায়। আমি সেই মানুষের মহাদেশকে আবিষ্কার করতে চাই শঙ্খচিলের মতো ডানা মেলে। মানুষকে সমগ্র করে ছুঁয়ে যেতে চাই।

ইংরাজ কবির মতো বলতে ইচ্ছে করে,

Man is no an island
He is a part of the continent
So when a man dies
I become poorer
Send no one to know
For whom the bell tolls
It tolls for thee!

তাই মানুষের মগ্ন মনের গহন আকাশে শঙ্খচিলের ঠিকানা খোঁজার উড়ান চলবে।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সব চেয়ে দুর্গম এই মানুষ আপন অন্তরালে/তার কোনো পরিমাপ নেই বাহিরের দেশ কালে।" সেই মানুষের ঠিকানার খোঁজেই তিনি সারা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন। বহু অভিজ্ঞতা তাঁর। মাটির কাছাকাছি

থেকে মানুষকে জানার, বোঝার চেষ্টা করেন তিনি। দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর এ কাজের বিরাম নেই। প্রবীণ প্রশান্ত ধর 'নবীন ডাগর চোখে'র অধিকারী বলেই একাজ করতে পারেন।

'চুয়ান্নর স্মরণীয় দশ দিন ঃ সংযোজন'-এ তাই তিনি নগ্নপদ, নগ্নগাত্র অবনী পণ্ডিতের কথা শুনিয়েছেন অসামান্য দক্ষতায়।

"এলেন '৫৪ সালের আন্দোলনের আর এক সত্যাগ্রহী অবনী পণ্ডিত মশাই। নগ্নগাত্র, নগ্নপদ ধূলিধূসরিত আচার্য। মুখে মুখে ছড়া কাটতেন। এখনো মনে আছে ঃ

'যতো পারো রাগ করো
ক্রোধ কোরো না ভাই
রাগে বাড়ে অনুরাগ
ক্রোধে করে ছাই।'

১৯৫৪ সালের স্মরণীয় শিক্ষক আন্দোলনের ছবি 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতা জুড়ে বের হলো। শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মধ্যমণি নগ্নপদ, নগ্নগাত্র অবনী পণ্ডিতের ছবি যেন এই ব্যবস্থার শোষণ প্রক্রিয়ার প্রতীকী ব্যঞ্জনা। তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করলো 'স্বাধীনতা' পত্রিকা ঃ ড্রেনের পাশে খোলার ঘরে বঞ্চিত দরিদ্র জীবনযাপন — চতুর্দিকে শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। নিত্য বেতন বঞ্চিত উপবাসী জীবন।

জ্ঞানীগুণী, প্রতিভাধর সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ, মানবদরদী শিক্ষক, সহকর্মী বন্ধু, মানবমুক্তি সংগ্রামের শহীদ, অসংখ্য অধিকার বঞ্চিত অসহায়, নিরক্ষর, নিরন্ন সংগ্রামী মানুষের কথা আছে তাঁর এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। মানুষের যন্ত্রণায় তার প্রতি অসীম মমতায় ও শ্রদ্ধায় তাঁর লেখনী দিয়ে যেমন অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়েছে তেমনি তাঁর লেখনী অশান্ত হয়ে উঠেছে মানুষের গ্রাস কেড়ে খাওয়াদের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে, পাঠককূল এই গ্রন্থের পাঠশেষে এক চরিত্র উপন্যাসের স্বাদ পাবেন বলে মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দর্শনে আজীবন একনিষ্ঠ লেখক শেষ উড়ানে বলেছেন, "জয় হোক চিরজীবিত মানবতার"। আশাবাদী লেখকের দৃঢ়প্রত্যয় ঃ "আগামী পৃথিবী আজকের নবজাতকদের বাসযোগ্য করে তোলার সংগ্রাম চলছে চলবে। আজকের এই ব্রাহ্ম মুহূর্তের জার্নাল সেই আগামী প্রত্যাশারই নান্দীমুখ।"

ধন্যবাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা সংস্থা কলস্বনাকে সাহসের সঙ্গে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য। লেখক অজস্র শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমাদের সকলের পরম আপনজন সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় রামরমণ ভট্টাচার্যকে, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। সত্যই এ যুগে এমন মানুষ বিরল।

প্রচ্ছদ গ্রন্থ-শিরোনাম অনুসারী হয়েছে। প্রচ্ছদ গ্রন্থের অন্তর্বস্তুরও ইঙ্গিতবাহী। কিছু মুদ্রণপ্রমাদ আছে যা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে আশা করা যায়। 'শঙ্খচিলের ঠিকানা' শিরোনামটি প্রচ্ছদে আসুক পরবর্তী সংস্করণে, কারণ এখন আছে 'শঙ্খচিলের উড়ান'। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁর এই গ্রন্থ সাহিত্য রসিকদের যেমন তৃপ্ত করবে, অগণিত সাধারণ পাঠককেও তেমনই তৃপ্ত করবে নির্মল হাস্যরসের ঝরণা ধারায়।

— শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

● সর্বনাশা কেন্দ্রীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রাম গড়ে তুলুন।
● ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে হবে।
● শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণ, ইতিহাসের বিকৃতি ও বাণিজ্যিকীকরণ রুখতে হবে।

এন ডি এ সরকারের চলতি আর্থিক বছরে চোখ ধাঁধানো আট শতাংশ অর্থনৈতিক বিকাশের দাবি ও প্রকৃত চিত্র

আগের বছরগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যকে দু'টি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। একটি পর্ব ১৯৯৮ সালের ১লা এপ্রিলের আগের ছ'বছর, অপরটি ঐ তারিখের পরবর্তী ছ'বছর। আলোচনার সুবিধার জন্য এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে পর্ব দুটিকে প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব বলে উল্লেখ করা হবে। প্রথম পর্বে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস ও সংযুক্ত মোর্চা, দ্বিতীয় পর্বে বি জে পি-নেতৃত্বাধীন এন ডি এ। এই দু'টি পর্বকে পাশাপাশি রাখলেই আমরা কংগ্রেস ও সংযুক্ত মোর্চা সরকারের ভূমিকার সাপেক্ষে এন ডি এ সরকারের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে পারব।

এখানে যে দু'টি পর্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক সেই দুই পর্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশের হারের চেহারা কেমন।

সারণি

এন ডি এ সরকারের আমলে ও তার আগে বিকাশের হার

জি ডি পি/বিভিন্ন ক্ষেত্র	প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব
জি ডি পি বৃদ্ধির গড় হার		
প্রকৃত জি ডি পি (উপাদান মূল্যে)	৬.৮৬	৫.৩২
প্রকৃত জি ডি পি (বাজারের মূল্যে)	৬.৬৯	৫.৩৩
জি ডি পি বৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধি হার		
প্রকৃত জি ডি পি (উপাদান মূল্যে)	৬.২৯	—
প্রকৃত জি ডি পি (বাজারের মূল্যে)	৬.০২	৪.৯৭
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার		
সমস্ত ফসল	২.১৩	—১
খাদ্যশস্য	১.৫	—১.২
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধি হার		
সমস্ত ফসল	১.৫১	—০.৯৪
খাদ্যশস্য	১.১৯	—১.৫৮
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার		
গড় হার	৮.৫৮	৪.৪৭
চক্রবৃদ্ধি হার	৭.৯৬	৩.৯৫
বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার		
গড় হার	৯.৫	৫.২৬
চক্রবৃদ্ধি হার	৯	৪.৮৬

● জি ডি পি অর্থাৎ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশন বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

● বিনিয়োগ অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠন।

● প্রত্যেক পর্বের প্রতি বছরের বৃদ্ধির হারকে লেখচিত্রে উপস্থাপিত করে ঐ ছ'টি বিন্দুর প্রতিনিধিত্বকারী একটি সরলরেখা আঁকা হলে যে হার পাওয়া যাবে, তাকেই বলা হয়েছে গড় হার। সংখ্যাতত্ত্বের ভাষায় একে বলা যেতে পারে ট্রেড রেট।

● চক্রবৃদ্ধি হার বলতে বোঝানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট পর্বের প্রথম বছর ও শেষ বছরের বৃদ্ধির হারের পার্থক্যকে।

এই সারণি বলছে, দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ এন ডি এ সরকারের আমলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে।

একথা ঠিকই যে, ২০০২-০৩ সালে অর্থনৈতিক বিকাশের অনুমিত হিসাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বর্ষা। বৃষ্টি হয়েছে বেশ কম, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি উৎপাদন। আবার একথাও ততটাই ঠিক যে, আপাতদৃষ্টিতে চলতি আর্থিক বছরে অর্থনীতি চমৎকারভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে যে বোঝানো হচ্ছে এবং সরকার ও শাসক দলের প্রচারে যার ঢক্কানিনাদ চলছে, তাও আসলে কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতি ছাড়া আর কিছু নয়। আর তার কারণ, এবছর খুবই ভালো পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে।

হ্যাঁ, দুঃখজনক হলেও বাস্তব এটাই যে, আজও ভারতীয় অর্থনীতি প্রবলভাবেই বর্ষার ওপরে নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদনে তো বটেই, সামগ্রিক অর্থনীতিতেও এখনও বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে পারে বর্ষা।

উৎস ঃ এন ডি এ-র প্রচার চোখ ধাঁধাচ্ছে, সাফল্য নয়—লেখিকা জয়তী ঘোষ, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক।

গণশক্তি, ১৩.৩.০৪

● কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা নীতির ফলে সাধারণের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থা আক্রান্ত—এ আক্রমণ রুখতে হবে।

● কেন্দ্রীয় সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সঙ্কটের মোকাবিলায় শিক্ষাদরদী বামফ্রন্ট সরকারের পাশে দাঁড়ান।

● সাম্রাজ্যবাদ-সন্ত্রাসবাদ-মৌলবাদ ধ্বংস হোক।

Teachers' Journal

ORGAN OF THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Editor : Sri Prasanta Dhar ★ Joint Editor : Sri Sibaprasad Mukhopadhyay

VOL. LXXXIII NO.3 MARCH, 2004

Editorial

ENSURE VICTORY OF LEFT FRONT CANDIDATES IN ENSUING PARLIAMENT ELECTIONS

There is increasing poverty; there is illiteracy; there is denials. Unemployment is on the rise, job opportunity has reached the lowest ebb. There is no endeavour for job generation. All sorts of subsidies are being withdrawn. The peasants are being cornered economically – the Central Govt's economic policies are snatching away all means of subsistences of the common people. Against this backdrop "feel good" and "India shining" propaganda are publicised through media. And this propaganda has been done spending public money to the tune of Rs. five hundred crore despite financial crunch.

But how good is "feel good"? Does the country feel anything really good emerging up? Yes, the affluent sections and corrupt persons and 'coercive instruments of coercion' have reasons to 'feel good'. The populace and middle class have reasons to feel 'suffocated' under the misrule of the BJP-led NDA Govt for past six years.

Indian democracy has reared up the concept of 'Welfare State'. But the BJP-led Central Govt has pushed the 'Welfare policy' to the rearest seat, and is pursuing an anti-people fiscal policy to appease US economic imperialism. WTO, World Bank and International Monetary Fund have established their suzereignty over the economic potentialities of our country. India has become a good hunting ground for the Multi-national Corporations.

The BJP during its tenure has destroyed self-reliant policy which is a fundamental need for national development. The Public Sector Units are being destroyed in a systematic manner. Even the profit-making PSUs are sold completely or major shares are transferred to the private capital. As a matter of fact, the loot of PSUs is going on under the direct patronage of the NDA Govt. And the prime minister Mr. Atal Behari Bajpayee is the man directly responsible for all evils.

The truth has come to the forefront that the BJP has two voices. Deputy prime minister Mr. L K Advani, who is now on so-called 'India Shining Yatra', has iterated

explicitly that Hindutva programme is very much an active issue. To speak the truth, his 'Yatra' aims to ignite religious bigotry to secure mileage in the 14th Lok Sabha elections. The RSS and BJP are conjoined twins. While the BJP has to fight the ensuing elections depending on its allies it cannot be very specific on Hindutva programme, and throw away its musk of secularism and fears to reveal its real face.

The BJP has created an environment where a sense of equality in public life, appetite for moral and ethical values, responsibility in social behaviour can never find footage. Scruple and humane feelings are being ignored. And rampant corruption in high offices, administrative omissions and commissions, and 'end justifies the means' policy have adversely effected the society. Consumerism recieves impetus deserting collective good.

In the arena of education, one sinister design can be traced. Education is being made just a commodity – a purchasable commodity. Private capital is intruding to earn huge and guaranteed profit. Quality factor is sub-servient to profit now. Public-funded schools, especially in the cities, are in deep crises since monetary allocation is dwindling down. The net result is only money can shape career of the budding youths and others.

There is no fundamental difference between the BJP and Congress so far as economic policies are concerned. The Congress adopted the policies of liberalisation, privatisation and globalisation injuring self-reliant policy. And the BJP has accelerated the pace of selling economic sovereignty to an unthinkable degree.

In the 14th Lok Sabha elections, we must work unitedly to ensure victory of the Left Front candidates defeating the BJP, Trinamul Congress – greated ally of the BJP and moribund Congress.

12 March, 2004

Resist Communalisation of Education

Save and Strengthen Public Education System

Call Of The Association

AMAL BANERJEE
General Secretary

Healthy social environment and economic progress widen the horizon of education. Again, education paves the way for development—both material and intellectual. But economic regress, deterioration of the value senses, social turmoil and haplessness, corruption—misappropriation of public money and misgovernance of the State narrow down the scope of education. Education flourishes when country is governed keeping idea of effecting greatest good for the greatest number of people. The objective reality is that the BJP-led NDA Govt for last six years has been working to further the interests of MNCs and privileged section of the country rejecting completely benefits of the 80% inhabitants of the country. Moreover, the BJP's Hindutva programme endeavours to erect walls of separations among the people in the name of religion, sect, caste and even language. In a word, the Sangha Parivar wants to demolish the existence of pluralism, secular democratic education system and cultural diversity.

For the above reasons the 14th Parliament elections are of supreme importance to the members of our Association. ABTA has always responded to the demand of the time and showed the path. We have a glorious past and hence, our future activities are to be shaped which is commensurate to our rich legacy. People expects much from the persons working in the field of education.

With an objective of saving the country from the onslaught of partisan forces, to save democratic education system, to silence the oppressive anti-people powers we must exert our resources to ensure the victory of the Left Front candidates in the Lok Sabha elections to protect secularism, democracy in the truest sense of the term and pluralist concept which India has always reared up. The members, as have done in past, are expected to tie up with other fraternal organisations and 12 July Committee for mouth to ear campaign exposing the real face of the BJP, TMC and Congress.

The Zonal Committees are requested to enjoin the interested members in the booth committees. Efforts are to be made for sustained house to house compaigns in the locality in favour of LF candidates. The Unit level activities are to shaped in the similar fashion.

Madhyamik Pariksha (SE) is on, and HS Exams will start soon. The Annual Exams

are to start in the gap between the two public exams. For the smooth conduct of all these exams strict vigilence is a must. Members are aware of their assigned functions and like previous years, this year also we all will do our duties sincerely.

On 24 February over five crore working people asserted to establish the determination of the right to strike against denials and repressions. Peasantry, workers, youths and women expressed their solidarity resorting to strike. Total Bandh and Bandh like situations prevailed in many states of the country. This strike bears a altogether different significance. The message of the strike is to be discussed at all levels. The Secretariat extends heartiest greetings to the members for their positive role to make a complete Bandh in West Bengal.

In the month of April membership collection drive has to undertaken. Planned initiatives are to be taken by the Unit and Zonal committees so that membership collection can be completed within the month of April. At the same time, the number of subscribers of Siksha-O-Sahitya has to be raised as much as practicable. Siksha-O-Sahitya : Teachers' Journal is the mouth piece of our endeared Association. The regular study and discussions about the materials of the journal supply us all 'talking points'.

The STFI has arranged a Press Conference at Satyapriya Bhavan on 14.3.04 at 1 p.m. This National Federation of the teachers and educational employees fight for the cause of education, distressed humanity, and works for protection of secularism. democracy and progressive concepts. The STFI has given a call to its component organisations to take active role to defeat the anti-education, anti-people forces in the coming Lok Sabha elections.

Sashimohan Bhattacharya, the senior most leader of the Association and former Editor of Siksha-O-Sahitya breathed his last on 30 January at 12.45 p.m. He secured the membership of ABTA in 1937 which was ceaselessly continued till death. This revered leader played an important role in the historic 1954 Movement of ABTA. The Association paid tribute and deep reverence to the demised leader on 28 February at Satyapriya Bhaban. His dedication, life-long struggle for the cause of education and people will continue to supply us strength and vision to carry ahead the fight for education and democracy.

Long Live ABTA

Long Live Sashimohan Bhattacharya.

12 March 2004

Play a Patriotic Role in the coming Lok Sabha Election

New Horizon of Vocational Education : Higher Secondary Level Current Scenario

Badal Bhattacharjee
Deputy Secretary (Academic)
W.B. Council of Higher Secondary Education

The last two decades has witnessed a major rural resurgence in West Bengal due to a combination of land reforms and the effective operation of democratic Panchayati raj institutions. This has radically altered the social relations and economic level of rural communities. Obviously, there has also been a spread in educational facilities in non-urban areas, with increasing numbers of boys and girls going upto the Class VIII-X stages. This is undoubtedly a positive trend, but with its pitfalls, given the realities of the present educational system.

The problem has a historical basis in the colonial era. The school educational curriculum was fashioned after the British prototype with emphasis of producing employees for manning the colonial bureaucratic system, and whatever industrial units then permitted. There was not an iota of rural realities and needs reflected in that system. The bulk of rural people were not even considered eligible for going through the schools and beyond.

Unfortunately, even after independence, the core of the old educational system — in its emphasis and attitudes - has remained entrenched.

Larger hordes of rural students have become a part of the system. Yet, this type of school education has not prepared them to face life in a country where more than three fourths of self-employment and paid-job opportunities are rural and land based. The present educational module entrenches urban values and attitudes alienating them from the village, and avocations even on their own land. They refuse to stay in the village and try to migrate to urban pastures for ever elusive better prospects. This has already initiated the retrograde process of farmers selling their land due to the indifference of their progeny.

In fact, hardly any of the colonial codes of governance, judicial, criminal, financial and administrative have been altered. The democratic Panchayats provide the only non- colonial system in force. Even that is being bureaucratized to adhere to colonial codes.

This can be pre-empted only through appropriate attitudinal and curricular changes in the school system so that the rural students understand rural priorities and prospects. Only then can the present urban-

colonial system be marginalized.

The increasingly pervasive ill effects of globalisation, structural adjustments and strangehold of the global market forces on the national economy have aggravated the situation ominously. Urban jobs are getting fewer; and the few available are highly specialized. Thus, the doors of such employment to the rural youth are now virtually closed. In effect, education (of the inappropriate type) has spread to far flung areas but the module had not prepared them to face rural needs and problems. They are not even taught to understand their local micro-system to use their local resources more effectively; and enhance sustainable productivity with all the technological developments now available.

Recently, the West Bengal Government at the highest level, has categorically declared that there are hardly any urban jobs to meet the demands, It is sel-employment, preferably as self-help groups, where future prospects lie for the majority of people. It is very clear that there has to be some affirmative action for such youth so that their school education itself prepares them for such activities. This is especially necessary for those (the predominant majority, in fact!) who shall remain deprived from entering the portals of specialized education to compete for the few jobs at the top.

EXISTING VOCATIONAL FACILITIES

Currently, there are various facilities for "vocational education" in the State. There is a network of Polytechnics and Industrial Training Institutes that provide the bulk of technicians and junior engineers who form the core support for rural infrastructure & development including irrigation, PWD, Public Health Engineering, Housing and Engineering for Panchayats.

There are two tiers, as follows :

(A) Polytechnics, at the sub-engineering level, with entry at the post-madhyamik stage. These generate Junior Engineers (previously known as overseers) and skilled technicians in various professional fields. The duration of these courses is four years. The bulk employment is at the governmental level. They have an equivalence to Group 'C' employment level, only a minor fraction is self employed.

(B) Industrial Training Institutes, below the Polytechnic level, with entry at the post Class VIII level. These courses produce skilled workers for servicing and maintenance of various types of simple equipment. The course duration is 2 years. After completion, the main employment avenue is uncertain—mainly urban and sub-urban—in private firms. Some are also self-employed with the help of institutional financing. They have an equivalence to Group 'C' employment level.

It has to be realised that the scope for government employment is fast shrinking. There is some scope for "work charged", daily basis employment devoid of any security or benefits.

There is another major problem of the products of these institutions. In most cases, the locational factor is a major impediment for entry due to economic reasons. It is usually the urban/sub-urban dwellers near such institutions who get the advantage of being trained. The bulk of the rural dwellers

are, unavoidably, deprived. This creates another major problem. Those who get trained are reluctant to work in rural communities and ill prepared to get adjusted to rural societal realities. As a result, rural needs are hardly fulfilled and the essential support system remains inoperative.

Therefore, the new module has to be located 'in situ' within the rural communities. It is not feasible that specialized polytechnics and ITIs be set up in most communities. More desirable would be to train a portion of the village boys and girls in their high schools for trade and skills, essential for their own communities. The modules have to be linked up with the high school curriculum, preferably at the Class XI-XII level. The example of the Maharashtra where courses for "Minimum Competency level of Vocational Education" (MCVE), are available at the Higher Secondary level, can be cited as a precedence.

The basic objective of the proposed high school linked module is to generate terms of competent technical hands who are ready and properly positioned within the village or panchayat to face and tackle the problems. This would lead to a major step towards self-reliance of the rural communities and also solve the problem of employment within the panchayat or lead to the formation of self-help groups for self-employment. This would also conform to the overall social realities; and fall in line with the governmental policy of "no jobs but self-employment".

In order to make this exercise effective, great care has to be taken to identify the areas of rural needs and development support. Thus would reduce dependence on external and non-conformable technical help.

The schools shall use the process of 'value addition' to train students in the high school level and may not necessarily involve the engagement of full time instructors. External instructors may be inducted, on contract, periodically. Details have to be worked out.

To start off the process, the following priority sectors, prima facie, can be identified :-

1. Irrigation

● involving various types of tubewell maintenance and repair of auxiliaries (involving masonry, carpentry, welding, etc.).

● water distribution systems (tiles, etc.).

II. Agriculture

● repair and maintenance to power tillers, improved ploughs, simple mechanical harvesting auxiliaries.

● seed technology, integrated pest management.

● techniques of organic farming (blue-green algae, vermiculture, etc.).

The agriculture related needs are multi-dimensional and may involve separate technical courses. In fact, the present KPS (Krishi Projuktee Sahaayaaks) are of Higher Secondary level. They can be recruited from those who have completed such a modular course at the plus-two level.

Computer Hardware Technician Course

Computing is now an everyday term in our language. Computers are referred to in the press, on the radio, TV, and they appear in films and books. By and large we are exhilarated at the prospect of a

computerized society. By now computers are uniquitous and for all their apparent complexity they seen to have a wide range of uses and play an ever increasing role within our society. Many of the routine activities in today's society are performed by computers. Over 80% of computing today, the applications are of a non-mathematical or non-numerical nature. Today, most of the large and medium sized companies are almost totally dependent on their computers for efficient management and administrative functions. Smaller concerns are also hereby engaged in pursuing computing for themselves. Micro-electronic technology is enabling offices to function more efficiently and the cheapness of the technology means computing is within the group of even very small businesses. Indeed, many a small concern probably owes its continued existence to improved efficiency and cost savings derived from the use of a micro-computer. The use of computers involves a considerable and continuing investment in money, time & skill. A computer system, therefore , should be both efficient and reliable. A breakdown could entail not merely wide spread inconvenience and discomfort. So such systems should have back-up facilities to ensure continuity of service. System faults need to be corrected promptly and, where possible, a system should be designed so that a fault in one piece of equipment does not necessarily mean the stoppage of the entire installation. To maintain the vast expansion of computerization wide comprehension of hardware system is very important. According to latest annual report of IT ministry (Govt. of India) during 2000-2001 computer software industry is estimated to witness a growth of 64 per cent and hardware industry a mere 9·3 per cent. This is very alarming. It will be propitious to have more number of IT workers with proficiency of hardware knowledge to provide meaningful after service to computer users. The service affordable for increasing number of computer users with internet facilities we should think of organized effort to train up large number of computer service personnels in Higher Secondary Schools in the vocational system. The NASSCOM study projects 22 lakh IT workers by 2008 will be required in India. With the introduction of Computer Science courses in Higher Secondary level for development of optimum competency in the maintenance of computer systems with a standard curriculum for 2 years study under West Bengal Higher Secondary Council. The course should be so designed to ensure on the job studies with extensive practical lessons for acquisition of working skill based on sound theoretical knowledge. This course of study will attract large number of aspirants for computer education worthwhile to develop self-confidence and entrepreneurial skill. Having undergone a standard course they will be better accepted as dependable technician and this will definitely facilitate them to have this own enterprise with financial assistance under self-employment schemes.

Inevitably the effects of the market forces have also penetrated rural areas in the form of electronic gadgetry and equipment. These

also need to be maintained and serviced. Therefore, a component of such a module is to train the students in servicing of such gadgets (expect the sophisticated e-cards, etc.)

Repair & Maintenance of domestic electrical appliances★ simple repair & servicing of non-electronic components of electronic equipment, including TV, Video players, Computers, various field instruments, etc.

Value Addition★ of primary-village products, involving food processing, cottage industries, sericulture, etc.

In fact, elements of relevant rural engineering (roads, culverts, housing, drainage, sanitary & plumbing etc.) can be introduced. This will be a valuable support for the panchayats.

CONCLUDING REMARKS

It is re-emphasized that the above list is purely illustrative. Careful thought has to be given before finalizing the modules. This should be also based on extensive discussion or survey at rural levels for need identification. It would also entail a through revision of conventional recruitment rules and listing of qualifications for teachers & instructors. Rural experience has to get precedence over academic qualifications as well.

The practical and on site (real life situations) component of the module has to be the dominant portion of the courses. Steps have to be taken for due recognition of students who have qualified with this module for employment; and incentives for self or self-help group activities.

CORRIGENDUM

In Teachers' Journal, February, 2004 in page no. 272 first column, 3rd paragraph, 4th line 'days' will be read as 'day' and in the 10th line, same paragraph, 'waits' will be read as 'wants'. This error is regretted.

Editor

Siksha-O-Sahitya

SAFFRONISATION OF EDUCATION

Bairagya Chakrabarti

Colours are very often supposed to be symbolic of variegated human feelings or states of human mind. But they sometimes represent or allegorise certain idea too. As a colour 'Saffron' is usually accepted to stand for HIndoo Communalism, since flags of BJP, the HIndutva-based political party and its various wings are saffron in colour. Hence, saffronisation of education means communalisation of education on the line of Hindutva.

All through this article the term 'Communalisation' is used in the sense of saffronisation, because in the mainstream system of our education penetration of communalism other than that of Hinduistic brand is not, as yet, so perceptible as may pose any major threat to our social fabric. Besides, communalism of majority community is more dangerous than that of minority one, since, the former, if unchecked leads inevitably to fascism.

Saffronisation of education is only part of the process of religio-cultural fascism that the Sangha Family is bent on bringing forth. It cannot, of course, escape our notice that a few Muslim organisations, too, have set up a few schools of their own wherein young learners are taught history and Social Science, the syllabi of which are framed in accordance with Islamic view-point. Books published by Delhi-based Islamic publishing houses (for example, Hakazi Haktaba Islami) are prescribed for young Muslim learners of those schools in Uttar Pradesh. The angle of vision immanent in these books is irrational, biggoted and orthodox and it many ways help the educands in developing a communal disposition. Unnecessarily do the books glorify a subject of antiquarian erudition.

It is justifiably apprehended that the burning problem of communalisation of our system of education has not yet achieved as much attention of our intelligentsia, especially of our teaching community, as it deserves in the context of our present-day national situation. The problem ought to have drawn their much earlier attention in view of the psycho-sociological dimension it has earned by the time. The vast majority of educators of our country, what to speak of the educands alone, lack the essential concern for the interest in this topical subject. Even when they dwell upon the subject, they do it in a casual manner in course of chatting with their friends and colleagues and wash their hands of with the reflection that just as the problem of communal harmony is to be tackled chiefly by the Govt. in power, the issue of communalisation of education too, is to be taken up by the top run of the administration for a solution. That education is basically a different kind of subject affecting every walk of our social life, seldom comes uppermost in their mind. Sometimes they deliberately evade the issue by comforting

themselves with the thought that if communalisation takes place at all in our system of education, it is primarily 'saffron' in colour and character—a fact that denotes the predominance of the thought-process of the majority community in the matter and hence, it is not contrary to democratic principles that rightly take into account the 'number'. Such arguments betray the communal sentiment of those persons who, evidently form a large chunk of Hindoo population. Reference to a debate telecast not long before in a private T.V. channel may be made here in passing. The subject of the debate was : Educated persons are more communal than the illiterate persons. The subdued heat of the debate was perceptible when participants with passionate zeal put forward arguments in favour of or against the subject. The debate was conducted by Rudra Prasad Sengupta, the noted theatre personality of India. The audience was asked to draw conclusion of their own from the on-going debate and to everybody's surprise it was 'discovered' that all of the members of the audience endorsed the view expressed in the topic of the debate. The root of the confusion lies elsewhere. It can be traced back to the history of our country stretching over the past couple of centuries.

Communal Harmony in pre-British Period

Religious sentiment and communalism are neither of same connotation, nor of analogous essence. An individual may owe his allegiance to a particular religious belief or a set of scriptural codes accruing therefrom. He may cherish faith in some supernatural power with the hope that he will gain certain material benefit by adopting, on individual level, some violent or nor-violent methods. All these may, generally, be signified as his religious feelings.

On the other hand, communalism draws its sustenance from collective effort to get control over pelf and power by taking resort to conglomeration of politics and religion.

An atmosphere of communal amity more or less prevailed on our country during the pre-British period of a few centuries. That does not necessarily mean that no communal violence did ever occur in that period when the Sultans and the Mughal Emperors were in power. The occurance of communal riot between two major religious communities of our land—the Hindoos and the Muslims—was, so to so, very few and far between and that too, of a character of natural calamity, in the sense that just as a natural calamity occurs all of a sudden and dies down in course of time with no harmful effect percolating on the psyche of the affected people for long, the violent clash between two religious communities that followed a conflict or feud ralating more often than not to the question of possessing of a plot of land or so, subsided in course of time leaving no permanent pernicious impression on the psyche of the two communities. Apart from that, the system of the then feudal hierarchy left no scope for the people at large to gain some economic or political benefit by uniting themselves on communal line as we find to day in the democratic set-up of ours where adult franchise plays a vital role in providing

for a massive electoral support for a communal cause. The king, the Sultan or the Emperor had the ultimate say in all matters concerning the state policy or the welfare of the subjects. A subject was a subject in all possible senses.

Communal harmony was not absent when Bengal was first brought under Muslim rule by Iktiyaruddin Muhammad-bin-Baktiyar Khilji in the beginning of the 13th century A.D. Bengal remained under Muslim rule till the English East India Company cemented its authority in the second half of the 18th century. It cannot be denied that in the period immediately following the establishment of Muslim rule, the momentum of the spread of Islam was acclerated and that in many cases forcible conversion took place. But conversion of Hindoos to Islam could not have been possible only by force. Some political, social, economic and religious factors, too, played important role in this regard. The activities of the Sufi saints who were mostly revered at par with the mystic Hindoo sages vowing to the ultimate wisdom of the Upanisadik aphorism of 'Thou art that' (Tattamasi) — facilitated the process of proselytization of the Hindoos to Islam. The Sufis with their broad human sympathy and ascetic way of life made a great impact on the mind of the downtrodden Hindoos. Besides this, the cultural assimilation of two distinct standpoints upheld by the two religions that stand in marked contrast to each other, brought about sustained communal harmony to a fair measure in this period. To be true to history, the fundamental concept of Islam was changed in the context of Bengal due to Hindu influence in the period under review; the Muslim theory of creation then prevalent in the spiritual atmosphere of Bengal was an admixture of Hindu theory. Saiyad Sultan, a Muslim poet of this period writes :

> "God emerged out of nothing; out of divine emanation, came into being the sun, the moon, heaven and hell. It was followed by the creation of earth, air, water and fire. At last Adam was created and sent to earth." [quoted in the provinces of Bihar and Bengal under Saha Jahan/Khondkar Mahabubul Karim]

Alaol, the poet and inhabitant of Faridpur district (now in Bangladesh), wrote verses based on the anecdotes of the Ramayan, His best work is Padmavat which was written in 1651 at the request of Magan Thakur, a Minister of the Arakan Raj. Rup and Sanatan were the two competent brothers upon whose administrative proficency did Hussain Shah depend most. Many of us perhaps are not aware of the fact that it was Hussain Shah the last Sultan of Bengal who made special security arrangement for Sri Chaitanya and his followers when they undertook strenuous journey on foot for Puri. Sri Chaitanya did not only welcome to his religious fold downtrodden people belonging to lower rung of the Hindoo social order, but also embraced the Muslims on equal terms. The Muslim peasants were invited to the Durga Puja Festival of Hindoo Zamindars and were attended with warm care. The Hindoos, on the other hand, went about from one majar of a Pir to that of another and offered devotional prayer, sang

hymns of praise to Satyapir, respected the Fakirs. The Muslim lathiplayers during the festival of Muharram exhibited their excellence in the game and got spontaneous reward from the Hindoo landlords. In some places, the Moulavi leading the procession of Muharram touched the heads of the children with a special wand when their mothers put them forward with the belief that the 'touch' would make their dear ones healthy and free from disease. The Hindoo mothers did not lag behind their Muslim counterpart in this respect. The Muslims shared the joys of the Hindoos, as Hindoos shared their sorrow in Muharram; no communal sentiment was found there.

Instances of assimilation between the Hindoos and the Muslims can be cited profusely from the Bengali literature of the period—Mangal Kavyas, Vaishnava literature and translated works. Hindoo-Muslim syncreticism was exemplified in Mosques, Darghas and Shrines too, in Bengal during pre-British period. From the Sultanate Bengal this tradition continued and is present, with some occasional interruption, still now. Had this healthy process of cultural assimilation been allowed to go on uninterrupted, history of communal amity would have been more meaningful. But this earlier process had been thwarted and distorted with a design with the commencement of the British rule. To do justice to the subject of communalisation of education in our country a glimpse of the nearpast socio-political history will naturally, be helpful—a history that remains the same factually, but is variously interpreted in accordance with different angles of vision.

Historiographers with different angles of vision

So far, four distinct view-points have been detected in the historiography of our country. The first group is represented by historians like Vincent Smith and James Mill who upheld, so to say, an imperialist view (vide his work, history of British India). Such historiographers are of opinion that India in the past had time and again been invaded by foreign army; hence, there is nothing uncommon when she is occupied by imperialist countries like Britain, France and Holland. In some way or other they want to suggest that India had always been vulnerable to alien attack; the defect lies squarely in the timid character of her people. These historiographers seek to justify, it may seem to one, the foreign invasion of India.

The second group is represented by historiographers like K.P Joysowal, R.C. Majumdar, D.R. Bhandarkar and others. They glorify the Gupta and Mourya rule and identify them with Hindoo period of Indian history. Their intention is to undermine the other regimes preceeding or following the 'glorious' Hindoo period when India, in their opinion, became a mighty prosperous land and when art and culture and architecture flourished largely—far surpassing those of other periods in excellence, a claim that is not always strengthened by facts. They are, quite amusingly, silent, too, in matter of identifying the Sak or Kushan dynasty of Indian history with some particular religious overtone. This sort of practices goes against

the very spirit and method of historiography. Theirs is the distinct Hinduistic view-point.

The third view-point is upheld by historians like Sayeed Toffael Ahmed, J. Ahmed Suleri, Md. Ali Jinnah and Altaf Hossein. They are the Islamic counterpart of the preceeding one and seeks to establish the supremacy of the Turk-Afgan-Muslim rulers. Hence, they may be called Muslim-revivalists.

The fourth group of historians represent the sub-altern view-point emphasising the idea that true history of India is the unwritten history of the aborigins, the marginalized section of the society, the neglected and the downtrodden. Sumit Sarkar, Goutam Bhadra, Saheed Amin and others belong to this group.

The basic drawback of all these view-points lies in the fact that they do not take into consideration the class-essence of the historical progress of Indian society. The scientific materialistic interpretation of history is absent in the writings of all of them. This lack of interest on their part in finding out the true class character of every period of Indian history makes their findings and observations bigotted and motivated; more often than not the motive is political in nature. To delve deep into the Indian history in the light of dilectical materialism has had its own reward; but these historians have ignored it. The result is obvious.

Early Hindoo-revivalist view-point applied in the interpretation of Indian history facilitated in course of time the emergence of an utterly baseless and distorted version of Indianhood in terms of Hindutva as we find in S.M. Golwalkar's works, namely, We are Our Nationhood Defined, A Bunch of Thoughts and We and Our Students Defined. In all these books the sole aim of the writer, a pioneer theoretician of Hindoo communal thought has been to assert that members of the minority community, especially the Muslims, will have to adjust themselves socially, culturally and religiously to the mainstream Hindoo way of life (including the dietary practices); otherwise they are to be satisfied with the status of protege second-rate citizen of the Indian Union.

Communalisation of History

Consolidation of British rule in India opened up a new vista of multifarius activities for a section of the new generation of indigenous intelligentsia. They were persons with unbridled enthusiasm and enlightenment, mostly of occidental kind and they started forming themselves into various associations to exact economic and political power from the unwilling hands of the British rulers by launching movements first in the form of supplicating appeal and afterwards through political agitation and propaganda. These activities came to be known as "national movement" although no question of demanding national freedom did ever peep into their minds till the beginning of the second quarter of twentieth century. It was the handful of strong-minded communists who for the first time in the history of mass struggle of Indian people raised the demand of full freedom and distributed relevant leaflets among the delegates of the Gaya Congress of 1921, so that they may ponder over the matter. But

the course of history was to be otherwise, in as much as freedom struggle of our country came to be, in some way or other, oriented with Hindoo revivalism, since its very inception. Is it not queer to note that only within a decade of the great Sepoy Mutiny of 1857, when the Hindoo and the Muslim Sepoys unitedly put up a heroic armed fight against the British soldiers, the patriotic public fair that started to be organised by celebrated Nabagopal Mitra under the patronage of the highly esteemed, Tagore family of Jorasanko in 1867, was called "Hindoo Mela" with the distinct overtone of a particular religious community? What was the harm to call it "Bharat Mela" an expression that could have suggested true national feeling? How could the lesson of the first independence struggle of India (as the historiographers put it) be forgotten so soon, does also puzzle many of us.

That the schism in the Indian social texture found in the form of conflict between the Hindoos and the Muslims, was primarily due to economic inequality, cannot be altogether ruled out. The challenge of western culture and civilisation thrown by the British rule in India gave birth first to a sharp reaction among the Muslims, since the Britishers snatched away power of governance from the Muslim rulers and not from the Hindoos. Nawab Wajed Ali Shah of Ayodhya, Tipu Sultan of Mysore, Nawab Sirajuddoullah of Bengal and Bahadur Shah, the defeated emperor of Delhi are all glaring instances to this. The Muslim nobles and members of Muslim Aristocrat families who were the beneficieries of prolonged Muslim rule lost their prestigious jobs in the initial phase of British rule. During the Viceregal rule of Lord Cornewallis the power of distribution of land and of exacting rent from the peasants was mostly transferred to the Hindoo Zamindars through the Permanent Settlement Act of 1793. Even since the reign of Murshid Kuli Khan, the Hindoo officers had been holding important position in State Revenue Department and exerted great social influence even when the Britishers came. The post of Kaji, the sole administrator of a particular geographical region was abolished soon and mainly the Muslims lost their erstwhile dominating position. Besides, English, instead of Persian, was introduced in the law-courts in 1837. As a result, the job of vokil, too, slipped out of Muslim hands. The status of a Muslim as a corroborator of the ruling class, thus, was relegated to that of an ordinary member of a defeated community. The situation, as such, was tense enough to create a feeling of hatred and disbelief, bordering almost on paranoia, in the psyche of the Muslim community against the Hindoos, in as much as, it was the young people belonging to Hindoo middle class tradesmen's family that came forward to receive English education with passionate zeal and in due course of time started entering service in schools, Govt. offices, law-courts and in businees houses. The Muslims on the other hand, detached themselves from the run of events and licked the wounds inflicted by faded glory.

In the later half of the 19th century two large provinces of India, namely, Bengal and

Uttar Pradesh (then Northern Province) witnessed among their people a queer communal discord arising out of nearly the same socio-economic situation, but based on different equation. Available statistical records show that in Uttar Pradesh, in 1886-87 the Muslims formed only 14% of the total population but they owned 45% of total arable land and 45.1% of total employment facility. The Zamindars in Uttar Pradesh were mostly Muslims while the peasants smarting under their subjugation were mainly Hindoos. The table turned with the strengthening of the British rule when the Hindoos welcomed heartily the western education and the Muslims, as a rule, turned their face from it. Various categories of posts lying vacant in Govt. offices and in business houses were soon filled up by the Hindoo employees and quite expectedly they occupied key social position too.

In Bengal, on the other hand, most of the Zamindars and big land-lords were Hindoos, but the largest chunk of peasantry was formed by the Muslims. Not only landed properly was owned mostly by the Hindoos, of Govt. services, too, they were the major beneficieries. Relevant documents show that in 1885 when Indian National Congress was founded, the Muslims covered 30% of the total population in cities and towns but only 6% to total employment facility was enjoyed by them.

The Muslims in the last quarter of the 19th century came to realize that they had missed the bus when they found to their dismay that the conscious educated stratum of the Hindoo community was turning out in large numbers — civil servants, physicians engineers, teachers, journalists and other white-collar job-holders. Besides, long before Maculay decided to draw attention of the Hindoo community to English education, Hindoo commercialists like Kantababu and Nabakrishna and financial stewards like Rammohan and Dwarakanath came forward to set up Hindoo college and Hindoo schools. It is queer to note that Sir Sayeed Ahmed, the stalwart academician organised and introduced English education in Higher classes in Aligarh but did not mince words in blaming it to the Hindoos for the inequality prevalent in respect of general education and employment facility. Be it educational conference, or the education commission or even in legislative assembly he accussed the Hindoos of their supposedly shrewd design behind their occupying of advanced position in the administrative machinery of the Govt. Moreover,he harped on the string of the same idea that Indian National Congress was a Hindoo political outfit and as such its demand of democratic electoral method will be a deterent to the interest of the Muslims.

Such feelings of distrust and acrimony operating along the communal line were fanned by some incidents that took place almost about the same time as Lord Curzon's attempt to dissect Bengal in the year 1905. While visiting Dacca in 1904. Curzon in one of his speeches remarked to the effect that something should be done to dampen the patriotic enthusiasm of the Hindoo intelligentsia of Bengal so that the Muslims are not deprived. The inception of

the "Divide and Rule" policy adopted by the British Govt. in India can be traced back perhaps to this observation made by Lord Curzon. In the previous year, i.e. in 1903 a delegation of 35 Muslim members under the conductorship of Aga Khan, the religious leader of the Muslim World called on Lord Minto, the then Viceroy of India and submitted a memorandum containing a charter of political and economic demand for the upliftment of the condition of the Muslims in India. It is reasonably believed that the delegation was encouraged by Sir Sayeed Ahmed and Sayeed Amir Ali, the renowned Judge and Islamic Scholar who for the first time came to the realization that it is high time that the Muslims entered the world of Western education. Although they were posteriors to Rammohan, they did not have that much clear perception of the contemporary social scenario as Rammohan had and as such they were strongly in favour of retaining Arabic and Persian in the new curriculum; Rammohan unhesitatingly disapproved of the idea of emphasizing on the study of Sanskrit.

In 1903 Md. Ali Jinnah, the foremost would-be leader of Muslim League and advocate of "two nation theory" and Md. Iqbal, the celebrated Urdu poet did not accompany the delegation led by Aga Khan. But in 1906 they were with another delegation led by Md. Salimullah, the Nawab of Dacca. The delegation met Lord Morley and left no stones unturned to convince him that the influence of the Indian National Congress, a political organisation of the Hindoos must be minimised, that even if social friendship with them might be maintained, there was no question of showing friendly disposition on political plane. The formation of Indian Muslim League was officially complete and ceremoniously announced in that year and Lord Morley, too, presented the bill of Administrative Reform for India in British Parliament in the same year.

A discreet analysis of social upheavals taking place across the country over the last two decades of 19th century pointed to what may be called Hindoo revivalism engulfing the whole of the social fabric. Two distinct lines of the Hindoo revivalist movement ostensibly surfaced themselves in course of time. In 1880-90 emerged Arya Samaj, founded and patronised by Dayananda Saraswati. It was an orthodox Hindoo revivalist movement and it openly propagated hatred and violence against the non-Hindoos, particularly the Muslims and the Christians. The other form of Hindoo revivalism found its expression in Ramkrishna Mission Organisation that did not, of course, nurture any ill-feeling towards the non-Hindoos; instead, the inmates engaged themselves mainly in welfare activities, such as, setting up of institutions, preaching cultural amity, reconstructing the village, uplifting the living condition of the rural-folk etc. all oriented by the Vadantic thought as manifested in the spiritual notion of Karma Yaga. Hindoo revivalism of the second type was also discemed in the literary works of Bankim Chandra, the first successful celebrity who excelled in western education. His philosophical idea of "Perfection" as explained and exemplified in the theory of

Krishna (Krishna-tattwa) and his Anandamath, the novel of patriotism, speak volume of Hindoo revivalism in bold outline. Theirs too, are the Hindoo revivalism of militant character, but devoid of hatred and animosity towards others. In many of his writings Bankim Chandra talked of taking resort to aggressive principles like a bull instead of following the meek and canine way of imploring. Likewise, Vivekananda's stimulating speeches delivered in his mellifluous voice that lent an extra iota of charm to his lionine personality and his inspining writings had upon the youth of Bengal a powerful impact which was out of proportion to his work. The words he left for them (Arise, awake and stop not till the goal is reached) had a militant patriotic ferver and within a few years of his death in 1902 concerted efforts were made to wrest freedom by violence. This was not unnatural, since, colonial exploitation increased in such a measure towards the last quarter of the 19th century that with a view to making religion, an ideology of protest it had to be militant.

However, endeavour to form officially a Hindoo political organisation got momentum due to some socio-political events that took place after the sudden demise of Dayananda Saraswati in 1883. The two groups, always at feud with each other inside the Samaj took no time to fall out over the ownership of the vast property of Arya Samaj and the more militant of the two formed themselves into an organisation in 1906; it was named Hindoo Sabha which was renamed All India Hindoo Mahasabha in 1915.

The emergence of R.S.S in Maharastra after World War-I has got much consequential connection in the way of counter-action to the Peasant Movement launched under the leadership of Bal Gangadhar Tilak.The farmers refused to pay rent of their land and the boycot continued for a long period of time. Tilak was imprisoned and breathed his last behind the bar in 1920. The movement turned turbulent. Gandhiji came back from South Africa and took the rein of non-Cooperation Movement in his own hand in 1921. The arrival of Prince of Wales prompted the two movements that the Khilafat and non Co-operation join hands with each other, although the former had a communal overtone—since its aim was to reinstate the dethroned Caliph in Turkish land. The police atrocities came down upon the people in a sharper way.The British rulers felt the necessity of resisting the indigenous movement with indigenous muscle-men and the landlords had the obligation of putting down the peasant rebels in a high-handed manner with the help of hired goons. The goons belonged to Hindoo revivalist groups like, Hindoo Sayam Sevak Samiti and Hindoo Sanrakhsan Samiti. In order to serve two different purposes of the two oppressor classes a group of five persons with V.D Savarkar as their theoretician leader met together in Kanpur in 1925 and formed an organisation incorporating the two Samitis, mentioned above and named it Rastriya Sayam Sevak Sangha. Quite cunningly did R.S.S. call itself a cultural organisation, the main objective of which was fraudulently professed to be propagation of supremacy

of Indian culture with special emphasis on body-building and training in certain self-protective skills that would help the Hindoos in time of danger. Its design was to attack the Muslims if and when necessary and to sabotage the Freedom Movement of the country. This is evident from the fact that when Lala Lajpat Roy and Jawharlal Nehru were physically assulted by the British police in 1928, while a leading protest march against Simon Commission. R.S.S declared that it would not participate in the struggle for independence. Officially and in a formal manner R.S.S announced its birth in 1926 and its foremost ideologue S.S.Golwalkar in the book "We and Our Nationhood Defined", first published in 1938, explained the concept of 'cultural nationalism' which was overcharged with Hindoo communal thought. The followers of R.S.S, of course, were conversant with the idea of cultural nationalism long since. It was published and propagated with a highly suseptible view to drawing to their fold the large mass of unemployed young men who were product of despair arising out of deplorable socio-economic condition of the country. Their aim, too, was to expand the scope of their poitical power. In the month of March 1931, B.S. Munje, one of the five founder members of R.S.S went to Italy and visited several fascist institutions, such as, Academy of Physical Education, Military College, Central Military School of Physical Education and a few others and finally availed himself of the opportunity of calling on Mussolini, the Dictator. Mr. Munje stayed in Italy for eleven days (from March 15 to March 25) and learnt as a devoted student from the fascist cultural outfits, art and technique of infusing a particular brand of thought into the young heads.

Bharatiya Janata Party, the successor of Jana Sangha, well-known for its bigotted idea of Hindutva is the political, wing of R.S.S. Its ultimate aim is to set up a Hindoo Rashtra and the opportunity it has got by way of being the leading partner of the N.D.A. Govt. at the Centre at present, is utilised to the extent possible, to spread a network a saffronisation over all that comes under the purview of culture and education. Following the footsteps of fascist rulers of the world, all-pervading efforts are being made by them to translate the highly esteemed centres of education, research, culture and history (viz. NCERT, ICHR. ICSSR etc.) as factories for washing the brains of the educands. The young learners are, according to them, future pillars of a Hindu state the objective ideological foundation of a theocratic one. With this aim in view the think-tank of R.S.S. chalked out a relevant programme for the first time in 1942 to reorient the syllabi of History meant for the young learners. in pursuance of their communal train of thought as mooted in the book, A bunch of thoughts written by S.S. Golwalkar. It is not for nothing that their first pick among all other subjects was History. They were astute enough to realize that history covers the entire period of time beginning with the inception of civilization and against this backdrop present day happenings be it political, social or cultural — are set. Hence, distortion of history itself, in conformity with their idea of Hindutva

would serve their purpose best as the young learners would inadvertently and effortlessly cultivate that sort of feelings from their readiing of distorted history, as they expect from the latter.

The members of the BJP think-tank know well that our history is replete in every epoch with numerous events and incidents of communal harmony and cultural amity. As long as these two quint-essental features of our traditional history remain undistorted and untarnished, their aims and objectives would remain unfulfilled.

(to be contd.)

S. T. F. I.

SCHOOL TEACHERS' FEDERATION OF INDIA

★ RESIST COMMUNALISATION OF EDUCATION.
★ SAVE AND STRENGTHEN PUBLIC EDUCATION SYSTEM.
★ PLAY A PATRIOTIC ROLE IN THE COMING LOK SABHA ELECTION

RESIST THE PRO-IMPERIALIST, COMMUNAL FORCES AND RELI-GIONS BIGOTS : SAVE DEMOCRACY, SECULARISM AND PUBLIC EDUCATION SYSTEM—TO SAVE NATION

Play a Patriotic Role in the Coming Loksabha Election

The arena of Education, all over the country, is exposed to deep crises on all facet. The Central Government has destroyed the Welfare Character of the State. But prosperity of the country depends on Education. And Education is the first victim. Infiltration of commercial attitude, withdrawal of subsidy on Education resulting in attack on Common School System. Communalisation of system and curriculum have evil effects on our long admired secular democratic education system. Hence, we appeal to the teaching community to defeat the anti-education, anti-



populance and communal forces in the coming Parliamentary Elections for the cause of democratic and programme in education system and for the sake of nation.

Coming to power first in 1998. Central Government has caused immense harm to the working class and common people. It is crystal clear that continuance of the BJP rule will be extremely harmful for the country, since it has very much surrendering attitude to the US-led economic imperialism. The NDA coalition is carrying forward anti-education and anti-people policies. The RSS agenda have been encouraged to panetrate in all the institutions of the State and our Society. In a systematic manner the communal ideology of the RSS-Sangha Paribar is infiltrating, destroying the Secular Character of the State. This force must be defeated in the ensuing Parliament elections. We have to defeat the communal forces and its allies to save the contry, our nation and its democratic and secular perspective.

During last six year's rule the Sangha Paribar with the help of NDA Government has damaged our democratic set up of public education system. The democratic common school system is under perpetual attack. The secular component of syllabus has been attacked. The policy of Commercialisation of education has encouraged the private sector to invade the arena of learning and knowledge. Now, education is viewed simply as a commodity, and as a natural sequel, quality factor has been pushed to the back seat.

The foreign accredited school and colleges are allowed to set up educational activities. The main object of these institutions is profit, only profit. They have syllabus and curriculum of their choice. Our 'Nation' has got no control over these institutions. Since the BJP-led NDA Government has allowed the import of education the State Governments are incapable to control these academic bodies. But the proper National Education Policy is pre-requisite for building up the Nation. And if this type of education moves ahead national integrity finds no firm plinth.

Foreign affiliated academic institutions will injure national sense of integration and building up of good future citizens of our nation is sure to receive a severe blow.

'Pay and buy education'—this policy is finding grounds in our country. Now career is not open to talent, career is open only to money. Education can ever be a purchasable commodity! Even the education institutions of the West are establishing schools and colleges of inferior quality. There is no quality assurance in these institutions.

In order to avoid financial burden the BJP-led NDA Government is speaking in favour of open schooling and distant education systems making a propaganda that formal education is dead one, open and distant education is the future. But who can deny the fact that a learner can never secure education of quality and develop a personality without teachers. In recent past, the student of France declared that "Without teacher no future". True, open schools and distant education system can help and support formal system. This can also award some benefits to the disadvantage sections when Government is unable to grant sufficient money to formal system of education.

The BJP is trying ceaselessly to supply communal inputs in the syllabus and curriculum. Such endeavour will train up young minds with obsolete ideas. This type of education makes one highly narrow and sectarian. The Government spends less than one percent in school education, but UGC is generous to sanction money for the study of astrology and priest-hood in University. This will belittle the dignity of our Universities.

History and language shape the mind of the students to a great extent. Our national history is being distorted. Myths and beliefs are claimed as history. Obscurantist ideas are finding berth in both language and history.Scientific and rational ideas are being grossly neglected. Faith is replacing science. The reason is to build up youths who will submit to unforeseen factors which invite faith in destiny.

RSS-controlled Bidya Bharati is runing almost

14 thousand institutions accross the country. These schools run with high dose of communal idealogy. Hindutva finds strong place in the syllabus and curriculum. The students are reared with the sentiment that people belonging to other faiths are inferior to the Hindus. The broad and general approach of Hindu religion is also attacked in this manner.

Communal education brings forth communal hatred and intolerance. Communalisation of education is highly deterimental for a plural country like ours. Religious amity plus tolerance is our proud possession. But the BJP-RSS wants sectarian education only. Such education creates spineless, docile youths who do not care for broad thinkings. These forces are actually saying that Muslim, Christian, Buddhist, SCST-Hindu etc. are second class citizens of our country.

In order to communalise our education system RSS-loyalists but academic dwarfs are installed in the premier academic institutions like NCERT, ICHR. National Institution for Social Science etc. These institutions once were famous abroad even for a academic activities. In the name of research, these institutions are prescribing communal ideas.

The NDA Government's economic policies are determined by the prescriptions of the economic imperialism. The economic policies have showered benefits and prosparity to almost 20% of the people only. The rests are put to distress and sufferings. The poors are becoming more poor while the rich section is amassing heaps of money. More than 80% people are exposed to all-round attack on their livelihood,jobs, increasing cost of food and other essential daily necessities, education an health. The multinational companies, big business and international finance are taking full adventage from the Central Government, while the plight of the workers, peasants, agricultural workers, artisans and middle class has deteriorated to the lowest level. The foreign policy of the Government aims to serve the purpose of interests of the USA and its greatest ally, UK.

Our constitution endores the concept of Welfare State. A Welfare State owns some responsibility which the present Government refuses to accept. Subsidies on 14 essential items have almost been withdrawn at the dictate of WTO, IMF and World Bank. But now the BJP just before the Parliament Elections has raised the slogan of 'Bharat Udai', 'Feel Good'. This is being done to arouse illusions among the people.

The teaching community should take a vow to defeat the BJP and its allies. And it must be kept in mind that the continuance of BJP-led rule is sure to bring further damage to the people. Hence, the BJP must be defeated to save the country.

We, all the components of STFI, must work whole heartedly in favour of secular, democratic forces across the country. The people respect the teaching community, and the teachers always show the path in all ages, Teachers rise in revolt. We the teachers and staff of the schools of our conntry, will play a patriotic role in the ensuing Loksabha Election.

Let us ensure the defeat of this anti-education forces and its allies, and we must actively work for building up a Secular Democratic Government in the truest sense of the term.

UNITE AND FIGHT FOR EDUCATION AND NATION.

LONG LIVE S.T.F.I.

Published by Tushar Panchanan, General Secretary, STFI on basis of decision taken by E.C. meeting on 15th January, 2004.

STATE PROJECT OFFICE

Paschim Banga Rajya Prarambhik Shiksha Unnayan Sanstha
Bikash Bhawan (2nd floor), Salt Lake, Kolkata-700 091
Phone : 2334 3102, 2358 1822/ Fax : 2358 5297

Memo No. 160/(20)/Ped/PBRPSUS Date : 28.02.2004

To
The District Project Officer
Bankura/Birbhum/Cooch Behar/Murshidabad/South 24 Parganas/Dakshin Dinajpur/Jalpaiguri/Malda/Purulia/Uttar Dinajpur/Burdwan/Howrah/Hooghly/Nadia/Siliguri/Darjeeling/Purba Medinipur/Paschim Medinipur/North 24 Parganas/Kolkata

Sir,

In continuation of the Memo No. 154/(20)/Ped/PBRPSUS dated 20.02.2004 you are requested to engage the additional para-teachers in the primary sections (Class-I to V) for Sr. Madrasah approved by West Bengal Board of Madrasah Education.

The appointing authority will be the managing committee of the concerned Madrasahs.

The ceiling for the number of the additional para-teachers to be engaged for the district and all other conditions of the guideline already sent to you vide this office Memo No. 154/(20)/Ped/PBRPSUS will remain unchanged.

Sincerely yours,
Sd/- Dr. D.K. Gupta
State Project Director
PBRPSUS

Memo No. 162/(20)/Ped/PBRPSUS Date : 28.02.2004

(1) P.S. to Minister-in-charge, School Education Department, Govt. of West Bengal for kind information
(2) P.S. to Minister of State, School Education Department, Govt. of West Bengal for kind information
(3) Principal Secretary to the Govt. of West Bengal, Education Department
(4) Director of School Education, Govt. of West Bengal
(5) President, W.B.B.P.E.
(6) President, W.B.B.S.E.
(7) President, W.B.B.M.E.
(8) Director, SCERT, West Bengal

Sd/- Dr. D.K. Gupta
State Project Director
PBRPSUS

Memo No. 5763 (102) Date : 09.03.2004

Copy forwarded to the Heads of all recognised Senior Madrasahs for information and necessary action with the request to contact the District Project Officer, SSA & WBDPEP of the concerned district immediately for engagement of additional para-teacher.

A copy of the Memo No. 154/(20)/Ped/PBRPSUS Dt. 20.02.2004 of the State Project Director, Paschim Banga Rajya Prarambhik Siksha Unnayan Sanstha is also sent herewith for information.

Secretary
West Bengal Board of Madrasah Education

STATE PROJECT OFFICE

Paschim Banga Rajya Prarambhik Shiksha Unnayan Sanstha
Bikash Bhawan (2nd floor), Salt Lake, Kolkata-700 091
Phone : 2334 3102, 2358 1822/ Fax : 2358 5297

Memo No. 154/(20)/Ped/PBRPSUS Date : 20.02.2004

To
The District Project Officer
Bankura/Birbhum/Cooch Behar/Murshidabad/South 24 Parganas/Dakshin Dinajpur/Jalpaiguri/Malda/Purulia/Uttar Dinajpur/Burdwan/Howrah/Hooghly/Nadia/Siliguri/Darjeeling/Purba Medinipur/Paschim Medinipur/North 24 Parganas/Kolkata

Sir,

Please find enclosed a guideline approved by the Govt. of West Bengal for engagement of additional para- teachers in primary schools.

A district-wise indicative figure for engaging additional para-teachers is also enclosed. This has been calculated as per DISE, 2002-2003. As you have to select the additional para-teachers as per the report of DISE 2003-04 this figure may undergo a slight change. However, the indicative figures may be treated as the ceiling for the number of additional para-teachers that can be engaged for operative purposes.

You have to complete to the selection procedure of additional para-teachers by the end of April. Also that their services could be utilised from the very beginning of the academic year 2004-05.

District SSA committee may think of a constitution of a sub-committee at VEC/WEC/SDC level for conducting the interviews with regard to engagement of additional para-teachers.

Kindly treat this as most urgent.

Sincerely yours,
Sd/- Dr. D.K. Gupta
State Project Director
PBRPSUS

Memo No. 154/8pPed/PBRPSUS Date : 20.02.2004

(1) P.S. to Minister-in-charge, School Education Department, Govt. of West Bengal for kind information
(2) P.S. to Minister of State, School Education Department, Govt. of West Bengal for kind information
(3) Principal Secretary to the Govt. of West Bengal, Education Department
(4) Director of School Education, Govt. of West Bengal
(5) President, W.B.B.P.E.
(6) President, W.B.B.S.E.
(7) President, W.B.B.M.E.
(8) Director, SCERT, West Bengal

Sd/- Dr. D.K. Gupta
State Project Director
PBRPSUS

GUIDELINES FOR THE ENGAGEMENT OF ADDITIONAL PARA-TEACHERS AT PRIMARY LEVEL

1. The principles of engagement at primary level : A decision was taken in the General Council meeting held on 20th January, 2004 to engage additional teachers on a contractual basis. This decision is expected to not only provide relief to the lakhs of students in primary schools (mainly in rural areas) but also improve the quality of learning by making the pupil-teacher ratio more favourable. This will be a huge exercise and a number of issues need to be sorted out such as the principle on the basis of which teachers will be allotted to schools, qualifications, appointing authority, period of contract and terms of reference of the teachers. The following item-wise guidelines may be considered :–

A.Principle of allotment of primary teachers :

(i) The position of all teachers in all schools across the districts should be frozen as on 1st February, 2004 i.e. further allotment of additional para-teachers recruited to the schools will depend on the teachers in place as on 1st February,2004.

(ii) All schools in West Bengal to be made two-teacher schools or else they will not be entitled to get any additional para-teacher. In other words one-teacher schools will not be entitled to an additional para-teacher.

(iii) A list of two teacher schools should be prepared and those with an enrolment of greater than 80 should be given one para-teacher.

(iv) The two teacher schools with pupil enrolment greater than 150 should be given two extra para-teachers.

(v) If there are posts in hand even after the above teachers have been allotted then in rural areas

an additional teacher will be engaged in a school where there are at least three teachers and PTR is greater than 55.

(vi) If there are still posts in hand even after the above teachers have been allotted then in urban areas an additional para-teacher will be engaged in a school where there are at least three teachers and PTR is greater than 60.

(vii) At least 50% teachers recruited have to be women teachers.

B. Appointing authority :

- The approving authority will be District SSA Committee and the appointing authority will be VEC/WEC/SDC. This is because the VEC/WEC/SDC is best placed to assess the schools' needs and accordingly will be most competent to appoint the required para-teacher.
- This will also be in harmony with the spirit of decentralization and community participation in the process of engagement of para-teachers.
- Teachers will be appointed on a one-year contract which will be signed between the Village Education Committee and the teacher.
- After one year, the VEC/WEC/SDC will review the situation in terms of the eligibility of the school to have a para-teacher as per the guidelines mentioned above. If the schools still qualifies for a para-teacher the earlier para-teacher may be considered for the extension of the contract.

C. Qualifications for para-teachers :

(i) Madhyamik

(ii) Age–not more than 45 years and not less than 18 years.

(iii) Should be resident of the territorial jurisdiction of VEC/WEC/SDC and if there is no qualified candidate within the area then that of neighbouring (contiguous) VEC/WEC/SDC. Even after this, if no qualified candidate is available then the applicant must be a resident of the concerned Gram Panchayat.

(iv) The candidate must show the certificate for proof of residence.

D. Engagement process :

As stated above, the para-teachers will be engaged by the VEC/WEC/SDC for primary schools. The VEC/WEC/SDC will have to follow the principles of allotment mentioned above and engage para-teachers of qualifications listed above. This engagement may be done through an interview wherein the academic achievement should be given due weightage. The VEC/WEC/SDC will forward the panel of selected teachers to the District SSA Committee. The VEC/WEC/SDC would submit the panel of candidates for approval within 10 days after they are called for by the District SSA Committee. The District SSA Committee will constitute a sub-committee to finally approve the names of teachers forwarded by the VEC/WEC/SDC. This sub-committee will ensure that the principles of engagement and allotment have been followed and the teachers recruited have the desired qualifications. The composition of this sub-committee will be as follows :–

(i) ADM In-charge of SSA & DPEP : Chairman.

(ii) Karmadakshya Shiksha Sthayee Samiti, Zilla Parishad : Member

(iii) Chairman, DPSC or his nominee : Member
(iv) DI of Schools (Primary) : Member
(v) DPO, DPEP & SSA : Convenor

This Committee will also decide how many teachers will be engaged in a particular school according to the norms.

For Kolkata the District level Committee will consist of the following four members :-

(1)	**Chairman, DPSC**	**:**	**Chairman**
(2)	**District Project Officer, SSA**	**:**	**Convenor**
(3)	**DI of Schools (Primary)**	**:**	**Member**
(4)	**Dy. Municipal Commissioner (Education), KMC**	**:**	**Member**

Proposed amendment to the Constitution of All Bengal Teachers' Association.
(As passed by the General Meeting, 1995) Draft of Annual General Meeting : 11.01.04.
(Recommended from C.C. Meeting, dated 28.12.03, Passed by the Annual General Meeting held on 11.01.2004)

1. Kolkata will replace Calcutta throughout the constitution.
2. Printing mistakes of the constitution will be corrected.

VI. MEMBERSHIP :

Page 3 of the Constitution

17 (c) Rewrite the sentence—"Any employee of ABTA may become an associate member of the Association by paying usual fees as fixed up by the Association and subscribing Teachers' Journal."

Page 4 IX. CESATION OF THE MEMBERSHIP :

20 (b)—"There shall be right to appeal in all cases of disciplinary action and the appeal shall be made to the Appeal Committee of the Association through the General Secretary of the Association. The decision of the Appeal Committee is final".

Page 5 22 (e)—"To approve a panel of three external auditors for the next financial year".

IX. TRIENNIAL CONFERENCE :

Page 5 4th paragraph

23 (d)—"To elect delegates to the conference at every stage the number of Women Teachers, Junior High School Teachers, Madrasah Teachers, Non-Teaching Staff, Retired Teaching and Non-Teaching Members shall be given category-wise proper representation".

Page 6 23 (k) "10% instead of 5%".

Page 7 23(l)—"four Sectional Conferences, one for Junior High School, one for Madrasah and Institution of equivalent status, one for Clearks and other staff of Schools and the other for Retired Teachers and employees be held as a part of Triennial Conference by the delegates of the respective categories..............."

XV. POWERS AND DUTIES OF THE CENTRAL COUNCIL :

Page 9 35(b)—"To frame rules regarding functions and consitution of the School Unit, Zonal, Sub-Divisional and District Branch Association".

XXXIV. GENERAL :

Page 17 70 (h)—"The Central Council shall pay subsidy to district, Sub-divisional and zonal committees in the following mnnar : District Branches shall receive 15% of the membership fees collected from the District, Sub-divisional branch shall receive 30% and zonal committee shall receive 40% of the total collection of the membership fees at the respective stages."

Govt. Circular

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

School Education Department
Budget Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700 091

No. 54-SE(B)/5B-30/2003 Dated,, the 17th February, 2004

From : Shri R.K.Ray, I.A.S.,
Joint Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of School Education, West Bengal,
Bikash Bhavan, Salt Lake, 7th Floor, Kolkata-700 091

Sub : Grant of Dearness Allowance to the employees of Non-Govt. Educational Institutions and other organisations with effect from 01.01.2004.

In continuation of this Department Order NO. 437-SE(B) dated 31.8.2001, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to direct that all whole-time approved teaching and non-teaching employees of recognised aided sponsored educational institutions and other organisations as listed in Annexure-I, and drawing pay in the existing State Govt. Scales of Pay will get Dearness Allowance at the following rates :-

Periods of which payable	**Pay Range Basic pay upto**	**Rate of Dearness Allowance**
01.01.2004	**Rs. 25,400/- per month**	**45% of pay**

2. The Governor is further pleased to direct that the Dearness Allowance sanctioned herein shall be drawn subject to the following conditions :-
(i) The 'Basic Pay' as mentioned above shall be frade pay drawn by the employees in their respective revised scale of pay as introduced under Memo No. 25-SE(B) dated 12.02.99 and shall not include special pay and any other categories of pay, if any, provided that in the case of employees who have not opted for revised scale of pay as per this Deptt. Memo No. 25-SE (B) dated 12.2.1999 the 'Basic Pay' shall mean the scales of pay as per this Deptt. Memo No. 33. Edn. (B) dated 7.3.1990 plus Dearness Allowance as sanctioned to the State Govt. Employees with effect from 1st October, 1996 vide Finance Department Memo No. 7756-F dated 27.8.1996.
(ii) The additional Dearness Allowance sanctioned above should be rounded off to the nearest rupees, in each case.
3. Employees of Non-Govt. Educational Institutions, Tolls, Dearness Allowance getting

schools (Pry./Jr. Basic) who get fixed pay or only Govt. Dearness Allowance will draw further Additional Dearness Allowance at the rate of Rs. 104/- (Rupees One Hundred four) only per month with effect from 01.01.2004.

4. The Governor has further been pleased to direct that the additional instalment of Dearness Allowance payable in terms of this order shall be paid in cash to all employees of the Non-Govt. Educational Institutions and other organisations irrespective of their basic pay.

5. i) A ready reckoner showing the amounts of Dearness Allowance admissible in the revised scale of pay in terms of the Memorandum is appended (Annexure-II).

ii) A ready reckoner showing the actual increase in Additional Dearness Allowance in the case of employees who have not come over to the revised scales of pay prescribed under the WBS (ROPA) Rules, 1998 has been given in Annexure-III.

6. The charge involved will be debited to the respective appropriate heads in the current years Plan/Non-Plan budget under "2202-General Education".

7. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O.No. 410 Group-'P' (Services) dated 11.2.2004.

8. All concerned are being informed.

Sd/- Illegible
Joint Secretary.

Annexure to G.O.No. 54-SE(B) dated 17.2.04.

ANNEXURE-1

1. Approved Teaching and Non-teaching staff of training institutions for Primary teachers including Govt. Sponsored Primary Teachers' Training In- stitutes (erstwhile Jr. Basic Training Institutions);
2. Approved Teaching and Non-teaching staff of aided Primary Schools and Primary Schools under the District School Board/District Primary School Council;
3. Approved Teaching and Non-teaching staff of Non-Government Aided/Sponsored Secondary Schools (Higher and Higher Secondary) but excluding D.A. getting schools;
4. Approved Teaching and Non-teaching staff of School Mother's Training Centre/ Primary Schools, Jr. Basic Schools, Pre-Basic Schools, Pre-Primary Schools;
5. Approved Teaching and Non-teaching staff of Govt. Sponsored Free-Primary Schools, Nursery Schools and Primary including Jr. Basic Schools appointed in Municipalities under the scheme of Free and Compulsory Primary Education Act, 1963;
6. Approved Teaching and Non-teaching staff of Jr. High Schools including erstwhile Senior Basic Schools;
7. Approved Teaching and Non-teaching staff of Tolls and Madrasahs (Senior, High and Jr. High);
8. Approved Whole time Ayas of recognised co-educational Schools;
9. Approved Employees of District Primary School Council/Board;
10. Approved Employees of the West Bengal Board of Primary Education.

Ready Reckoner showing the Amounts of Dearness Allowance admissible to various stages of pay in revised scales as prescribed under WBS (ROPA) Rules, 1998 in terms of SE-Department Memo No. 54-SE(B) dated 17.2.2004

Basic pay as per revised scale, 1998 (1) Rs.	Total D.A admissible w.e.f. 01.01.2004 (2) Rs.	Basic pay as per revised scale, 1998 (1) Rs.	Total D.A admissible w.e.f. 01.01.2004 (2) Rs.	Basic pay as per revised scale, 1998 (1) Rs.	Basic pay as per revised scale, 1998 (2) Rs.
2600	1170	3345	1505	3800	1710
2655	1195	3350	1508	3840	1728
2700	1215	3375	1519	3850	1733
2710	1220	3380	1521	3865	1739
2760	1242	3390	1526	3900	1755
2765	1244	3405	1532	3910	1760
2820	1269	3440	1548	3915	1762
2850	1283	3445	1550	3930	1769
2875	1294	3450	1553	3935	1771
2880	1296	3465	1559	3980	1791
2915	1312	3480	1566	4000	1800
2930	1319	3510	1580	4005	1802
2940	1323	3515	1582	4010	1805
2980	1341	3525	1586	4020	1809
2985	1343	3530	1589	4045	1820
3000	1350	3570	1607	4050	1823
3045	1370	3575	1609	4080	1836
3060	1377	3585	1613	4090	1841
3075	1384	3590	1616	4100	1845
3105	1397	3600	1620	4110	1850
3110	1400	3610	1625	4120	1854
3120	1404	3620	1629	4125	1856
3150	1418	3640	1638	4155	1870
3165	1424	3655	1645	4170	1877
3175	1429	3660	1647	4175	1879
3185	1433	3690	1661	4190	1886
3225	1451	3700	1665	4200	1890
3230	1454	3705	1667	4225	1901
3240	1458	3710	1670	4230	1904
3250	1463	3720	1674	4240	1908
3285	1478	3725	1676	4250	1913
3300	1485	3750	1688	4260	1917
3305	1487	3770	1697	4290	1931
3310	1490	3785	1703	4300	1935
3315	1492	3795	1708	4305	1937

(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
4325	1946	4975	2239	5800	2610
4330	1949	4980	2241	5825	2621
4350	1958	5000	2250	5850	2633
4370	1967	5025	2261	5880	2646
4375	1969	5050	2273	5900	2655
4480	1971	5055	2275	5925	2666
4100	1980	5075	2284	5950	2678
4420	1989	5080	2286	5975	2689
4435	1996	5100	2295	5980	2691
4450	2003	5130	2309	6000	2700
4455	2005	5140	2313	6050	2723
4470	2012	5150	2318	6075	2734
4475	2014	5175	2329	6080	2736
4480	2016	5180	2331	6100	2745
4500	2025	5200	2340	6125	2756
4510	2030	5230	2354	6150	2768
4520	2034	5250	2363	6175	2779
4530	2039	5275	2374	6180	2781
4540	2043	5280	2376	6200	2790
4550	2048	5300	2385	6225	2801
4565	2054	5320	2394	6250	2813
4575	2059	5325	2396	6275	2824
4580	2061	5350	2408	6280	2826
4600	2070	5380	2421	6300	2835
4605	2072	5400	2430	6325	2846
4610	2075	5410	2435	6350	2858
4650	2093	5425	2441	6375	2869
4680	2106	5450	2453	6450	2903
4690	2111	5475	2464	6475	2914
4700	2115	5480	2466	6500	2925
4725	2126	5500	2475	6525	2936
4750	2138	5525	2486	6550	2948
4755	2140	5575	2509	6575	2959
4780	2151	5580	2511	6600	2970
4800	2160	5590	2516	6625	2981
4820	2169	5600	2520	6650	2993
4825	2171	5625	2531	6675	3004
4830	2174	5650	2543	6700	3015
4850	2183	5675	2554	6725	3026
4870	2192	5680	2556	6750	3038
4875	2194	5700	2565	6800	3060
4880	2196	5750	2588	6825	3071
4905	2207	5770	2597	6875	3094
4950	2228	5775	2599	6900	3105
4960	2232	5780	2601	6925	3116

(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.
6950	3128	8400	3780	10025	4511
6975	3139	8450	3803	10050	4523
7000	3150	8475	3814	10075	4534
7050	3173	8525	3836	10150	4568
7075	3184	8550	3848	10175	4579
7100	3195	8575	3859	10200	4590
7125	3206	8600	3870	10275	4624
7150	3218	8650	3893	10300	4635
7175	3229	8675	3904	10325	4646
7200	3240	8750	3938	10350	4658
7250	3263	8775	3949	10375	4669
7325	3296	8800	3960	10400	4680
7350	3308	8825	3971	10425	4691
7400	3330	8850	3983	10475	4714
7425	3342	8925	4016	10525	4736
7450	3353	8950	4028	10575	4759
7500	3375	9025	4061	10600	4770
7525	3386	9050	4073	10625	4781
7550	3398	9075	4084	10650	4793
7575	3409	9100	4095	10675	4804
7600	3420	9150	4118	10750	4838
7625	3431	9175	4129	10775	4849
7650	3443	9250	4163	10825	4871
7725	3476	9275	4174	10850	4883
7750	3488	9300	4185	10900	4905
7775	3499	9325	4196	10925	4916
7800	3510	9375	4219	10975	4939
7850	3533	9425	4241	11025	4961
7875	3544	9450	4253	11050	4973
7925	3566	9475	4264	11075	4984
7950	3578	9500	4275	11175	5029
8000	3600	9525	4286	11200	5040
8050	3623	9550	4298	11275	5074
8075	3634	9575	4309	11300	5085
8100	3645	9650	4343	11325	5096
8125	3656	9675	4354	11425	5141
8150	3668	9700	4365	11450	5153
8200	3690	9725	4376	11500	5175
8225	3701	9775	4399	11525	5186
8250	3713	9800	4410	11575	5209
8275	3724	9825	4421	11635	5236
8300	3735	9850	4433	11675	5254
8325	3746	9925	4466	11725	5276
8350	3758	9950	4478	11775	5299
8375	3769	10000	4500	11800	5310

(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.
11825	5321	14200	6390	17150	7718
11850	5333	14225	6401	17250	7763
11925	5366	14250	6413	17300	7785
11950	5378	14300	6435	17375	7819
12000	5400	14325	6446	17450	7853
12025	5411	14375	6469	17475	7864
12075	5434	14500	6525	17500	7875
12100	5445	14550	6548	17625	7931
12125	5456	14600	6570	17750	7988
12175	5479	14625	6581	17900	8055
12275	5524	14700	6615	18000	8100
12325	5546	14750	6638	18125	8156
12375	5569	14800	6660	18200	8190
12400	5580	14875	6694	18300	8235
12425	5591	15000	6750	18350	8258
12500	5625	15100	6795	18375	8269
12525	5636	15125	6806	18400	8280
12550	5648	15150	6818	18500	8325
12575	5659	15200	6840	18650	8393
12600	5670	15375	6919	18700	8415
12675	5704	15450	6953	18750	8438
12700	5715	15500	6975	18800	8460
12750	5738	15525	6986	18875	8494
12775	5749	15650	7043	18900	8505
12825	5771	15750	7088	19100	8595
12875	5794	15800	7110	19125	8606
12925	5816	15850	7133	19250	8663
12950	5828	15875	7144	19400	8730
13000	5850	15900	7155	19500	8775
13100	5895	16100	7245	19550	8798
13125	5906	16125	7256	19625	8831
13225	5951	16150	7268	19700	8865
13250	5963	16175	7279	19875	8944
13300	5985	16250	7313	19900	8955
13375	6019	16300	7335	20000	9000
13500	6075	16400	7380	20150	9068
13575	6109	16500	7425	20250	9113
13600	6120	16550	7448	20300	9135
13625	6131	16625	7481	20375	9169
13650	6143	16700	7515	20400	9180
13775	6199	16825	7571	20450	9203
13875	6244	16850	7583	20600	9270
13900	6255	16875	7594	20700	9315
14000	6300	17000	7650	20750	9338
14050	6323	17100	7695	20900	9405

(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.
21050	9473	22400	10080	23900	10755
21350	9608	22700	10215	24200	10890
21400	9630	22850	10283	24400	10980
21500	9675	22900	10305	24650	11093
21800	9810	23300	10485	24900	11205
21900	9855	23400	10530	25100	11295
21950	9878	23750	10688	25400	11430
22250	10013				

(ANNEXURE-II)

Ready Reckoner showing the actual increase in Additional Dearness Allowance, admissible with effect from 1st January, 2004 at various stages of pay in the case of employees who have not come over the revised scales of pay prescribed under WBS (ROPA) Rules, 1998 in terms of School Education Department Memo No. 54-SE (B) dt. 17.2.04

Basic Pay as per revised pay'90 (1) Rs.	Actual ADA w.e.f. 1.1.2004 (2) Rs.	Basic Pay as per revised pay'90 (1) Rs.	Actual ADA w.e.f. 1.1.2004 (2) Rs.	Basic Pay as per revised pay'90 (1) Rs.	Actual ADA w.e.f. 1.1.2004 (2) Rs.
800	79	974	97	1080	107
825	81	980	97	1082	107
830	82	983	98	1085	108
845	84	992	98	1090	108
860	85	1001	99	1092	108
875	87	1004	100	1097	109
890	88	1005	100	1100	109
893	89	1010	100	1105	110
905	90	1013	100	1106	110
908	90	1022	101	1115	111
911	90	1025	102	1117	111
920	91	1028	102	1118	111
926	92	1030	102	1127	112
929	92	1034	103	1130	112
938	93	1040	103	1139	113
941	93	1046	104	1140	113
944	94	1055	105	1142	113
950	94	1064	106	1155	115
958	95	1065	106	1160	115
962	95	1067	106	1165	116
971	96	1076	107	1167	116

(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.
1169	116	1362	135	1585	157
1170	116	1365	135	1590	158
1180	117	1375	136	1605	159
1181	117	1380	137	1610	160
1185	118	1382	137	1615	160
1190	118	1385	137	1617	160
1192	118	1390	138	1620	161
1200	119	1392	138	1625	161
1202	119	1395	138	1630	162
1205	120	1400	139	1640	163
1210	120	1407	140	1652	164
1211	120	1410	140	1660	165
1215	121	1420	141	1665	165
1217	121	1422	141	1670	166
1223	121	1425	141	1675	166
1230	122	1432	142	1680	167
1232	122	1435	142	1685	167
1235	123	1440	143	1687	167
1242	123	1445	143	1690	168
1244	123	1452	144	1705	169
1245	124	1455	144	1710	170
1257	125	1460	145	1715	170
1260	125	1465	145	1720	171
1265	125	1470	146	1722	171
1270	126	1475	146	1725	171
1272	126	1480	147	1730	172
1275	126	1482	147	1740	173
1282	127	1485	147	1755	174
1285	127	1500	149	1760	175
1286	128	1505	149	1770	176
1290	128	1510	150	1780	177
1295	128	1512	150	1785	177
1302	129	1515	150	1795	178
1305	129	1520	151	1810	180
1307	130	1525	151	1820	181
1310	130	1535	152	1830	182
1320	131	1540	153	1835	182
1328	132	1545	153	1845	183
1330	132	1547	153	1850	184
1332	132	1550	154	1860	185
1335	132	1555	154	1870	186
1340	133	1560	155	1875	186
1350	134	1570	156	1880	186
1357	135	1580	157	1885	187
1360	135	1582	157	1890	187

(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.
1900	188	2300	228	2820	280
1905	189	2305	229	2830	281
1910	189	2310	229	2835	281
1915	190	2315	230	2840	282
1920	190	2330	231	2850	283
1925	191	2335	232	2890	287
1930	191	2360	234	2895	287
1945	193	2370	235	2905	288
1950	193	2380	236	2920	290
1960	194	2395	238	2930	291
1965	195	2410	239	2970	295
1970	195	2415	240	2975	295
1975	196	2420	240	2980	296
1980	196	2440	242	3000	298
1990	197	2445	243	3010	299
2000	198	2450	243	3045	302
2010	199	2455	244	3050	303
2015	200	2460	244	3055	303
2020	200	2480	246	3080	306
2030	201	2490	247	3090	307
2040	202	2495	248	3100	308
2045	203	2520	250	3120	310
2055	204	2530	251	3130	310
2060	204	2535	251	3135	311
2070	205	2540	252	3170	314
2080	206	2570	255	3180	315
2095	208	2575	255	3195	317
2110	209	2595	257	3200	317
2120	210	2600	258	3205	318
2130	211	2605	258	3210	318
2135	212	2610	259	3235	320
2145	213	2650	263	3270	324
2160	214	2655	263	3280	325
2175	216	2670	265	3300	327
2180	216	2680	266	3310	328
2185	217	2685	266	3325	330
2200	218	2690	267	3335	331
2210	219	2730	271	3355	333
2240	222	2735	271	3370	334
2250	223	2745	272	3380	335
2255	224	2755	273	3400	337
2260	224	2760	274	3410	338
2265	224	2770	275	3425	341
2280	225	2810	279	3450	342
2290	227	2815	279	3470	344

(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.	(1) Rs.	(2) Rs.
3480	345	4050	369	5000	422
3500	347	4075	370	5100	430
3535	349	4125	372	5225	433
3570	350	4200	375	5250	443
3575	350	4250	377	5400	456
3580	350	4325	380	5550	468
3600	351	4375	382	5700	481
3625	352	4450	385	5850	494
3635	353	4500	387	5900	498
3680	354	4575	390	6000	506
3700	355	4625	392	6100	510
3750	357	4650	393	6150	512
3780	358	4700	397	6300	518
3800	359	4750	401	6500	526
3825	360	4800	405	6700	534
3875	362	4825	407	6900	542
3900	363	4875	411	7100	557
3950	365	4950	418	7300	572
4000	367				

Sd/- Illegible
Deputy Secretary to the
Government of West Bengal
Finance Department

Govt. Circular

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Finance Department
Audit Branch

No. 638-(100)-F — Kolkata, the 19th January, 2004

From : Shri Sajal Bandyopadhyay
Joint Secretary,
Finance Department

To : The Principal Secretary/Secretary
....
....

Subject : Grant of Dearness Allowance/Addl. Dearness Allowance to the Teaching & Non-Teaching staff of Non-Govt./ Sponsored/aided Educational Institutions/ Employees of Statutory Bodies/Govt. Undertakings/Employees of Municipal Corporations/Municipalities/ Local Bodies, Employees of Panchayats including Chowkidars & Dafadars and Seasonal staff under Government with effect from 01.01.2004.

Sir,

The Governor is pleased to decide that with effect from 01.01.2004 and until further orders the whole time Teaching and Non-Teaching staff of Non-Govt./Sponsored/aided Educational Institutions/Employees of Statutory Bodies/Govt. Undertakings, staff of Municipal Corporations/Municipalities/Local Bodies/Panchayats including Chowkidars & Dafadars under the Government on time scale of pay shall draw Dearness Allowance @ 45% of pay. Such Allowance will not apply to those who are in receipt of variable Dearness Allowance based on movement of consumer price index. However, such revision of D.A. is also applicable in those cases, where the employees are yet to some over to the revised scale of pay.

(2) The term 'Pay' for the purpose of calculation of Dearness Allowance shall mean the 'basic pay' drawn in the prescribed scales of pay including stagnation increment (s) of non-practising Allowances, if any, but shall not include any other type (s) of pay like Special pay or Personal pay etc. In the case of those who do not opt for the revised scales of pay. Prescribed on the basis of the recommendations of the 4th Pay Commission, the 'Pay' shall mean the basic pay drawn in the unrevised scale of Pay as was applicable prior to revision of pay on the recommendation of the 4th Pay Commission plus Dearness Allowance admissible on such pay with effect from 01.10.1996, vide Finance Department's Memo No. 7756-F.

(3) It has been decided that the seasonal employees of the State Government drawing pay at the minimum of the scale of pay as per ROPA, 1998 shall be entitled to the benefit of D.A. at the same rate and sanctioned herein above on the minimum of the scale of pay being drawn by them.

(4) It has also been decided that in the case of Public Undertakings/Statutory Bodies the additional expenditure should be borne by such Undertakings/Bodies themselves but of their own resources or out of financial assistance provided for them in the Budget and that no additional financial assistance will be given to them on account of sanction of Dearness Allowance.

(5) This order will get be applicable to the staff of the Undertakings covered under Finance Dept. Memo. No. 10328-F, dated 12.12.2000.

(6) The Dearness Allowance sanctioned above should be rounded off to the nearest rupee in each case.

(7) The Governor has also been pleased to decide that for daily rated workers under the above-mentioned Institutions/Bodies, whose wages are not regulated by any statutory provisions like the minimum wages act etc., there will be a further ad-hoc increase in their existing daily rates of wages by Rs. 3/- (Rupees three) only with effect from 01.01.2004.

(8) Fresh Typed draft Govt. orders sanctioning Dearness Allowance/Additional Dearness Allowance in the above basis for the staff of the Institutions/Statutory Body/Public Undertakings, etc. under the control of your department may be prepared alongwith ready reckoner and sent to Group-P (Service) of Finance Department alongwith previous sanctioning order of D.A./A.D.A. for vetting before actual issue of such order by the Administrative Department concerned.

Yours faithfully,

Sd/- Illegible
Joint Secretary to the
Government of West Bengal
Finance Department.

Govt. Circular

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Directorate of School Education
(Grants-in-Aid Section)
Bikash Bhavan (7th floor), Salt Lake City, Kolkata-700 091

Memo No. 567-GA Dated Kolkata, 4th March,2004

Out of the funds placed at the disposal of this Directorate in terms of G.O. No. 11-SE(B) dated 8.1.2004, an amount of Rs. 8,80,78,000.00 (Rupees Eight Crores Eighty Lakhs Seventyeight Thousand) is sanctioned and placed at the disposal of the District Inspector of Schools (S.E.) as shown in ANNEXURE-I to enable him to release G.A. to the recognised Non-Govt. and Govt. Spond. H.S/High/Jr. High Schools both for Boys and Girls and Madrasahs of Secondary type including Sr. Madrasahs covered by Salary Deficit Scheme towards payment of Additional D.A. for the month of January, 2004 & February, 2004 during the Current Financial Year, 2003-04 sanctioned in terms of G.O.No. 54-SE(B) dated 17th February, 2004. This order issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide their U.O. No. 410-Group 'P' (Services) dated 11.2.2004.

This has the concurrence of the Finance Deptt. vide their Group-'N' U.O. No. 2286 dated 8.1.2004.

The Dist. Inspector of Schools (S.E.), will act as D.D.O. He is authorised to draw the amount from the Treasury Office/Pay and Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-73. The charge on this account will be debited from the Head of A/c. shown in Annexure-I.

The Accountant General, West Bengal, is being informed.

Sd/- B.K. Mookherjee
Dy. Director of School Education
(G.A.), West Bengal.

Memo No. 567/1(65)-CA Dated Kolkata, 4th March, 2004.

Copy forwarded for information and necessary action to the :–

(1) A.G., W.B., 2,Govt. Place (West), Kolkata-1.
(2) A.G. (Audit), W.B., 4, Brabourne Road (6th floor), Kolkata-1.
(3) A.G. (L.B. Audit), Poddar Court (9th floor), 18, R. Sarani, Kolkata-1.
(4) Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-73.
(5) Treasury Officer,........................P.O...........................Dist...................................
(6) Asstt. Secy. (Budget), Edn, Deptt. (5th floor), Salt Lake, Kolkata-91

PROGRESSIVE EXPND. UNDER THE HEAD OF A/C. SHOWN IN ANNEXURE-I IS STATED BELOW :-

Allocation for G.A. Sec.	Expnd. incl. present release	Balance
Rs. 161,16,22,600/-	Rs. 160,08,81,705/-	Rs. 107,40,895/-

Sd/-Illegible
Dy. Director of School Education
(G.A.), West Bengal

Memo No. 567/2/(20)-GA Dated Kolkata, 4th March,2004

Copy forwarded for information and necessary action to the Dist. Inspector of Schools (S.E.),..................................P.O..........................Dist..................................He on receipt of cheques from the Pay and A/c. Office/Treasuries will forwarded the cheques to the concerned branch of the Link Bank.

Sd/-Illegible
Dy. Director of School Education
(G.A.), West Bengal

ANNEXURE-I

Memo No. 567-GA

Dated : 04.03.2004

Head of Account

2202-02-Secondary Education-110-Assistance to Non-Govt. Secondary Schools-Non-Plan-001-Secondary Schools for Boys and Girls (ES)-V-31-GA-01-Salary Grant.

Sl. No.	Name of the District	Amount in Rupees
1.	BANKURA	42,00,000.00
2.	BARRACKPORE	52,00,000.00
3.	BIRBHUM	34,00,000.00
4.	BURDWAN	80,00,000.00
5.	COOCH BEHAR	22,00,000.00
6.	DAKSHIN DINAJPUR	15,60,000.00
7.	KOLKATA	63,40,000.00
8.	HOOGHLY	68,00,000.00
9.	HOWRAH	52,80,000.00
10.	JALPAIGURI	27,80,000.00
11.	MALDA	29,20,000.00
12.	PURBA MEDINIPUR	57,80,000.00
13.	PASCHIM MEDINIPUR	68,60,000.00
14.	MURSHIDABAD	45,90,000.00
15.	NADIA	48,00,000.00
16.	NORTH 24-PARGANAS	57,80,000.00
17.	PURULIA	27,20,000.00
18.	SILIGURI	7,50,000.00
19.	SOUTH 24 PARGANAS	65,10,000.00
20.	UTTAR DINAJPUR	16,08,000.00
	TOTAL :	8,80,78,000.00

(RUPEES EIGHT CRORES EIGHTY LAKHS SEVENTYEIGHT THOUSAND ONLY)

Sd/- Illegible
Dy. Director of School Education
(G.A.), West Bengal

Govt. Circular

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
Budget Branch
Bikash Bhavan (7th floor), Salt Lake City, Kolkata-700 091

Date : 22.3.2004

No. 93-SE(B)/IM-36/2003

MEMORANDUM

The undersigned is directed to refer to Memo No. 641-SE(P)/5S-577/2001 dated 29.5.2002 of this Department whereby it was decided that the authorities of all D.A. getting schools recognized by the West Bengal Board of Secondary Education in the State which receive D.A. component for the approved teaching and non-teaching staff of their schools from the Govt. of West Bengal will have to pay salary in the appropriate scale of pay from their own resources to the approved teaching and non-teaching employes at the rate prescribed by the State Government for teachers and non-teaching employees of the Govt. Aided Schools with immediate effect. It was also decided that the approved teaching and non-teaching employees of those D.A. getting schools will get D.A. from the Government (on percentage basis) at the rate as is admissible to other employees of State Government aided Educational Institutions as is announced from time to time by the State in supersession of all the previous orders issued from the Government to this effect, provided that these posts were duly sanctioned by the Government and appointment of teaching and non-teaching staff to those posts were approved by the Government. Consequent upon issue of this order some of such D.A. getting approved schools have introduced ROPA Rules, 1998 prescribed scale of pay for their approved employees and in some schools the Government decision is yet to be implemented. There are however some employees in those schools, whether ROPA '98 scale have been introduced in the school or not, who due to their serving beyond 60 years with approval from the concerned District Inspector of Schools are not eligible to draw pay and allowances under the ROPA Rules, 1990 or the ROPA Rules, 1998. This issue of allowing D.A. to such employees was under consideration of the Government for sometime past.

The undersigned is now directed to state that the approved teaching and non-teaching employees of the D.A. getting schools recognized by the West Bengal Board of Secondary Education who rendered service beyond 60 years on and after 29.5.2002 with approval of the concerned District Inspector of Schools will get Ad-hoc Dearness Allowance from the Government (at the rate of 41% on basic pay) notionally arrived at on their notional date of retirement at 60 years, which would have been admissible had the employee been in an educational institution governed by the Grants-in-aid Rules. The amount of Ad-hoc Dearness Allowance so arrived at shall remain unchanged throughout his service period beyond 60 years of age. The whole time approved staff who were in service on or beyond 31.12.1985 may continue up to the age of 65.

If any particular employee gets a basic pay from the school which is higher than that admissible under the Grants-in-aid Rules, the admissible Ad-hoc Dearness Allowance in his/her case, will be restricted to the amount calculated as above.

The term 'notional pay" and "notional date of retirement at 60 years" as mentioned above are meant only for determination of the quantum of Dearness Allowances. The superannuation/retirement benefit in their case will be calculated as usual in terms of the Recognised Non-Govt. Secondary Institutions Pension Rules as circulated vide G.O No. 1610-Edn.(S) dated 18.7.1968 read with G.O No. 2156-Edn (S) dated 20.9.1967 and subsequent orders.

The order will take effect from 29.5.2002.

All concerned are being informed.

Sd/- R.K. Ray
Joint Secretary to the
Govt. of West Bengal

No.93/1(8)-SE(B), Date : 22.3.2004

Copy forwarded for information and necessary action to the :–

1. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Bldgs., Kolkata-1,
2. Accountant General (Audit), West Bengal,
3. Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal,
4. Finance Deptt. Group-B of this Government,
5. Finance Deptt. Group-N of this Government,
6. Finance Deptt. Group-P of this Government,
7. Pay & Accounts Officer, Kolkata Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-12,
8. Treasury Officer..

Sd/-Illegible
Deputy Secretary.

No. 93/2/(50)-SE(B) Date : 22.3.2004

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. Director of School Education, West Bengal,
2. Deputy Director of School Education (Boys' High), W.B.,
3. Deputy Director of School Education (Women), W.B.,
4. Deputy Director of School Education (AIS), W.B.,
5. District Inspector of Schools (Primary/Secondary),
6. Accounts Officer, School Education Directorate, West Bengal.

Sd/-Illegible
Deputy Secretary.

Registered No. WB/SC-247

No. WB/CPS/K-144 (Part I) 2004

The Kolkata Gazette

Extraordinary

Published by Authority

MAGHA 16 THURSDAY, FEBRUARY 5,2004 [SAKA 1925

PART I— Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the HIgh Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
SECONDARY BRANCH

NOTIFICATION

No. 211-SE(S)—5th February, 2004—In exercise of the power conferred by sub-section (2), read with clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the West Bengal School Service Commission Act, 1997 (West Bengal Act IV of 1997) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of this Department Notification No. 932-SE(S), dated the 09th August, 1999, the Governor is pleased hereby to determine as follows for the purposes of the said Act :—

1) the Eastern Region shall comprise the districts of Burdwan, Birbhum and Hooghly with headquarters at Burdwan ;
2) the Southern Region shall comprise the districts of Kolkata, 24-Parganas (South) and Howrah with headquarters at Kolkata;
3) the South-Eastern Region shalll comprise the districts of 24-Parganas (North) and Nadia with headquarters at Barasat;
4) the Western Region shall comprise the districts of Bankura, Purba Medinipur, Paschim Medinipur and Purulia with headquarters at Bankura;
5) the Northern Region shall comprise the districts of Dakshin Dinajpur, Uttar Dinajpur, Malda, Murshidabad, Cooch Behar, Jalpaiguri and Darjeeling (Siliguri Sub-Division) with headquarters at Malda;
6) the Hill Region shall comprise the area within the jurisdiction of the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council constituted under the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council Act, 1988 (West Bengal Act XIII of 1988), in the district of Darjeeling with headquarters at Darjeeling.

By order of the Governor,
T. K. BOSE
Secretary of the Government of West Bengal

Registered No. WB/SC-247

to the Government of West Bengal
No. WB/CPS/K-147 (Part-1)/2004

The Kolkata Gazette

Extraordinary

Published by Authority

Magha 24] Friday, February 13, 2004 [Saka 1925

PART-1–Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

School Education Department

Secondary Branch

Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700 091

NOTIFICATION

No. 204-SE(S)–5th February, 2004–In exercise of the power conferred by Clause (h) of Section 4 of the West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994 (West Bengal Act XXXIX of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of this Department Notification No. 1022-SE(S), dated the 18th August, 1999 the Governor is pleased hereby to nominate with immediate effect the following two heads of recognised Madrasah, one High Madrasah and one Senior Madrasah to be the members of the West Bengal Board of Madrasah Education for a term of four years with effect from the date of publication of the Notification in the *Kolkata Gazette*, as required under Section 6 of the said Act :–

(1) Manwara Begum, Headmistress
Kulgoria High Madrasah,
Post Office–Kulgoria, District–Burdwan

(2) Md. Farman Ali, Superintendent,
Kabilpur Darul Quaran Senior Madrasah,
Post Office– Kabilpur,
District– Murshidabad

By order of the Governor
P.K. GOSWAMI
Special Secretary
to the Government of West Bengal

Registered No. WB/SC-247 No. WB/CPS/K-148 (Part-1)/2004

The Kolkata Gazette

Extraordinary

Published by Authority

Magha 24] Friday, February 13, 2004 [Saka 1925

PART-1–Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

School Education Department

Secondary Branch

Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700 091

NOTIFICATION

No. 205-SE(S)–5th February, 2004–In exercise of the power conferred by Clause (i) of Section 4 of the West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994 (West Bengal Act XXXIX of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of this Department Notification No. 1531-SE(S), dated the 5th November, 2002 the Governor is pleased hereby to nominate with immediate effect the following two members of the West Bengal Legislative Assembly to be the members of the West Bengal Board of Madrasah Education for a term of four years with effect from the date of publication of the Notification in the *Kolkata Gazette*, as required under Section 6 of the said Act :–

(1) Abu Ayes Mondal, M.L.A.
Village–Akbarnagar,
Post Office–Kulut,
Police Station–Monteswar,
District–Burdwan

(2) Abdul Mannan, M.L.A.
15/E, A.P. Ghosh Road,
Post Office–Chatra,
District–Hooghly

By order of the Governor
P.K. GOSWAMI
Special Secretary

Registered No. WB/SC-247 **No. WB/CPS/K-149 (Part-1)/2004**

The Kolkata Gazette

Extraordinary

Published by Authority

Magha 24] **Friday, February 13, 2004** **[Saka 1925**

PART-1–Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
Secondary Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700 091

NOTIFICATION

No. 206-SE(S)/5M-14/03-5th February, 2004–In exercise of the power conferred by Clause (j) of Section 5 of the West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994 (West Bengal Act XXXIX of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of this Department Notification No. 1021-SE(S), dated the 18th August, 1999, the Governor is pleased hereby to nominate with immediate effect the following three persons to be the members of the West Bengal Board of Madrasah Education for a term of four years with effect from the date of publication of the Notification in the *Kolkata Gazette*, as required under Section 6 of the said Act :–

(1) Prof. Tanvir Ahmed
Assistant Professor in Persian,
Moulana Azad College,
8, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Kolkata- 700 013

(2) Prof. A.M.K. Masumi
Ex. Professor, Hadith and Tafseer,
Calcutta Madrasah and Chairman, Urdu Academy,
33/1/C, Beniapukur Road,
Kolkata- 700 014

(3) Parvin Arjumand Banu
Headmistress,
Akra Girls' High Madrasah,
Post Office–Akra, District–24 Parganas (South)

By order of the Governor
P.K. GOSWAMI
Special Secretary
to the Government of West Bengal

Registered No. WB/SC-247 No. WB/CPS/K-151 (Part-1)/2004

The Kolkata Gazette

Extraordinary

Published by Authority

Magha 24] Friday, February 13, 2004 [Saka 1925

PART-1–Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

School Education Department
Secondary Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700 091

NOTIFICATION

No. 208-SE(S)/5M-14/03-5th February, 2004–In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 5 of the West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994 (West Bengal Act XXXIX of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of this Department Notification No. 1705-SE(S), dated 5th September, 2000, the Governor has been pleased to appoint for a term of four years with effect from the date of publication of the Notification in the *Kolkata Gazette Extraordinary* or until election of members referred to in Section 4 of the said Act is held the following persons from amongst the persons qualified for Election under Clause (l) of Section 4 of the said Act, to be the member of the West Bengal Board of Madrasah Education :–

(1) Abu Zafar, Clerk,
Rajpur Senior Madrasah,
P.O.–Chatra, District – North 24-Parganas

By order of the Governor
P.K. GOSWAMI
Special Secretary
to the Government of West Bengal

Registered No. WB/SC-247 **No. WB/CPS/K-150 (Part-1)/2004**

The Kolkata Gazette

Extraordinary

Published by Authority

Magha 24] **Friday, February 13, 2004** **[Saka 1925**

PART-1–Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

School Education Department
Secondary Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700 091

NOTIFICATION

No. 207-SE(S)/5M-14/03-5th February, 2004–In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 5 of the West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994 (West Bengal Act XXXIX of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of this Department Notification No. 1705-SE(S), dated 5th September, 2000, the Governor has been pleased to appoint for a term of four years with effect from the date of publication of the Notification in the *Kolkata Gazette Extraordinary* or until election of members referred to in Section 4 of the said Act is held, whichever is earlier the following persons from amongst the persons qualified for Election under Clause (K) of Section 4 of the said Act, to be the members of the West Bengal Board of Madrasah Education :–

(1) Md. Rabiul Haque, Assistant Teacher,
Bholagoria High Madrasah,
P.O.–Bholagoria, District – Birbhum

(2) Md. Mozammel Haque, Assistant Teacher,
Manikchawk High Madrasah,
P.O.–Manikchawk, District – Murshidabad

(3) Md. Ejaj Ahmed, Headmaster,
Danga High Madrasah,
P.O.–Danga, District – South 24-Parganas

(4) Md. Jalauddin Ahmed, Assistant Teacher,
Rahatpur High Madrasah,
P.O.–Rahatpur, District – North Dinajpur

(5) Tafazzal Haque, Assistant Teacher,
Abbasganj High Madrasah,
P.O.–Abbasganj, District – Malda

(6) Rafiqul Islam, Assistant Teacher,
Furfura Fatehia Senior Madrasah,
P.O.–Furfura, District – Hooghly

(7) Abdul Malek, Assistant Teacher,
Hadipur Shah Anowarul Ulum Islamia Senior Madrasah,
P.O.–Hadipur, District – North 24-Parganas

(8) Hafizur Rahman, Assistant Teacher,
Dogachia Senior Madrasah,
P.O.–Dogachia, District – Paschim Medinipore

(9) Md. Yasin Ali, Assistant Teacher,
Jagannathpur Junior High Madrasah,
P.O.–Jagannathpur, District – Malda

(10) Javed Akhtar,
Shibpur Anjuman Junior High Madrasah (Urdu),
P.O.–Shibpur, District – Howrah

By order of the Governor
P.K. GOSWAMI
Special Secretary
to the Government of West Bengal

Board Circular

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
77/2, Park Street, Kolkata-16

Circular No. S/134 Dated : 8.3.2004

From : Sri Swapan Bhattacharya, Secretary, W.B.B.S.E.

To : The Heads of all recognised Secondary Schools.

Sub : Election for Constitution/Reconstitution of the Managing Committees of the recognised Secondary Schools and extension of the tenures of Managing Committees/Ad-hoc Committees/Organising Committees/Administrators upto 31.10.2004 in view of ensuing Parliament Election in 2004.

In view of the ensuing Parliament Election scheduled to be held on 10th May, 2004, in this State, the President, W.B.B.S.E., in exercise of the powers conferred upon him under section 28(2) of the West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963, as amended has been pleased to order that :-

(1) Schools where the election for constitution and reconstitution of the Managing Committee is scheduled to be held within 31.3.2004 are allowed to complete the election as per approved election programme in accordance with relevant rules;

(2) Schools where the programme of different stages of election have already been completed but Managing Committee can not be constituted/reconstituted within 31.3.2004 will not proceed further and will prepare fresh schedule for the remaining part of election programme and with due notice to all concerned will complete the election accordingly after 16th August, 2004;

(3) The tenures of the Managing Committee/Ad-hoc Committee/Organising Committee/ Administrator of the Secondary Schools which have already been extended beyond 31.3.2004 but within 31.10.2004 are extended upto 31.10.2004 in each case or till completion of constitution/reconstitution of the Managing Committee by way of election of office-bearers or until further order, whichever is earlier;

(4) The schools where elections are likely to fall due within 30.4.2004 and which have not yet adopted any programme for election to constitute/reconstitute the Managing Committees or have adopted programme but no stage of the said programme has been started will hold election on the basis of the voters' list for the Academic year 2004-2005 as per Management Rules within 31.10.2004. The tenure of such Managing Committee/Administrator/Ad-hoc Committee is extended upto 31.10.2004 in each case.

The Board, however reserves the right to appoint Administrator/Ad-hoc Committee where the same would be necessary for administrative reasons.

This Circular is not applicable in respect of schools where contrary order from the Hon'ble Court prevails.

All concerned are being informed.

S. Bhattacharya
Secretary

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

রাজ্য শাখা পরিচালিত

হলিডে হোম

বক্রেশ্বর

সত্যপ্রিয় রায় স্মৃতি বিশ্রাম ভবন-এর ভাড়া

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
	সদস্য	সদস্য নয়		
৪	৭৫·০০	১০০·০০	১০০·০০	৮

দীঘা

রথীন্দ্রকৃষ্ণ বিরাম নিলয়-এর ভাড়া

কুটির

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন		জামানত	ঘরের সংখ্যা
	সদস্য	সদস্য নয়		
৬	১০০·০০	২০০·০০	২০০·০০	৮

ডরমেটারী ঘর

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
২	৫০·০০	৫০·০০	১
৩	৭০·০০	৭০·০০	১
৪	৯০·০০	৯০·০০	২
৬	১৩০·০০	১৩০·০০	২

ডরমেটারী হল

শয্যা	ভাড়া প্রতিদিন	জামানত	ঘরের সংখ্যা
২০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১
২৮	শয্যাপ্রতি ২০·০০	শয্যাপ্রতি ২০·০০	১

হলিডে হোম বুকিং করতে অবশ্যই সমিতির স্কুল/মহকুমা বা জিলা শাখার কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে। এছাড়া মিতির সদস্য ব্যতীত ব্যক্তি নিজ নিজ অফিস কর্তৃপক্ষের পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে।

জামানত ঃ ভ্রমণশেষে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে তা বাদ দিয়ে এবং দীঘা হলিডে হোমের কুটির ভাড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খরচের াকা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ফেরৎ পাওয়া যাবে।

ডরমেটারী হল/ঘর ব্যবহারকারীগণ, প্রয়োজনে রান্নার জায়গা ব্যবহার করলে প্রতিদিন ৬০ টাকা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিরিক্ত দিতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩
দূরভাষ ঃ ২২১৫-৮৮৫৬, ২২১৫-৯১৫৮

Printed by Adhikram Sanyal at the Ganashakti Printers (P) Ltd. 33, Alimuddin Street, Kolkata-700 016
and also Published by him at the A. B. T. A. Office, 15, Bankim Chatterjee Street, Kolkata-700 073